বৌদ্ধকোষ

Encyclopaedia of Buddhism

তৃতীয় খণ্ড

পালি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০-২০০১

কার্যকরী সম্পাদিকা ঃ ডঃ বেলা ভট্টাচার্য

সম্পাদক মণ্ডলী

মূল্য — ১০০ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট
শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ কর্তৃক ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয় নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে বৌদ্ধকোষ (Encyclopaedia of Buddhism) তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচীনতম ও ঐতিহ্য মণ্ডিত এই পালি বিভাগে মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ডঃ অনুকুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী প্রমুখ বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত আচার্যগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে বৌদ্ধশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করে যে সমস্ত গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তা সর্বজন স্বীকৃত এবং সেজন্যই এই বিভাগ বিশেষ গৌরবের দাবী করতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগের সার্বিক উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁদের সহযোগিতায় ও অর্থানুকুল্যে অনেক পালি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুদিত হচ্ছে, নিয়মিত Journal of the Department of Pali প্রকাশিত হচ্ছে এবং বর্ত্তমান বৌদ্ধকোষ ও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্ত্তমান অধ্যাপকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হল। দ্রুত প্রকাশনার জন্য ভুল ত্রুটি মার্জনীয়।

পরিশেষে আমরা ভগবান বুদ্ধের বাণী স্মরণ করি —

অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
মাঘী পূর্ণিমা
২০০১

সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে
বেলা ভট্টাচার্য
কার্যকরী সম্পাদিকা

বৌদ্ধকোষ

তৃতীয় খণ্ড

১ ককচূপম সুত্ত

ককচূপম সুত্ত বা ককচোপম সূত্র পালি মজ্ঝিম-নিকায়ের একবিংশতম সূত্র। ইহা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থানকালে মৌলী ফাল্‌গুনের (পালি-মোলিয়ো ফগ্গুনো) নিকট দেশনা করেছিলেন। সূত্রের 'ককচোপম' নামকরণ বুদ্ধ নিজেই করেছেন সূত্রের শেষের দিকে ককচ-এর উপমা থেকে।

ককচোপমের প্রধান আলোচ্য বিষয় কিভাবে সহিষ্ণুতা অর্জন করে বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুগণ সর্বভূতের হিতানুকম্পী হয়ে মৈত্রী চিত্তে অবস্থান করবেন। সেই সময় ভিক্ষু মৌলী ফাল্‌গুন অতিমাত্রায় ভিক্ষুণীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। যদি কোন ভিক্ষু তাঁর সামনে ভিক্ষুণীদের সম্পর্কে অখ্যাতি বা নিন্দাসূচক উক্তি করতেন তাতে তিনি কুপিত ও অপ্রসন্ন হতেন আবার ভিক্ষুণীরাও তাঁর নিন্দা শুনলে তদ্রূপ রাগ করতেন। বুদ্ধ এই সংবাদ শুনে মৌলী ফাল্‌গুনকে ডাকলেন এবং তিরস্কার করে উপদেশ দিয়ে বললেন যে শ্রদ্ধাবশতঃ অনাগারিক রূপে প্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে ইহা সমীচীন নয় যে তুমি ভিক্ষুণীদের সঙ্গে অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হয়ে অবস্থান করবে। কেউ যদি তোমার সামনে ভিক্ষুণীদের নিন্দা করে তথাপি তুমি গৃহীজনোচিত ইচ্ছা বা চিন্তা ত্যাগ করবে বা কোন পাপবাক্য উচ্চারণ করবে না, এমনকি পাণি বা দণ্ড দ্বারা কোন ভিক্ষুণীকে প্রহার করলেও সহিষ্ণুতা সহকারে নিজেকে সংযত রাখবে এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতানুকম্পী হয়ে মৈত্রী চিত্তে বিদ্বেষহীনভাবে অবস্থান করবে এবং তোমার নিন্দা করলে বা তোমাকে আঘাত করলে তুমি একই আচরণ করবে।

অতঃপর বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন যে তাঁর ভিক্ষু শিষ্যগণ যাঁরা চিত্ত-সংযম সাধনা করছিলেন তাঁদের তিনি বলেছেন একাসন ভোজন অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পূর্বে ভোজন করতে তাহলে সুস্থ, নিরাতঙ্ক ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবেন এবং এজন্য তাঁকে কোন অনুশাসন প্রদান করতে হয়নি, শুধু তাঁদের কর্তব্য স্মরণ করে দিয়েছেন মাত্র। উপস্থিত ভিক্ষুদের ও অকুশলধর্ম ত্যাগ করে কুশলধর্মে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন, তা করলেই তাঁরা এই ধর্ম বিনয়ে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করতে পারবেন। যেমন, কোন গ্রাম বা নিগমের নিকটে কোন বড় শালবন যদি শালদূষক এরণ্ডবৃক্ষ দ্বারা আবৃত হয়, আর কোন হিতকামী শক্তিমান পুরুষ সমস্ত জঙ্গল আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করেন, যে সমস্ত শাল গাছ ঋজু ও সুজাত তাদের সম্যক্‌ভাবে প্রতিপালন করেন, ফলে ঐ শাল বন বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে।

কায়ে, বাক্যে ও মনে ভিক্ষুদের সদাচরণের জন্য বুদ্ধ কয়েকটি উপমা প্রয়োগ করে উপদেশ দিয়েছেন। পূর্বকালে শ্রাবস্তীতে বৈদেহিকা (পালি বেদেহিকা) নাম্নী এক বিশিষ্টা গৃহিণী ছিলেন। তাঁর সুব্রতা, ভদ্রস্বভাবা এবং শান্তশীলা বলে খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। কালী নামে তাঁর এক দক্ষা, অনলসা ও কুশলকর্মা দাসী ছিল। কালী ভাবল, 'আর্য্যপত্নীর এইরূপ সুযশ হয়েছে। সে কি তিনি স্বভাবত শান্ত বলে কুপিত হন না অথবা আমার কাজকর্ম দেখেই স্বভাবে অশান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি শান্ত থাকেন এবং কোন কোপ প্রকাশ করেন না? যা হোক, আমি তাঁকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখব।' অতঃপর কালী একদিন সূর্যোদয়ের পর, ঘুম থেকে উঠল। গৃহিণী কুপিতা হয়ে তাকে বললেন—কিলো আজ এত দেরীতে উঠিলি। 'এত মা তেমন কিছু নয়।' "পাপিষ্ঠা,

তুই এত দেরী করে উঠিলি, আর বলছিস, 'এত ত তেমন কিছু নয় মা' এই বলে তিনি অপ্রসন্না হয়ে অপ্রিয় কথা বললেন এবং ভ্রূকুটি করলেন। কালী প্রভুপত্নীকে আরো পরীক্ষা করার জন্য পরের দিন আরো দেরী করে ঘুম থেকে উঠল। বৈদেহিকা সেদিন রেগে গিয়ে দ্বারদণ্ড নিয়ে দাসীর মাথায় আঘাত করে ফাটিয়ে দিলেন। দাসী রক্তে গলগলমান ফাটা মাথা দেখিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে বলল, "ওহে দেখ দেখ, আমার শান্তা ও ভদ্রস্বাভাবা গৃহস্বামিনীর কাজ! কিরূপে তিনি এক দাসীর দেরীতে ওঠার অপরাধে কুপিতা ও অপ্রসন্না হয়ে দ্বারদণ্ড হাতে নিয়ে মাথায় আঘাত করেন ও মাথা ফাটিয়ে দেন।" ফলে বৈদেহিকার এরূপ দুর্নাম প্রচারিত হল যে তিনি চণ্ডস্বভাবা, অধীরা ও অশান্তশীলা। তেমনভাবেই জানা যায় কোন ভিক্ষু-স্বভাবে শান্ত ও সুবচ কিনা যখন তাঁকে কোন অমনোজ্ঞ ও অপ্রিয় বাক্য স্পর্শ করে বা চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যাসন ইত্যাদি ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব হচ্ছে। বুদ্ধের মতে সেই ভিক্ষুই যথার্থ সুবচ যিনি ধর্মকেই সৎকার সম্মান, গুরুস্বরূপ, মান্য ও পূজা করে সুবচভাব অবলম্বন করেন।

অন্য লোক পঞ্চবচনপথে অর্থাৎ কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত মৈত্রীচিত্তে বা দ্বেষবশে ভিক্ষুদের সম্বন্ধে যা ইচ্ছা বলতে পারে কিন্তু তাতে বুদ্ধশিষ্যদের যেন চিত্তবিকার না হয়, কোন পাপবাক্য উচ্চারণ না করে, দ্বেষ বশবর্তী না হয়ে সকলের হিতানুকম্পী হয়ে মৈত্রী চিত্তে অবস্থান করে, ঐ সকল ব্যক্তিকে মৈত্রী সহগত-চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান করে এবং তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর, ও অব্যাপন্নচিত্তে স্ফুরিত করে। ইহাই বুদ্ধের ভিক্ষুদের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষা। যেমন, কেউ যদি 'কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে এই সুগভীর ও অপ্রমেয় মহা পৃথিবীকে নিস্‌পৃথিবী করবার জন্য মৃত্তিকা খনন করতে গিয়ে শুধু শ্রমক্লান্ত হয় কিন্তু কৃতকার্য্য হয় না।

যেমন, কোন এক ব্যক্তি লাক্ষা বা হরিদ্রা (হলুদ), নীল অথবা মঞ্জিষ্ঠ রং নিয়ে আকাশে চিত্র অঙ্কন বা প্রতিবিম্ব আঁকতে চাইলে তা পারবে না, কারণ আকাশে চিত্র অঙ্কন বা প্রতিবিম্ব আঁকতে চাইলে তা পারবে না, কারণ আকাশ অরূপী ও অনিদর্শন (অদৃশ্য), তাতে চিত্রাঙ্কন করে প্রতিবিম্ব প্রকটিত করা সম্ভব নয়, তা করবার চেষ্টা করলে ঐ ব্যক্তি শুধু শ্রমক্লান্ত ও দুঃখভাগী হবে।

যেমন কোন এক ব্যক্তি জ্বলন্ত মশাল হস্তে সুগভীরা, অপ্রমেয়া গঙ্গা নদীকে সন্তপ্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না, ইহা সম্ভব নয়, চেষ্টা করলে নিজেই সন্তপ্ত ও দুঃখভাগী হবে। তেমনভাবেই অন্য লোকেরা (অবৌদ্ধজন) পঞ্চবচন পথে যাই বলুক না কেন তাতে বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষুদের যেন চিত্তবিকার না হয়, তাঁরা যে পাপবাক্য উচ্চারণ না করেন, বিদ্বেষ পরায়ন না হয়ে সকলের হিতানুকম্পী হয়ে মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করেন, ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রীসহগত-চিত্তে স্ফুরিত করেন ও তদবলম্বনে সর্বলোক বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয়, অবৈর এবং অব্যাপন্নচিত্তে স্ফুরিত করে মৈত্রী সহগত-চিত্তে অবস্থান করেন। এমন কি যদি কোন চোর অথবা নীচকর্মা তস্কর উভয়দিকে বাঁটযুক্ত ককচ দ্বারা ভিক্ষুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটেও তাতে যে মনকে প্রদূষিত করবে সে বুদ্ধের আজ্ঞাবহ প্রকৃত শিষ্য নয়। তাকে পূর্বোক্তমত চিত্তসাধন করতে এবং এই ককচোপম

উপদেশ অনুক্ষণ মনে রাখতে হবে, যেহেতু তা ভিক্ষুদের পক্ষে দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হবে।

[দ্রষ্টব্য : Majjhima Nikāya, PtI; ড: বেণীমাধব বড়ুয়া, মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২ ককুট্‌ঠা (ককুত্থা)

ককুট্‌ঠা কুশীনগরের নিকটবর্তী প্রাচীন ভারতের একটি নদী। ভগবান বুদ্ধ অন্তিমযাত্রা কালে মহাপরিনির্বাণের পূর্বে ককুট্‌ঠায় স্নান করেছিলেন এবং জল পান করে কুশীনগরে প্রবেশ করেছিলেন। ককুট্‌ঠা-তীরস্থ কর্মকারপুত্র চুন্দের আম্রবনে চীবর পেতে বিশ্রাম করলেন শূকরকন্দ ইত্যাদি ব্যঞ্জন সহ আহার করে গুরুতরভাবে তিনি অসুস্থ হওয়ার জন্য চুন্দ দায়ী নয়।

[দ্রষ্টব্য : মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত, দীঘ নিকায়।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

৩ ককুধ[১]

ককুধ বৈশালীর নিকটবর্তী নাদিকার অধিবাসী একজন বুদ্ধের উপাসক। বুদ্ধের অন্তিম যাত্রার সময় কুশীনগরের পথে নাদিকায় এলে আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বললেন যে ককুধ দেহত্যাগ করলে ও পাঁচটি অবরভাগীয় সংযোজন বিনষ্ট করা হেতু উচ্চতম স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবেন এবং সেই অবস্থাতেই পরে নির্বাণ লাভ করবেন।

[দ্রষ্টব্য : মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

৪ ককুধ[২]

ককুধ একজন দেবতা। বুদ্ধ যখন সাকেতের নিকটবর্তী অঞ্জনবনে অবস্থান করছিলেন তখন ককুধ সেখানে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বুদ্ধ সুখ-দুঃখ অনুভব করেন কিনা। বুদ্ধ উত্তর দিলেন যে তিনি সুখ-দুঃখের অনুভূতি অতিক্রম করে এখন মুক্ত পুরুষ (সংযুক্তনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪)। অট্‌ঠকথা মতে ককুধ ছিলেন ব্রহ্মা এবং মোগ্গল্লানের সেবক।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

ককুসন্ধ

চব্বিশজন বুদ্ধের তালিকায় এই বুদ্ধের ক্রম বাইশ এবং বর্তমান ভদ্রকল্পে পাঁচ বুদ্ধের মধ্যে প্রথম। বেস্‌সভূ (বিশ্বভূ) বুদ্ধের পরে ইনি আর্বিভূত হয়েছিলেন। ক্ষেমবতী নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ককুসন্ধ বুদ্ধের পিতা অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রাহ্মণী বিশাখা (বুদ্ধ দীপঙ্কর থেকে বুদ্ধ বেস্‌সভূ-এই একুশ জন বুদ্ধ রাজ পরিবারে

জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ককুসন্ধ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন)। তিনি চার হাজার বছর গৃহবাসী ছিলেন। রুচি, সুরুচি ও বড়্ঢন (বা রতিবড্ঢন) নামে তাঁর তিনটি উত্তম প্রাসাদ ছিল। তাঁর স্বর্ণাভরণ ভূষিতা ত্রিশ হাজার পরিচারিকা ছিল। প্রধানা স্ত্রীর নাম বিরোচমানা এবং পুত্রের নাম উত্তর। চার প্রকার নিমিত্ত (জরা ব্যাধি-মৃত্যু-সন্ন্যাস) দর্শন করে রথারোহণে অভিনিষ্ক্রমণ করে প্রায় আট মাস ধ্যানচর্যায় রত ছিলেন। মহাব্রহ্মার দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি ঋষিপতন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর অগ্রশ্রাবক দ্বয় বিধুর ও সঞ্জীব এবং সেবক ছিলেন বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু। অগ্রশ্রাবিকাদের নাম শ্যামা ও চম্পা। প্রথম দুই উপাসক অচ্যুত ও সুমন এবং দুই উপাসিকা নন্দা ও সুনন্দা। শিরিস তাঁর বোধিবৃক্ষ। তিনি চল্লিশ হাত লম্বা ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কনকপ্রভার মত রশ্মি চারদিকে দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত নিঃসৃত হত। তাঁর পরমায়ু ছিল চল্লিশ হাজার বছর। বুদ্ধ ককুসন্ধ ক্ষেমারামে নির্বাণলাভ করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। ককুসন্ধ বুদ্ধের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৌতম ক্ষেমবতী নগরে ক্ষেম নামক রাজা হয়ে রাজত্ব করেছিলেন। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে এই বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ নামে অভিহিত।

[দ্রষ্টব্য : বুদ্ধবংস, ধম্মপদট্‌ঠ কথা, ৩য়, ২৩৬;

Dictionary of Pali Proper Names, Vol I, P. 470.]

৬ কক্কট জাতক (কর্কট জাতক)—২৬৭

শাস্তা বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন। সেইসময় কোন জমিদার দাদনের (ধার) টাকা আদায় করে সস্ত্রীক জনপদ থেকে ফেরার পথে দস্যু কবলে পড়েছিলেন। জমিদার পত্নীর রূপে মুগ্ধ দস্যুনেতা তাকে পাবার জন্য জমিদারের প্রাণবধ করতে উদ্যত হল। তখন পতিভক্তা শীলবতী জমিদার পত্নী দস্যুনেতার পায়ে পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি-যদি আমাকে পাবার জন্য স্বামীকে হত্যা করেন, আমি আত্মঘাতিনী হব, কিছুতেই আপনার অনুগামিনী হব না, কাজেই তাঁকে মারবেন না" এই বলে স্বামীকে মুক্ত করলেন।

অতঃপর উভয়ে শ্রাবস্তীতে ফিরে জেতবনবিহারের আভ্যন্তরীন গন্ধকুটীতে প্রবেশ করে শাস্তাকে প্রণাম করলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা কোথায় গিয়েছিলেন? তখন ভূস্বামী সব ঘটনা বললেন এমন কি তাঁর স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা পর্যন্ত। শাস্তা বললেন যে তাঁর ভার্য্যা পূর্বজন্মে ও তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন এই বলে তিনি অতীত কাহিনী শুরু করলেন।

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমালয়ে এক মহাহ্রদে এক বিশাল সুবর্ণ কর্কট (কাঁকড়া) বাস করত। সেইজন্য ঐ হ্রদের নাম হয়েছিল কুলীরদহ। সে হাতি ধরে মেরে খেয়ে ফেলত। তার ভয়ে কোন হাতী ঐ হ্রদে নামত না। ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব হস্তীগর্ভে জন্মেছিল এবং কালক্রমে বিশালদেহ ও বীর্যসম্পন্ন হলেন। তিনি এক হস্তিনীকে বিয়ে করলেন এবং কর্কটকে ধরবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হলেন।

বোধিসত্ত্ব তখন হাতীদের তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে বললেন—"তোমরা হ্রদে নেমে স্নান কর, আমি তোমাদের পেছনে থাকব। হাতীরা তাই করল এবং স্নান সেরে আগে

উঠে পড়ল। বোধিসত্ত্ব সকলের পেছনে উঠছিল। হঠাৎ জলের নীচে আকর্ষণ অনুভব করল। কর্কট তাঁকে নীচে টেনে চলল। অন্য হাতীরা ভয়ে পালিয়ে গেল এবং বোধিসত্ত্বের স্ত্রীও পলায়ন আরম্ভ করল। কিন্তু মরণ ভয়ে ভীত বোধিসত্ত্বের চিৎকার শুনে ফিরে এল এবং স্বামীকে মুক্ত করবার জন্য একটি গাথায় কর্কটকে প্রশংসা করে বলল—সমুদ্রে, গঙ্গা গর্ভে ও সমস্ত নদীতে যত জলচর বাস করে তাদের তুমিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমি কেঁদে তোমার কাছে এই ভিক্ষা মাগি, তুমি আমার পতিকে ছেড়ে দাও। তখন বামাকণ্ঠস্বরে কর্কটের মন মুগ্ধ হল ও বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তখনই পা তুলে কর্কটের পিঠের উপর দাঁড়ালেন, তাতে তার হাড়গুলি ভেঙে গেল। তখন অন্য হাতীরা ফিরে এসে পিঠের উপর এমন জোরে মর্দন করতে লাগল যে কর্কটের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার শিং দুটো কুলীরদহ থেকে প্রথমে গঙ্গায় পরে সমুদ্রে এসে পড়ল। এইভাবে বোধিসত্ত্বের পত্নী বোধিসত্ত্বের প্রাণ বাঁচালেন। কাহিনী শেষ করে শাস্তা বললেন—অতীতে এই উপাসিকা সেই করেণুকা এবং আমি ছিলাম তার পতি।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with Commentary, Vol II; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কক্কর জাতক (২০৯)

শাস্তা বুদ্ধের জেতবনে অবস্থিতি কালে সারিপুত্র স্থবিরের একজন তরুণ শিষ্য ছিলেন। তিনি স্নান ও খাওয়া, দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অতীব সজাগ ছিলেন। ক্রমে তাঁর শরীর রক্ষার কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ পেল এবং একদিন ধর্মসভায় ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনাকালে শাস্তা শুনতে পেয়ে বললেন, "এই ভিক্ষু যে কেবল বর্তমান জন্মে দেহরক্ষা সম্বন্ধে নৈপুণ্য লাভ করেছে এমন নহে, পূর্বেও এর এইরূপ স্বভাব ছিল।" এই বলে সেই অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অরণ্যে বৃক্ষদেবতা হয়েছিলেন। একদিন এক ব্যাধ পশমের দড়ির ফাঁদ ও লাঠি নিয়ে কক্কর পাখী ধরবার জন্য বনে প্রবেশ করেছিল। একটা বুড়ো কক্কর লোকালয় থেকে পালিয়ে বনে এসেছিল। ব্যাধ তাকে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু কক্করটা পশমের ফাঁদ চিনত, কাজেই ধরা দিল না, একবার উড়ে এবং মাটিতে নেমে পালাতে লাগল। তখন ব্যাধ নিজের দেহ গাছপালা দিয়ে ঢেকে বারে বারে ফাঁদ পাততে লাগল। তা দেখে ব্যাধকে লজ্জা দেবার জন্য কক্কর মানুষের মত গাথায় বলল যে গাছপালা ত ব্যাধের মত চলতে পারে না এবং বলে অন্যত্র চলে গেল। তখন ব্যাধ আফশোষ করতে লাগল এবং গৃহে ফিরে গেল। অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ; এই তরুণ ভিক্ষুছিল সেই কক্কর আর বুদ্ধ ছিলেন বৃক্ষদেবতা যিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : V. Fusboll, Jātaka with commentary, Vol-II; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

৮ কক্করপত্ত

কক্করপত্ত কোলিয় রাজ্যের একটি উপনগরী। এইস্থানে বুদ্ধের অবস্থানকালে দীঘজানু নামক একজন কোলিয় অধিবাসী বুদ্ধের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৪র্থ, পৃ. ২৮১)

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

৯ কক্কারু জাতক—৩২৬

বুদ্ধের জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্ত যখন মিথ্যাকথা বলে সঙ্ঘ ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন দেবদত্ত রক্তবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি কিছু ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট ফিরে এসেছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ যখন ধর্মসভায় একথা আলোচনা করছিলেন তখন বুদ্ধ তাঁদের আলোচ্য বিষয় জানতে পেরে বলেছিলেন, দেবদত্ত শুধু এ জন্মে মিথ্যা কথা বলে কষ্ট পাচ্ছে তা নয়, পূর্বেও এরূপ হয়েছিল, এই বলে অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন:

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে দেবপুত্ররূপে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় বারাণসীতে অনুষ্ঠিত এক মহা উৎসবে বোধিসত্বসহ চারজন দেবপুত্র কক্কারু নামক দিব্যপুষ্পের মালা ধারণ করে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র বারাণসী দিব্যপুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত হল। লোকেরা গন্ধে উৎস কোথায় জানবার জন্য ইতস্তত: খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। তখন আকাশে উড্ডীয়মান চার দেবপুত্রকে দেখতে পেল এবং তাঁদের নিকট কক্কারুপুষ্প চাইল। তাঁরা বললেন, "যাঁরা মহানুভব, এই দিব্য পুষ্প কেবল তাঁদেরই উপযুক্ত, মানুষের মধ্যে যারা নীচমনা, দুষ্টমতি, দুঃশীল ও সদ্ধর্মে শ্রদ্ধাহীন, তারা এগুলি পাবার যোগ্য নয়।" তখন জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র গাথায় বললেন যে কেউ পরদ্রব্য হরণ করে না, মিথ্যা কথা বলে না, ভোগে মত্ত নয় সেই দিব্যপুষ্প ধারণের উপযুক্ত। এ শুনে পুরোহিত ভাবলেন, "আমার ত এ সকল গুণের একটি ও নেই, তবে মিথ্যা বলে পুষ্পগুলি নিই না কেন।' এই ভেবে "আমার এই সমস্ত গুণ আছে" বলে জ্যেষ্ঠ দেবপুত্রের হাত থেকে পুষ্প নিয়ে মাথার রাখলেন। এভাবে অপর তিন জনের পুষ্পগুলিও নিলেন।

দেবপুত্র শিরোমাল্যগুলি পুরোহিতকে দিয়ে দেবলোকে চলে গেলেন। তারপরেই পুরোহিতের মাথায় যন্ত্রণা দেখা দিল। বেদনা ক্রমশ: এত তীব্র হতে লাগল যে তিনি চিৎকার করে আর্তনাদ করতে লাগলেন। কেউই শিরোবেদনা বন্ধ করতে পারল না, তখন সবাই রাজাকে পরামর্শ দিলেন আবার উৎসবের আয়োজন করতে, তাহলে দেবপুত্ররা পুরোহিতের যন্ত্রণা একমাত্র সারাতে পারবেন। রাজা পুনরায় উৎসবের আয়োজন করলেন, দেবপুত্রেরাও আবার এলেন এবং তাঁদের পুষ্পগন্ধে সমগ্র বারাণসী আমোদিত হল। সমবেত লোকেরা দুঃশীল, মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণকে দেবপুত্রদের সামনে মাটিতে শোয়াল। "আমায় রক্ষা করুন" বলে যন্ত্রণাকাতর ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করতে লাগল। তখন দেবপুত্ররা বললেন, "তুমি মিথ্যাবাদী ও পাপরত। তুমি এই পুষ্প ধারণের যোগ্য নও। তুমি আমাদের বঞ্চনা করেছ এবং তার ফলভোগ করেছ।" সেই জন সাধারনের সামনে পুরোহিতকে এইরূপ তিরস্কার করে দেবপুত্রেরা তাঁর

মাথা থেকে মালাগুলি খুলে নিয়ে দেবলোকে চলে গেলেন। বুদ্ধ এই অতীত কাহিনী শেষ করে বললেন, দেবদত্ত ছিল সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ, দেবপুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন মৌদ্‌গল্যায়ন, একজন সারিপুত্র এবং আমি ছিলাম জ্যেষ্ঠ দেবপুত্র।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll, Jātaka with commentary, Vol. III ; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

১০ কঙ্খারেবত থের

কঙ্খারেবত থের একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ স্থবির। তিনি শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধের নিকট গিয়ে ধর্মকথা শুনে প্রব্রজিত হলেন। তিনি ধ্যান অভ্যাস করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং কালক্রমে, ধ্যানে এত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে বুদ্ধ তাঁকে ধ্যানী শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রখ্যাত বুদ্ধশিষ্য অনুরুদ্ধ, কিম্বিল, কুণ্ডধান, আনন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রায়ই কঙ্খারেবত স্থবিরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। মজ্‌ঝিম নিকায়ের (১ম খণ্ড) মহাগোসিঙ্গ সুত্তে কঙ্খারেবতকে একজন উঁচু দরের ধ্যানী ভিক্ষু বলে উল্লেখ আছে। থেরগাথায় তাঁর গাথা আছে।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

১১ কঙ্খা বিতরণ বিসুদ্ধি

কঙ্খা অর্থ, সন্দেহ, সংশয় আর কঙ্খা বিতরণ অর্থ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ষোল প্রকার সংশয় উৎপন্ন তা দূরীভূত করণ।

কঙ্খা বিতরণ বিসুদ্ধি বা কঙ্ক্ষাবিতরণ বিশুদ্ধি মজ্‌ঝিম নিকায়ের (১ম খণ্ড) রথবিনীত সূত্রে উল্লিখিত সাত প্রকার বিশুদ্ধির মধ্যে চতুর্থ প্রকার বিশুদ্ধি। সাত প্রকার বিশুদ্ধি যথা—শীল-বিশুদ্ধি, চিত্ত বিশুদ্ধি, দৃষ্টিবিশুদ্ধি, কঙ্ক্ষা উত্তরণ বিশুদ্ধি বা শঙ্কা-উত্তরণ বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ-জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি। এই সাত প্রকার বিশুদ্ধির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। তারা এক লক্ষ্যের দিকে সাতটি সাতটি স্তর, এই সপ্ত বিশুদ্ধির চরম লক্ষ্য অনুৎপাদ পরিনির্বাণ বা বিমুক্তি লাভ। যেমন, মনে করা যাক্, শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে কোশল রাজ প্রসেনজিতের সাকেতে কোনও এক অবশ্য করণীয় কার্য উপস্থিত হল। তিনি শ্রাবস্তী ও সাকেতের মধ্যে সপ্ত রথবিনীতের অর্থাৎ সুদন্ত অশ্বযুক্ত রথের ব্যবস্থা করালেন। তিনি শ্রাবস্তী থেকে বেরিয়ে প্রথম রথবিনীতে আরোহণ করলেন, প্রথম রথবিনীতের দ্বারা দ্বিতীয় রথবিনীতের স্থানে পৌঁছে প্রথম রথবিনীত ছেড়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় রথবিনীতে আরোহণ করলেন। এইরূপে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ে, তৃতীয় থেকে চতুর্থে, চতুর্থ থেকে পঞ্চমে, পঞ্চম থেকে ষষ্ঠে এবং ষষ্ঠ থেকে সপ্তম রথবিনীতে আরোহণ করে সাকেতে পৌঁছলেন। ঠিক এইভাবে শীলবিশুদ্ধির গতি চিত্তবিশুদ্ধিতে পৌঁছাবার জন্য, চিত্তবিশুদ্ধির গতি দৃষ্টি-বিশুদ্ধিতে, দৃষ্টি-বিশুদ্ধির

গতি কঙ্ক্ষা বিতরণ বিশুদ্ধতে কঙ্ক্ষাবিতরণ-বিশুদ্ধির গতি মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধিতে, মার্গামার্গ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধিতে, প্রতিপদ-জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধিতে এবং জ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধির গতি অনুৎপাদ পরিনির্বাণে পৌঁছাবার জন্য। কঙ্ক্ষাউত্তরণ বিশুদ্ধি অর্থে যোগী নাম-রূপ সম্বন্ধে বিশুদ্ধি জ্ঞান লাভ করবার পর উহার মূল কারণ অন্বেষণে তৎপর হন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে এই নামরূপ অহেতুক নয়। বর্তমান নাম-রূপ অতীত হেতুর ফল। হেতুসম্ভূত নাম-রূপজ্ঞানে যোগীর প্রত্যক্ষ পরিচয় হওয়ার পর তাঁর ষোল প্রকার কঙ্ক্ষা বা বিচিকিৎসার (সংশয়) নিরসন হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে জ্ঞানই কঙখবিতরণ বিশুদ্ধি।

এই সপ্ত বিশুদ্ধি উপতিস্সকৃত বিমুত্তিমগ্গের বিষয় বস্তু। আচার্য বুদ্ধঘোষ বিভিন্ন প্রকার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে বিসুদ্ধিমগ্গ গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কঙ্খাবিতরণী

কঙ্খাবিতরণী আচার্য বুদ্ধঘোষকৃত বিনয় পিটকের অন্তর্গত পাতিমোক্খের (প্রাতিমোক্ষ) অর্থকথা বা ভাষ্য। গ্রন্থের শেষাংশে গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আছে। কথিত আছে যে সোন নামক স্থবিরের অনুরোধে বুদ্ধঘোষ কঙ্খাবিতরণী লিখেছিলেন। গন্ধবংসে উল্লিখিত আছে যে সুমেধ স্থবিরের অনুরোধে বুদ্ধনাগ 'বিনয়ত্থমঞ্জুসা' নামে কঙ্খাবিতরণীর একটি টীকা গ্রন্থ লিখেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names. I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কচ্চান

কচ্চান বা কচ্চায়ন একটি পারিবারিক নাম, যেমন কচ্চানগোত্ত বা কাত্যায়ন গোত্র। সংযুত্তনিকায়ে (২য় পৃ. ১৬) উল্লিখিত আছে, কচ্চানগোত্ত নামে একজন ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট গিয়েছিলেন এবং সম্যকদৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। বিনয়পিটকে (৪র্থ, পৃ. ৬) উচ্চ বর্ণের মধ্যে কচ্চানগোত্তের উল্লেখ আছে। মোগ্গল্লান এবং বাসিট্‌ঠ এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কচ্চান সুত্ত

কচ্চান সুত্ত বা মহাকচ্চান সুত্ত অঙ্গুত্তর নিকায়ের (৩য়, পৃ. ৩১৪) অন্তর্ভুক্ত একটি সুত্র। ইহা বুদ্ধশিষ্য কচ্চান বা মহাকচ্চান বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি ও দেবতানুস্মৃতি সম্পর্কে দেশনা করেছেন।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কচ্চানা

রাজকুমারী কচ্চানা দেবদহের দেবদহ শাক্যের কন্যা। রাজা সিংহহনুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁদের পাঁচটি পুত্র সন্তান এবং দুটি কন্যা জন্মেছিল, যথা—সুদ্ধোদন, ধোতোদন, সক্কোদন, সুক্কোদন, অমিতোদন, অমিতা ও পমিতা (মহাবংস, ২য় ১৭-২০)

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কচ্চানি জাতক (কাত্যায়নী জাতক)—৪১৭

শ্রাবস্তী নগরে বুদ্ধের একজন মাতৃভক্ত উপাসক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবত জ্ঞানে খুব সেবা করতেন, খাওয়া-দাওয়া, স্নান ইত্যাদি সব কাজে সহায়তা করতেন। একদিন মা বললেন, ''বাবা, আমাদের সমকুল থেকে একটি মেয়ে এনে বিয়ে কর, তাহলে আমায় সেবা করবে, তুমি গৃহস্থের অন্য কাজ সব করতে পারবে।'' পুত্র বললেন, ''মা, আমার মত তোমায় কে সেবাযত্ন করবে? আমি বিয়ে করতে পারব না। তোমার মৃত্যু হইলে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।'' পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও যখন পুত্রকে রাজী করাতে পারলেন না তখন মাতা তাঁর সম্মতি না নিয়েই এক পাত্রী এনে পুত্রের বিয়ে দিলেন।

বধূটি স্বামীর সাথে সমান উৎসাহে শাশুড়ীর সেবা করতে লাগল। উপাসক তাতে খুশি, পত্নীর জন্য ভাল ভাল খাবার আনতে লাগলেন। তাতে পত্নী মনে করল স্বামী বোধ হয় মাকে তাড়িয়ে দিতে চান। তাড়াবার আরো সুযোগ দেবার জন্য শাশুড়ীকে বেশি করে অত্যাচার ও নানা ছুঁতায় মিথ্যা দোষারোপ করতে লাগতে লাগল। বৃদ্ধার প্রতি পুত্রকে বিরূপ করার জন্য বধূটি আরও একটি উপায় অবলম্বন করল। সে যত্রতত্র কফ, থুথু ও পাকা চুল ফেলতে ও রাখতে রাখল। তার স্বামী জিজ্ঞেস করল, কে সমস্ত ঘর এরূপ নোংরা করেছে? রমণী বলল 'তোমারই মা জননী, ফেলতে নিষেধ করলে তিনি ঝগড়া করেন। আমি এমন কালকর্ণীর সঙ্গে এক ঘরে বাস করতে পারব না, তুমি হয় এঁকে নিয়ে ঘর কর নয় আমাকে রাখ।'' এই কথা শুনে কুলপুত্র বললেন, ''ভদ্রে, তুমি যুবতী, তুমি যেখানে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে। আমার মা কিন্তু অতি দুর্বলা, আমি ভিন্ন তাঁর আর কোন অবলম্বন নেই। সুতরাং তুমি বাপের বাড়ী গিয়ে থাক।'' এই উত্তর শুনে বউ খুব ভয় পেল এবং মায়ের প্রতি স্বামীর মন বিরূপ করা অসাধ্য বুঝতে পেরে আগের মত শাশুড়ীর সেবা করতে লাগল।

অতঃপর উপাসক বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে পত্নীর সব কথা বললেন। তখন বুদ্ধ বললেন—অতীতে ও এরকম হয়েছিল। এজন্মে তুমি ঐ রমণীর কথামত কাজ করনি বটে, কিন্তু পূর্বে এর কথাতেই তুমি মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।'' অনন্তর উপাসকের অনুরোধে বুদ্ধ অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে খুব সেবা যত্ন করতেন। এরপর উপরে বর্ণিত বিবরণ মত মাতা পুত্রকে বিবাহ দিয়ে একটি বধূ ঘরে আনলেন। কিন্তু সে মাতাকে সেবা যত্ন করতে রাজী হল না। একদিন সে তার স্বামীকে বলল, ''আমি এমন অলুক্ষুণে শাশুড়ীর সঙ্গে থাকতে পারব না।

তুমি হয় মায়ের সঙ্গে থাক না হয় আমাকে নিয়ে সংসার কর। কুলপুত্রের স্ত্রী এই কথা বললে, তিনি তাকে বিশ্বাস করলেন এবং মায়ের দোষ মনে করে মাকে বললেন, 'মা, তুমি প্রত্যহ বাড়ীতে ঝগড়া কর, কাজেই অন্যত্র গিয়ে থাক।" বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিল এবং মজুরি করে অতিকষ্টে দিন কাটাতে লাগল।

শাশুড়ী চলে যাওয়ার পরে পুত্রবধূ গর্ভবতী হল। সে স্বামী ও পড়শীদের বলে বেড়াতে লাগল, "ডাইনীটা যদ্দিন ছিল ততদিন আমার গর্ভসঞ্চার হয়নি। এখন হয়েছে।" যথাসময়ে সে পুত্র সন্তান প্রসব করল। তখন সে স্বামীকে বলল, "তোমার মা চলে যাওয়াতে আমার ছেলে হয়েছে, কাজেই এতে বোঝা যে সে প্রকৃত ডাইনী।" বৃদ্ধা সব শুনল এবং ভাবল, "পৃথিবীতে নিশ্চয়ই ধর্মের মরণ হয়েছে। ধর্ম যদি না মরবে, তাহলে মাকে তাড়িয়ে দিয়ে কেউ পুত্র লাভ করতে ও সুখে থাকতে পারে? আমি ধর্মের পিণ্ডি দেব।" এই ঠিক করে সে একদিন কিছু তিলবাটা, চাউল পাক করবার পাত্র নিয়ে শ্মশানে গেল। তিনটি মানুষের মাথার খুলি দিয়ে উনান তৈয়ার করে আগুন জ্বেলে জলে নামল এবং স্নান করে উনানের সামনে বসল।

সে সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছিলেন। তিনি জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করবার সময় দেখলেন বৃদ্ধা মনের দুঃখে ধর্ম মরেছে এই বিশ্বাসে ধর্মে পিণ্ডি দেবার আয়োজন করছে। এটা বন্ধ কবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের বেশে বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হলেন এবং গাথায় তার এই আয়োজনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বৃদ্ধা ও গাথায় উত্তর দিল।

তখন ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে বৃদ্ধা বলল ধর্ম যে মরেছে তার প্রমাণ সে পেয়েছে। ধর্ম না মরলে পাপীরা কি শাস্তি পাওয়ার বদলে পরম সুখে বাস করে? তার পুত্রবধূ তাকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন গৃহের অধীশ্বরী হয়ে বসেছে এবং পুত্রবতী হয়ে বলছে শাশুড়ী ডাইনী থাকার জন্য এতদিন গর্ভধারণ করতে পারে নি। তখন ইন্দ্র (শক্র) আত্মপ্রকাশ করে বললেন যে তিনি ধর্ম এবং এখনো মরেন নি, যে পুত্র বৃদ্ধাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিয়েছে, ইচ্ছে করলে বৃদ্ধার হিতের জন্য তাকে পুত্রসহ ভস্মীভূত করবেন। কিন্তু পৌত্রের এবং নিজের হিতার্থে একসঙ্গে থাকার জন্য বৃদ্ধা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করল। বৃদ্ধাকে আশ্বাস দিয়ে শক্র নিজস্থানে চলে গেলেন। বৃদ্ধার পুত্র ও পুত্রবধূ হঠাৎ বৃদ্ধার গুণের কথা স্মরণ করে ক্ষমা চাইবার জন্য তার খোঁজে শ্মশানে গেল এবং মিলিত হয়ে সম্প্রীতিভাবে একত্র বাস করতে লাগল। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন বর্তমানের কুলপুত্র উপাসক ও তার পত্নী ছিল অতীতের কুলপুত্র ও তার পত্নী।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll, Jātaka with commentary, Vol. III; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক ৩য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

১৭ কচ্চায়ন থের

কচ্চায়ন থের প্রাচীনতম ব্যাকরণ গ্রন্থ 'কচ্চায়ন-ব্যাকরণ' এর রচয়িতা। তিনি একজন পালি ও সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত বৈয়াকরণ ছিলেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্য মতে কচ্চায়ন এবং

বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন অভিন্ন ব্যক্তি। বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন ও একজন ভাষ্যবিশারদ ও ভাষ্যকার ছিলেন এবং তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন (সংখিত্তেন ভাসিতসস বিত্থারেন অত্থং বিভজন্তানং—অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪) মহাকচ্চায়নের এই সুখ্যাতি যে বহু শতাব্দীকাল বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল তা আমরা দীপবংস থেকে জানতে পারি। কচ্চায়ন ব্যাকরণের লেখক এই কারণে কচ্চায়ন এই নামটি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। জি. পি. মালালসেকেরার মতে তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং খৃষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতকে জীবিত ছিলেন। গন্ধবংসের মতে কচ্চায়ন কচ্চায়নগন্ধ, মহানিরুত্তিগন্ধ, চূলনিরুত্তিগন্ধ, পেটকোপদেসগন্ধ, নেত্তিগন্ধ ও বন্নীতি গন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

[দ্রষ্টব্য : G. P. Malalasekera's Dictionary of Pali Proper Names I; বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধসাহিত্য, পৃ. ১৭১-১৭২।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

১২ কচ্চায়নভেদ

কচ্চায়নভেদ (অন্য নাম কচ্চায়নভেদ দীপিকা) আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের খোতনের অধিবাসী মহাযস কর্তৃক কচ্চায়ন-ব্যাকরণ সম্পর্কে লিখিত একটি ব্যাখ্যা পুস্তক। স্থবির অরিয়ালঙ্কার লিখিত সারত্থবিকাসিনী নামে কচ্চায়নভেদের একটি টীকা গ্রন্থ আছে।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

১৯ কচ্চায়নযোগ

কচ্চায়নযোগ—ব্যাকরণের সূত্রগুলি নিয়ে একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২০ কচ্চায়নবণ্ণনা

কচ্চায়নবণ্ণনা সিংহলের স্থবির বিজিতাবী লিখিত কচ্চায়ন ব্যাকরণের সন্ধিকল্পের ওপর একটি ভাষ্যগ্রন্থ।

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২১ কচ্চায়ন ব্যাকরণ

থেরবাদী বৌদ্ধদের প্রচেষ্টায় পালি সাহিত্য কালক্রমে বৃহদাকার ধারণ করে এবং সেই সঙ্গে তাঁরা পালি ভাষাকে বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে এনে গ্রন্থাদি রচনার উপযোগী করবার ব্যাকরণ লিখতে আরম্ভ করেন। পালি ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বিশেষত: পাণিনির পদ্ধতি অনুসরণ করে পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। পালি ব্যাকরণ

রচনার তিনটি ধারা দৃষ্ট হয়। কচ্চায়ন ব্যাকরণকে ভিত্তি করে রূপসিদ্ধি, মহানিরুত্তি, চুল্লনিরুত্তি, কচ্চায়নভেদ প্রভৃতি নিয়ে একটি ধারা এবং মোগ্গল্লান ব্যাকরণকে ভিত্তি করে মোগ্গল্লানবৃত্তি, পয়োগসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তৃতীয় ধারা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের পাগানরাজ নরপতিসিথুর (১১৬৭-১২০২) শিক্ষক অগ্গবংস রচিত বিখ্যাত পালি ব্যাকরণ গ্রন্থ সদ্দনীতি। ইহা শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ রূপে স্বীকৃত।

সমস্ত পালি ব্যাকরণের মধ্যে কচ্চায়ন ব্যাকরণ প্রাচীনতম। কচ্চায়ন থের ইহার রচয়িতা। বৌদ্ধ ঐতিহ্যমতে কচ্চায়ন ছিলেন ভাষা বিশারদ ও ভাষ্যকার বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্চায়ন বা মহাকচ্চান। কিন্তু কচ্চায়ন ব্যাকরণ এত প্রাচীন হওয়া সম্ভব নয়। ইহার রচয়িতা আনুমানিক ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি যে সুপণ্ডিত বৈয়াকরণ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কচ্চায়ন ব্যাকরণের বহু সূত্র অষ্টাধ্যায়ী ও কাতন্ত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কচ্চায়ন ব্যাকরণকেই প্রথম সুসংবদ্ধ পালি ব্যাকরণ গ্রন্থ বলা যায়। ইহা সন্ধিকপ্প, নামকপ্প, আখ্যাতকপ্প ও কিতবিধান কপ্প এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত।

[দ্রষ্টব্য : বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী বৌদ্ধসাহিত্য, পৃ. ১৭১-১৭২]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২২ কচ্চায়নসার

কচ্চায়নসার আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থবির মহাযস লিখিত কচ্চায়ন-ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার। এতে বালাবতার, রূপসিদ্ধি, চুলনিরুত্তি এবং সম্বন্ধচিন্তা প্রভৃতি ব্যাকরণ গ্রন্থের অনেক উদ্ধৃতি আছে। এর ওপর একটি টীকাগ্রন্থ মহাযস নিজে লিখেছেন এবং সম্মোহবিনাসিনী নামে অন্যটি স্থবির সদ্ধম্মবিলাস লিখেছেন।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২৩ কচ্ছপ জাতক—১৭৮

শ্রাবস্তীতে জেতবনে শাস্তা বুদ্ধ যখন অবস্থান করছিলেন তখন এক ব্যক্তি সংক্রামক অহিবাতক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি ও তদীয় পত্নী একমাত্র পুত্রকে বাড়ী থেকে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। পুত্র মাতাপিতার পরামর্শে পলায়ন করল এবং রোগ প্রশমিত হলে আবার বাড়ীতে ফিরে সুখে বাস করতে লাগল। এই ব্যক্তি একদিন নানা উপহার নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলে শাস্তা তাকে বললেন, "শুনেছি তোমার বাড়ীতে অহিবাতক রোগ হয়েছিল, কি উপায়ে তার থেকে মুক্তি পেলে বল।" তার উত্তরে সেই উপাসক সমস্ত কথা খুলে বলল। তখন শাস্তা বললেন—"পূর্বে ও এরকম ঘটনা ঘটেছিল যে সকল প্রাণী আসক্তিবশতঃ আপৎকালে বাসস্থান পরিত্যাগ করেনি তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।" অনন্তর উপাসকের অনুরোধে শাস্তা অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন :—

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুম্ভকাররূপে জন্মে ঐ বৃত্তি দ্বারা

স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করতেন। সেই সময় বারাণসীর কাছে একটি হ্রদ ছিল এবং হ্রদের সঙ্গে নদীর যোগ ছিল। যখন জল বেশি হত তখন হ্রদ আর নদী এক হয়ে যেত আবার জল কমলে পৃথক্ হয়ে যেত। যে সকল মৎস্য ও কচ্ছপ ঐ হ্রদে জন্মেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল ঐ বছর অনাবৃষ্টি হবে। কাজেই জল থাকতে থাকতে তারা নদীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। কেবল যায়নি একটি কচ্ছপ। সে ভেবেছিল, "এই হ্রদে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, আমার মাতাপিতা এখানে বাস করে গেছেন, আমি এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না।"

সে বছর গ্রীষ্মকালে হ্রদের সব জল শুকিয়ে গেল। কচ্ছপ একটি গর্ত করে তার মধ্যে ঢুকল। কুম্ভকার বোধিসত্ত্ব মাটি তুলতে এসে ঠিক ঐ জায়গায় কোদালের ঘা দিলেন, সেই আঘাতে কচ্ছপের পিঠের হাড় ভেঙে গেল। বোধিসত্ত্ব কচ্ছপকে তুলে মাটির উপর ফেলে দিলেন। কচ্ছপ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভাবল "হায়, আমি বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি ফলে মারা গেলাম বলে দুটি গাথায় দুঃখ প্রকাশ করতে করতে মারা গেল। বোধিসত্ত্ব তখন মৃতদেহ নিয়ে গ্রামবাসীদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিলেন যে, কেউ যেন কচ্ছপের মত আসক্ত না হয়। আসক্তি সর্বনাশের মূল। সমস্ত লোক বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত জীবন যাপন করে দানাদি পুণ্যকর্ম করে পরিণামে স্বর্গগামী হল। অতীত কাহিনী শেষ হলে বুদ্ধ বললেন তখন আনন্দ ছিলেন সেই কচ্ছপ, এবং আমি ছিলাম সেই কুম্ভকার।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll, Jataka with commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কচ্ছপ জাতক—২১৫

শাস্তা বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করবার সময়ে দেবদত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কোকালিকের বাচালতার পরিণাম সম্পর্কে ভিক্ষুদের এই অতীত কাহিনী বলেছিলেন। অতীতে বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মন্ত্রীপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর উপদেষ্টাপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু রাজা বড় বাচাল ছিলেন; একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চান না, বোধিসত্ত্ব রাজার এই বাচালতা দোষ দূর করবার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঐ সময়ে হিমালয় অঞ্চলে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত এবং তার সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল দুটি হাঁসের যারা তাদের বাসস্থান চিত্রকূট পর্বতের কাঞ্চনগুহা থেকে ঐ সরোবরে আহারে সন্ধানে একদিন হাঁসেরা কচ্ছপকে অনুরোধ করল তাদের সঙ্গে কাঞ্চন গুহায় যেতে। কচ্ছপ বলল—'আমি কি করে সেখানে যাব?' হাঁসেরা বলল—আমরাই নিয়ে যাবো তুমি যদি কথা না বলে মুখ বন্ধ করে থাকতে পার। কচ্ছপ তাতে রাজী হল। তখন হাঁসেরা একটা দণ্ড এনে ওটার মাঝখানে কচ্ছপকে কামড়ে ধরতে বলল এবং নিজেরা ঠোঁট দিয়ে দুপাশে ধরে আকাশে উড়তে লাগল। কচ্ছপকে ঐভাবে নিয়ে যেতে দেখে গ্রামের ছেলেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "দেখ, দেখ, দুটি হাঁস লাঠি দিয়ে একটা কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছে।" ছেলেদের কথা শুনে

কচ্ছপের বলতে ইচ্ছে হল—"অরে দুষ্ট ছেলেরা, আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তোদের কি রে?" বলতে গিয়ে যেই হাঁ করেছে অমনি পড়ে গেল; পড়বি পড় বারাণসী রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এবং পড়েই তার পিঠ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে মরে গেল। লোকের কোলাহল শুনে রাজা অমাত্য পরিবৃত হয়ে বোধিসত্ত্বকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"পণ্ডিতবর, এই কচ্ছপটা পড়ে গেল কেন?" বোধিসত্ত্ব এতদিনে রাজাকে বাচালতার জন্য উপদেশ দেবার সুযোগ পেল। তিনি অনুমান করলেন যে এই কচ্ছপের সঙ্গে হাঁসদের বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং দণ্ডে করে কচ্ছপকে সম্ভবতঃ নিয়ে যাচ্ছিল এবং কথা বলতে গিয়ে দণ্ড থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। এই চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন—মহারাজ, যারা অতি মুখর এবং জিহ্বা সংযত রাখতে পারে না তাদের এরূপ দুর্দশা হয়ে থাকে। রাজা বুঝলেন বোধিসত্ত্ব তাঁকেই লক্ষ্য করে একথা বলছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে বোধিসত্ত্ব বললেন—"মহারাজ, আপনি হোন বা অন্য কেউ হোক, অসংযত ভাষীদের এরূপ দুর্গতি ঘটে থাকে।" বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলে বললে তদবধি রাজা জিহ্বা সংযত করে মিতভাষী হলেন। এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন তখন কোকালিক সেই কচ্ছপ, সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন হাঁস দুটি আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য। এই জাতক এবং পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত আকাশচর কূর্মের কথা একরকম।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll, Jātaka with commentary, Vol. II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২৫ কজঙ্গল

কজঙ্গল প্রাচীন অঙ্গ মহাজনপদের পূর্বদিকে মজ্ঝিম দেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত একটি উপনগরী। এর বাইরে মহাশালা একটা গ্রাম। বুদ্ধের সময়ে কজঙ্গল ছিল প্রাচুর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ স্থান এবং ভগবান বুদ্ধের পদার্পণে পবিত্রভূমি বুদ্ধ যখন স্থানীয় বেণুবনে অবস্থান করছিলেন তখন শিষ্যগণ তাঁর নিকট একটি ধর্মোপদেশ শুনে তার ব্যাখ্যার জন্য ভিক্ষুণী কজঙ্গলার কাছে গিয়েছিলেন এবং মুখেলুবনে অবস্থানকালে বুদ্ধ পরাশরীয় ব্রাহ্মণের শিষ্য উত্তরের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন তা মজ্ঝিমনিকায়ের তৃতীয় খণ্ডের ইন্দ্রিয় ভাবনা সূত্রের বিষয়বস্তু। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ঐতিহ্য কজঙ্গলে বর্তমান ছিল। মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থের মতে বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন কজঙ্গলের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রীক রাজা মিলিন্দের (Minender) সঙ্গে তাঁর বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে যে কথোপকথন তা নিয়ে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন। তার মতে অঙ্গ জনপদের চম্পা নগরীর ৪০০ লি (৬৭ মাইল) পূর্বে অবস্থিত Ka-cha-wen-kilo বা কজঙ্গলের পরিসীমা ছিল ২০০০ লি (৩৩৩ মাইল বিস্তৃত) জমি উর্বর, জলবায়ু উষ্ণ এবং জনসাধারণ কৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর পরিদর্শনের সময় কজঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম তত সমৃদ্ধ ছিল না। তিনি ৬/৭টি বিহারে

আবাসিক প্রায় ৩০০ ভিক্ষু দেখতে পেয়েছিলেন যেখানে হিন্দু মন্দির ছিল দশটা। রাজা হর্ষ শিলাদিত্য পূর্ব ভারতে অভিযানের সময় কজঙ্গলে শিবির স্থাপন করেছিলেন। কানিংহাম রাজমহলের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমান কাঁকজোল শহর আর প্রাচীন কজঙ্গল অভিন্ন বলে নির্দেশ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৭; Watters ; On Yuan Chwang, II pp. 182-83 Ancient Geography of India, P. 548.

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২৬ কজঙ্গলা

কজঙ্গলা বুদ্ধের সময়ে কজঙ্গলের একজন পণ্ডিত ভিক্ষুণী। বুদ্ধ যখন কজঙ্গলের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন তখন কজঙ্গলের গৃহী ভক্তগণ (উপাসক) ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁদের বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে দশটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশ দেন। তাঁরা সেই উপদেশ সম্যক্ বুঝতে না পেরে কজঙ্গলা ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হন এবং বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। এইজন্য বুদ্ধ কজঙ্গলার খুব প্রশংসা করেন (অঙ্গুত্তরনিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃ ৫৪)। কজঙ্গলার বিষয়গুলির ব্যাখ্যা খুদ্দকপাঠ-অট্ঠকথায় (পৃ ৮০, ৮৩, ৮৫) উদ্ধৃত হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, I.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কঞ্চনক্‌খন্ধ জাতক (কাঞ্চনখণ্ড জাতক)—৫৬

'শ্রাবস্তীর জনৈক ভদ্রলোক বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁর আচার্য-উপাধ্যায়গণ তাঁকে একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শীল বা নীতি-সদাচার শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। ক্রমাগত এ সকল এই সকল উপদেশ শুনে ঐ ভিক্ষু ভাবতে লাগলেন যে এত শীল পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তার থেকে গাহস্থ্য জীবনেই ফিরে যাওয়াই ভাল হবে। এই ভেবে অন্য ভিক্ষুদের তাঁর অভিপ্রায় জানালে তাঁরা তাঁকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধ সব শুনে অন্য ভিক্ষুদের বললেন—"তোমরা এঁকে যতদূর শীলরক্ষার ক্ষমতা আছে তাই দেবে, তার বেশী নয়।" তারপর ঐ ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে বহুশীল অভ্যাস করতে হবে না, দু-তিনটি শীল রক্ষা করলেই হবে। ভিক্ষু সানন্দে রাজী হয়ে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার ও মনোদ্বার রক্ষার শীল পালন করতে লাগলেন, আর গার্হস্থ্য, জীবনে ফিরে যেতে হ'ল না এবং ক্রমে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন। এইভাবে বুদ্ধের শিক্ষার গুনে অতিগুরুভারও খণ্ড খণ্ড করে বহন করলে হাল্কা বোধ হয়। অতীতে পণ্ডিতেরা ও অতি বড় এক খণ্ড সুবর্ণ পেয়ে প্রথমে তুলতে পারেন নি, পরে ওটা খণ্ড খণ্ড করে অনায়াসে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বুদ্ধ সেই অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কৃষকরূপে জন্মেছিলেন। তাঁর কৃষিক্ষেত্রে পূর্বে একজন শ্রেষ্ঠী বড় আকারের সুবর্ণখণ্ড মাটির নীচে পুঁতে রেখে

মারা যায়। বোধিসত্ত্ব জমি চষবার সময় লাঙ্গলে ঠেকে যায়; তিনি খনন করে দেখেন উহা কাঞ্চন খণ্ড। কাজ শেষে বাড়ী ফিরবার সময় তিনি ওটা তুলতে গেলেন। কিন্তু পারলেন না। শেষে তিনি কাঞ্চনখণ্ডকে চার টুকরা করে কেটে এক একটা করে ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর বোধিসত্ত্ব দানাদি পুণ্যকার্য করে জীবন কাটালেন।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll Jātaka with commentary, Vol I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কটত্তা কম্ম

কটত্তা কম্ম অর্থাৎ কৃতত্ব অথবা সঞ্চিত কর্ম (stored up or reserved action)। যে কর্ম কৃত হয়েছে অথচ বিস্মৃত হয়েছে তাই কৃতত্ব কর্ম। জন্মজন্মান্তর ধরে কৃত কর্মবীজ ব্যক্তি চিত্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। কৃতত্ব কর্ম, গুরু কর্ম (weighty action), অচরিত কর্ম (আচিন্ন কম্ম বা habitual action) ও আসন্ন বা মরনাসন্ন কর্ম (death proximate action) থেকে দুর্বলতর। এই তিন প্রকার কর্মের অনুপস্থিতে কৃতত্ব কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়।

[দ্রষ্টব্য : Nyanatiloka, Buddhist Dictionary, p. p 78-79 ; সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, পৃ. ১৪১; Bela Bhattacharya, Facets of Early Buddhism, p 131.]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

২৮ কটমোরকতিস্‌স (কটমোরকতিস্‌সক)

কটমোরক তিস্‌স বুদ্ধের সময়কালীন একজন ভিক্ষু। কোকালিক, খণ্ডদেবীপুত্ত, সমুদ্দদত্ত, প্রভৃতির সঙ্গে যখন দেবদত্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘে বিভেদ আনতে চেষ্টা করেছিলেন তখন কটমোরকতিস্‌সকে তাঁর দলে যোগ দিতে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। ভিক্ষুণী থুল্লানন্দা যে উপাসকের বাড়ীতে নিয়মিত নিমন্ত্রিতা হতেন সেই বাড়ীতে দেবদত্ত, কটমোরক তিস্‌স প্রভৃতি ভিক্ষুর পরিবর্তে একদিন সারিপুত্র মোগ্গল্লান, মহাকচ্চান, প্রভৃতি ভিক্ষুদের নিমন্ত্রিত দেখে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। এতে বোঝা যায় ভিক্ষুণী থুল্লানন্দা ভিক্ষু কটমোরকতিস্‌সকে খুব সম্মান করতেন।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, I]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কটাহক জাতক - ১২৫

বুদ্ধ-শাস্তা শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করবার সময় ভিক্ষুদের অনুরোধে জনৈক আত্মশ্লাঘা পরায়ন ভিক্ষু সম্পর্কে এই অতীত কাহিনী বলেছিলেন।

সুদুর অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত একজন মহাবিত্তশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ঠিক ঐদিন তাঁর দাসীও পুত্র প্রসব করে। শিশু দুটি এক সঙ্গে বড় হতে লাগল। তার নাম রাখা হল কটাহক। শ্রেষ্ঠী পুত্র

যখন বিদ্যালয়ে যেত দাসী পুত্রও অনুচর রূপে যেত। ঐভাবে দাসীপুত্র কয়েকটি শিল্প-শিক্ষা করল এবং কালক্রমে একজন সুদর্শন যুবক হয়ে উঠল। সে শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত হল। কটাহক কিন্তু শ্রেষ্ঠীপুত্র পরিচয়ে শ্রেষ্ঠীর সই জাল করে চিঠি নিয়ে প্রত্যান্তবাসী শ্রেষ্ঠীর বন্ধুর কাছে গেল এবং শ্রেষ্ঠীকন্যাকে বিয়ে করে বহাল তবিয়তে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য ইত্যাদি প্রত্যন্তের সব কিছুর নিন্দা করতে লাগল। শ্রেষ্ঠীকন্যা মুখ বুঝে সহ্য করল।

এদিকে বোধিসত্ত্ব কটাহককে দেখতে না পেয়ে খোঁজ নিতে চারদিকে লোক পাঠালেন এবং কটাহকের কীর্তি জানতে পেরে ভাবলেন, "কটাহক বড় অন্যায় করেছে, আমি গিয়ে তাকে ফিরে আনছি।" বোধিসত্ত্বের আসার খবর শুনে কটাহক তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং ভাবল, "এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় এই যে, আমি প্রত্যুদগমন করে প্রভুর শরণ নিই এবং আগের মত দাস রূপে সেবা করি।" যখন সে জানতে পারল যে বোধিসত্ত্ব প্রত্যন্তের কাছাকাছি এসেছেন তখন শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে এবং বহু উপঢৌকন নিয়ে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রণাম পূর্বক সেবা করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত প্রীত হলেন। তখন কটাহক তাঁকে অনুরোধ করল যেন প্রভু দয়া করে তার শ্বশুর বাড়ীতে প্রতিপত্তি খর্ব না করেন। বোধিসত্ত্ব তাকে আশ্বাস দিয়ে একদিন শ্রেষ্ঠী কন্যাকে ডেকে মিষ্টভাবে বলল—মা, আমার পুত্রটি তোমার সঙ্গে সুখে সম্প্রীতিতে সংসার করছে ত? শ্রেষ্ঠীকন্যা বলল, আর্য্য আমার স্বামীর কোন দোষ নেই, শুধু তিনি খাদ্যদ্রব্যের, খুব নিন্দা করেন।" —"মা, তার এই দোষ চিরকালই আছে। তোমাকে আমি একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এবার থেকে ভোজনকালে নিন্দা করলে মন্ত্রটি পাঠ করবে।" তারপর বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে ফিরে গেলেন। তখন কটাহকের অহঙ্কার আরো বেড়ে গেল। একদিন শ্রেষ্ঠীকন্যা স্বামীর জন্য উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত করে স্বহস্তে পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু কটাহক সেই খাদ্যেরও নিন্দা করতে আরম্ভ করল। তখন শ্রেষ্ঠীকন্যা গাথায় সেই মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। তার মর্মার্থ হল—কটাহক তোমার বড়াই করা সাজেনা। কাজেই চুপটি করে খাবার খেয়ে যাও। কটাহক ভাবল, তার পরিচয় আর গোপন নেই। তার অহঙ্কার চূর্ণ হল। আর খাবারের নিন্দা না করে যা পেত তা নীরবে খেয়ে যেত। কাহিনী শেষে বুদ্ধ বললেন—এই অহঙ্কারী ভিক্ষু ছিল কটাহক এবং তিনি ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।

[দ্রষ্টব্য : V. Fousboll Jātaka with Commentary, Vol. I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক ১ম খণ্ড।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

৩১ কটিস্‌সভ

কটিস্‌সভ বৈশালীর নিকটবর্তী নাদিকা নামক স্থানের বুদ্ধের উপাসক। মহাপরিনির্বাণ লাভের পূর্বে বুদ্ধ অন্তিম যাত্রাকালে নাদিকায় গিয়েছিলেন। তখন কটিস্সভ দেহত্যাগ করেছেন। "তাঁর গতি এবং পরলোকে তাঁর নিয়তি কি" আনন্দের এই প্রশ্নের—উত্তরে বুদ্ধ বললেন যে কটিস্‌সভ উপাসক সৎকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ

কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ প্রভৃতি পাঁচটি অবরভাগীয় (কামলোক সম্পর্কিত) সংযোজন বিনষ্ট করেছেন। সুতরাং পুনর্জন্ম হবে না এবং ঐ অবস্থাতেই পরিনির্বাণ লাভ হবে।

[দ্রষ্টব্য : মহাপরিনিব্বান সুত্তন্ত।]

বিনয়েন্দ্র চৌধুরী

কটিস্সহ থের

একজন বিশিষ্ট অর্হৎ ছিলেন, বৈশালীর কুটাগারশালায় বুদ্ধের সঙ্গে বসবাসকারী একজন থের। বুদ্ধকে পরিদর্শনের জন্য যখন বহুসংখ্যক লিচ্ছবি আসতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা বিহার পরিত্যাগ করে গোসিঙ্গ শালবনের[১] মত নির্জন স্থানে বিশ্রামের জন্য গমন করেছিলেন।

১। অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. Dictionary of Pali Proper Names, Vol I. P. 487.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কটুবিয় সুত্ত

এক সময় ভগবান বুদ্ধ যখন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গমন করছিলেন, ডুমুর বৃক্ষের পাশে তিনি একজন ভিক্ষুকে দেখতে পেলেন। এই স্থানটি ছিল ইসিপতনের ধারে একটি গবাদি চারণ ক্ষেত্র। এই ভিক্ষুটি শূন্যগর্ভ বহি আনন্দানুভূতিতে পরম আনন্দিত ছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন যে ব্যক্তি দূষিত তার উপর মক্ষিকুল অবস্থান করে এবং আক্রমণ করে এবং দুর্গন্ধ পচা মাংসের ন্যায় বিগলিত হয়। এই কথা শ্রবণ করে ভিক্ষুটি খুবই ভীত হল। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ সম্মিলিত ভিক্ষুদেরকে সতর্কীকরণের উপদেশটি পুনরাবৃত্তি করলেন। লোভে দূষিত, অপকারেচ্ছা, দুর্গন্ধ গলিত পচা মাংস, মক্ষিকুলরূপ কুচিন্তা কি তা ব্যাখ্যা করলেন।[১]

১। অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G.P., Dictionary of Pali Proper Names Vol. I. P. 487.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কট্ঠহারি (কাষ্ঠহারি) জাতক (জাতক নং ৭)

ভগবান বুদ্ধ জেতবনে বাসব ক্ষত্রিয়া সম্বন্ধে এই জাতক কাহিনীটি বলেছিলেন। বাসব ক্ষত্রিয়া মহারাজা শাক্যের ঔরসে এবং নাগমুণ্ডা নামে এক নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে কোশল রাজের মহিষী হন এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেন। এরপর কোশল রাজ বাসব ক্ষত্রিয়া নীচকুলজা তা জানতে পেরে পুত্রসহ তাকে বিতাড়িত করেন।

এই সংবাদ শুনে শাস্তা একদিন পাঁচশত ভিক্ষু নিয়ে রাজভবনে উপনীত হলেন এবং রাজাকে বাসব ক্ষত্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শাস্তাকেক

জানালেন। তখন শাস্তা বললেন বাসব ক্ষত্রিয়ার জন্ম রাজকুলে, বিবাহ রাজকুলে এবং পুত্র সন্তানও রাজপুত্র। অতএব রাজকুমার পৈতৃক রাজ্য থেকে বঞ্চিত হবে কিভাবে। এরপর শাস্তা প্রাচীনকালেও যে কোন এক রাজা এক কাষ্ঠহারিণীর পুত্রকে রাজ্য দান করেছিলেন তার গল্প আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্ত উদ্যান বিহারে গিয়ে ফলপুষ্পাদি আহরণ করতে করতে এক কাষ্ঠাহরিণীকে গান গাইতে দেখলেন। ব্রহ্মদত্ত তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে গান্ধর্ববিধানে বিয়ে করলেন এবং একটি স্বনামাঙ্কিত আংটি দিয়ে বললেন যদি তোমার গর্ভে কন্যা সন্তান জন্মে তবে এই আংটি বিক্রি করে তার ভরণপোষণ করো আর যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তুমি আংটিসহ আমার কাছে এসো।

যথা সময়ে সেই রমণী বোধিসত্ত্বকে জন্ম দিল। বোধিসত্ত্ব বড় হলে 'নিষ্পিতৃক' এই উপহাস বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের মনে দুঃখ হল। তিনি তাঁর মাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

উপায়ান্তর না দেখে সেই রমণী বোধিসত্ত্বকে আংটিসহ রাজার কাছে উপস্থিত করল এবং প্রণাম করে বলল এই আপনার পুত্র, একে নিন।

সভার মধ্যে রাজা লজ্জা পেয়ে প্রকৃত ঘটনা জেনেও না চিনবার ভান করলেন। তখন সে রাজাকে তাঁর দেওয়া আংটি দেখাল কিন্তু রাজা আংটিটিও তাঁর নয় বলে অস্বীকার করলে নিরুপায় হয়ে সেই রমণী ধর্মের দোহাই দিয়ে পুত্র সন্তানটিকেই আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল যদি প্রকৃত এ পুত্র আপনার না হয় তাহলে ভূমিতে পড়ে নষ্ট হবে অথবা মহাকাশে স্থির হয়ে থাকবে।

বোধিসত্ত্ব মহাকাশে বীরাসনে বসে রইলেন। তা দেখে রাজা বোধিসত্ত্বকে বাহুবিস্তার করে বললেন, 'এস বালক আমিই তোমার ভরণ পোষণ করব।' বোধিসত্ত্বকে নেওয়ার জন্য শত শত লোক বাহু তুলল, কিন্তু বোধিসত্ত্ব রাজার কোলে এসে বসে পড়লেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে উপরাজ্যে নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর মাতাকে মহিষীরূপে বরণ করলেন। কালক্রমে রাজার মৃত্যু হলে বোধিসত্ত্ব 'মহারাজ কাষ্ঠবাহন' এই উপাধি গ্রহণ করে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

সমাধানে শাস্তা বললেন, তখন মহামায়া ছিলেন সেই বনবাসিনী রমণী, শুদ্ধোদন ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত এবং আমি ছিলাম মহারাজ কাষ্ঠবাহন।

[দ্রষ্টব্য ঃ

১। Cowell, E. B., The Jātakas, Vol. I

২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬-২৮]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কঠিনচীবর

কার্তিক মাসে প্রথম বর্ষাবাসের পর ভিক্ষুদের মধ্যে যাবকীয় শিষ্টাচার বিধি সম্পর্কীয় একটি অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ভিক্ষুর পরিহিত পোষাক অতি নিকৃষ্টমানের এবং যিনি বর্ষাবাস ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন তাঁকে একটি চীবর, একটি

সংঘাটি বা একটি উত্তরীয়, বা একটি অন্তরবাস অথবা একটি কাপড়ের খণ্ড প্রদান করা হয়। এইরূপ একজন ভিক্ষুকে নির্বাচন করতে সংঘে ঞত্তিদুতিয়কম্ম অনুষ্ঠিত হয়।[১] সংঘ যদি একখণ্ড অপ্রস্তুত কাপড় গ্রহীতা ভিক্ষুকে প্রদান করে তাহলে তিনি তাঁর তিনটি পরিধানের মধ্যে অর্থাৎ উত্তরাসংঘ, সংঘাটী বা অন্তরবাস যে বস্ত্রটি অধিক প্রয়োজনীয় তা তৈরী করবেন।[২]

কঠিনচীবরের জন্য নির্বাচিত ভিক্ষু পাঁচটি সুবিধা ভোগ করতে পারেন। যথা, ১) দানের (অনামন্তচারো) জন্য আমন্ত্রিত হয়েও তিনি অপর ভিক্ষুদের কোন কিছু না বলে বাইরে যেতে পারেন, (২) তিনি তিনটি পরিধানের (অসমাদানচারো) কোনটি না পরেও থাকতে পারেন, (৩) গণভোজন নিতে পারেন, (৪) অধিটঠনা বা বিকপপ্না না করেই যে কোন সংখ্যক বস্ত্র রাখতে পারেন, (৫) সংঘকে যে চীবর দান করা হয় তার অংশ পাওয়ার সুযোগ থাকে।[৩] এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তিনি কেবল পাঁচ মাস পেতে পারেন।

কোন ব্যক্তি, গৃহী, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রমণী, ভিক্ষুণী, শিক্ষাণবীশ কাপড় বা পরিধেয় দান করলে কঠিন শিষ্টাচারবিধি অনুষ্ঠিত হয়। কাপড় বা বস্ত্রটি নতুন হতে পারে, একটি কম্বল, একটি ছুঁড়ে দেওয়া বস্ত্র হতে পারে (পংসুকুল) অথবা বাজার থেকে ক্রীত একখণ্ড কাড় হতে পারে, কিন্তু এটি কোন প্রকারেই স্বীয় আদেশের দ্বারা গৃহীত হবে না (অনিমিত্তকেন) বা কাউকে চীবর দেওয়ার জন্য প্রবৃত্ত (অপরিকথাকতেন) করে গ্রহণ করা যাবে না। সাময়িক সময়ের জন্যও এইরূপ চীবর গ্রহণ করা যাবে না (অসন্নিধিকতেন)। এটি নিস্সগিয় চীবরও হবে না। এই বস্ত্রটি এমন হবে যা ইতিমধ্যে মলিন হয়ে গেছে (কপ্পকতম্)। বস্ত্রটি পাঁচ বা তার অধিক খণ্ডে বিভক্তি হবে এবং তারপর সেলাই হবে এবং অনুমোদিত ও বিনয়ের নিয়মানুযায়ী হবে।[৪] গ্রহীতা ভিক্ষু বস্ত্রটি গ্রহণ করার সময় উচ্চারণ করবেন, 'ইমায় সংঘাতিয়া (ইমিনা উত্তরাসংঘেন অথবা অন্তরাবাসকেন) কঠিনম্ অথরামি। তারপর ভিক্ষুটি সংঘের কাছে আবেদন করে জ্ঞাপন করবেন যে কঠিনচীবরটি ধর্মাচরণের মাধ্যমে বিছানো হয়েছে এবং তারপর সংঘের অনুমোদন চাইবেন। এরপর সংঘের সমস্ত ভিক্ষুবর্গ এটিকে অনুমোদন দান করবেন।[৫]

পূর্বকরণ সম্বন্ধে যে ভিক্ষু অজ্ঞ সেই ভিক্ষু কঠিনচীবর গ্রহণ করতে পারবেন না, পুরাতন বস্ত্র কিরূপে বিতরণ করতে হয় না জানেন, নতুন বস্ত্র দ্রবীভূত কিরূপে করা হয় না জানেন, কঠিন কিরূপে বিছানো হয় না জানেন, কঠিন কিভাবে স্থানান্তরিত করা হয় না জানেন, পাঁচ প্রকার বাধা কিরূপে অতিক্রম করতে হয় না জানেন, কঠিনের পাঁচ প্রকার সুবিধা কি না জানেন। এইগুলির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হয়ে ভিক্ষু কঠিনচীবর গ্রহণ করতে পারবেন না।[৬]

বিহার সীমার বাইরে বসবাসকারী ভিক্ষু কঠিনের অনুমোদন দিতে পারবেন না। একইভাবে যিনি উচ্চস্বরে 'অনুমোদিত' কথাটি বলতে পারবেন না বা যাঁর কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট নয়, এরূপ ভিক্ষুও এতে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নন।[৭]

আট প্রকার ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে একজন ভিক্ষু কঠিনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। আট প্রকার কি কি?

(১) বিহারে পুনরায় প্রত্যাগমণ না করার উদ্দোশে যদি কোন ভিক্ষু বিহারসীমার পরপারে গমন করেন, (২) যখন কোন ভিক্ষু বিহারসীমা অতিক্রম করে বস্ত্র তৈরী করার জন্য গমণ করেন এবং বিহারে প্রত্যাগমণ করেন না, (৩) বিহারসীমা পার হয়ে বস্ত্র তৈরী করতে যান কিন্তু বস্ত্রও তৈরী করেন এবং বিহারে প্রত্যাবর্তন ও করেন না, (৪) যখন কোন ভিক্ষু বিহারসীমা পার হন এবং কঠিনদুস্স দিয়ে চীবর তৈরী করান কিন্তু বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন না, (৫) যখন কোন ভিক্ষু বিহার সীমা পার হন এবং বস্ত্রও তৈরী করে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু পরে জানতে পারেন তাঁর কাছ থেকে কঠিন তুলে নেওয়া হয়েছে। (৬) যখন কোন ভিক্ষু বিহারসীমা পার হয়ে এক খণ্ড কাপড় সংগ্রহ করে বস্ত্র তৈরী করার উদ্দেশে চলে যান কিন্তু বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন না, পরে কাপড় সংগ্রহ করে বস্ত্রও তৈরী করতে পারেন না, (৭) যখন কোন ভিক্ষু বিহারসীমা ছেড়ে চলে যান এবং কাপড় সংগ্রহ করে বস্ত্রও তৈরী করেন এবং একদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন না, সেইরূপ ভিক্ষু কঠিনচীবরের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, ৮) যখন কোন ভিক্ষু বিহার সীমা ছেড়ে চলে যান এবং বস্ত্র তৈরী করার পর ফিরে আসার ইচ্ছা থাকে কিন্তু পরে তিনি মনস্থ করেন কঠিনচীবরের সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে বিহারের অপর কোন ভিক্ষুকে তা পাওয়ার সুযোগ করে দেন এবং বিহারের অপর ভিক্ষুরা তাঁর প্রস্তাবে সহমত হন।[৯] এবং এইভাবে তিনি কঠিনচীবর থেকে বঞ্চিত হন।

১। মহাবগ্গ, পৃঃ ২৬৬; পরিবার, পৃঃ ৩১০; সামন্তপসাদিকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭৩।

২। মহাবগ্গ, পৃঃ ২৬৭

৩। মহাবগ্গ, পৃঃ ২৬৬

৪। পারাজিক, পৃঃ ৩৬৯

৫। মহাবগ্গ, পৃঃ ২৬৭; সামন্তপসাদিকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭৪-৭৫

৬। পরিবার, পৃঃ ৩১১

৭। ঐ পৃঃ ৩১০

৮। ঐ পৃঃ ৩১০

৯। মহাবগ্গ, পৃঃ ২৬৭-৮২; পরিবার, পৃঃ ৩১৩-১৫; সামন্তপসাদিকা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭৮-৮০।

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

কণকমুনি (কোণাগমন)

বৌদ্ধসাহিত্যে চব্বিশ জন বুদ্ধের মধ্যে কণকমুনি বা কোণাগমনকে তেইশ নম্বর বুদ্ধ হিসাবে পরিগণিত করা হয় এবং বুদ্ধকল্পে (বুদ্ধকল্পে) দ্বিতীয় বুদ্ধ হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন বলে ধরা হয়। সোভ রাজার রাজধানী সোভবতীর সুভগবতী উদ্যানে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মণ যঞ্‌ঞদত্ত (যজ্ঞদত্ত) তাঁর পিতা ছিলেন এবং মাতার নাম মা তার উত্তরা। তুষিত্‌ সনতুষিত এবং সনতুট্‌ঠ এই তিনটি বিভিন্ন স্থানে তিন হাজার

বৎসর তিনি তাঁর গৃহীজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর প্রধানা পত্নী ছিলেন রুচিগত্তা এবং পুত্রের নাম ছিল সত্থবাহ। হস্তীর পিঠে চড়ে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছিলেন এবং ছয় মাস কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। এই সময় এক ব্রাহ্মণ-কন্যা অগ্নিসোমা তাঁকে পায়েস ভক্ষণ করতে দিয়েছিলেন এবং ঘাসের তৈরী বসার আসন দিয়েছিলেন যবপালক তিন্দুক। তাঁর বোধি-প্রাপ্তি ছিল একটি উদুম্বর বৃক্ষ। একটি মহা-শাল বৃক্ষের পদপার্শ্বে উদুম্বর বৃক্ষের নীচে বসে মৃগদারের সুদস্সন নগরের পাশে তিনি তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন। তিনি ত্রিশ-হাজার শিষ্যকে নিয়ে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম-সভা করেছিলেন। তাঁর শরীর দৈর্ঘ্যে আঠারো হাত লম্বা ছিল। ত্রিশ শত-সহস্র বছরে পর্বতারামে তাঁর মৃত্যু হয় এবং দেহাবশেষগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সবসময়ের পার্শ্বসহচর ছিলেন সোথিয় এবং মখ্য শিষ্য ছিলেন ভিয় ও উত্তর এবং ভিক্ষুণীদের মধ্যে সমুদা ও উত্তরা। প্রধানা গৃহী উপাসক-উপাসিকা ছিলেন যথাক্রমে, উগ্গ ও সোমদেব এবং সিবলা ও সামা। বোধিসত্ত্ব মিথিলার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত এবং পব্বত নামে পরিচিত ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিচ্ছেন শুনে তিনি ভিক্ষান্ন প্রদানের ব্যবস্থা করেন ও পরে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করেন[১]। উগ্গ-বণিক অধ-যোজন বিস্তৃত একটি সংঘারাম বুদ্ধের জন্য নির্মাণ করান[২]।

বুদ্ধের জন্মদিনে সমস্ত জম্বুদ্বীপ ব্যাপী সুবর্ণ বৃষ্টিতে ভরে গেল, এইজন্য তাঁকে কণকাগমন নামে অভিহিত করা হয়। কোণাগমন নামটি বিকৃতরূপ[৩]।

সিংঘলী ঘটনাপঞ্জী অনুযায়ী তিনি এই দ্বীপ (তখন বরদ্বীপ) নামে খ্যাত ছিল। তাঁর ত্রিশ হাজার শিষ্যকে নিয়ে দর্শন করেছিলেন। রাজা সমিধি তাঁকে মহানোম উদ্যানটি প্রদান করেছিলেন এবং তিনি সেখানে ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ধর্মদেশনার পর ত্রিশ হাজার জনসাধারণ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী ভিক্ষুণী কন্টকানন্দা বোধিবৃক্ষের একটি শাখা সিংহলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রত্নমাল, সুদস্সনমাল, এবং নাগমালকে ধর্মোপদেশনা করেছিলেন এবং জনসাধারণের উপাসনার নিমিত্ত তাঁর মেখলা দান করেছিলেন। নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের দেখাশুনার জন্য তিনি মহাসুম্ব ও কন্টকানন্দাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

ভগবান কোণাগমনের সময়ে বেপুল্ল শৃঙ্গ বংকক নামে পরিচিত ছিল এবং এই পর্বতের জনসাধারণকে রোহিতস্স নামে অভিহিত করা হত। এদের জীবনের পরিধি ছিল ত্রিশ হাজার বৎসর[৪]। কোণাগমন উপসোথ অনুষ্ঠান বছরে একবার করতেন[৫]।

উত্তরদেশীয় গ্রন্থগুলিতে[৬] কোণাগমনকে কণকমুনি, কোণাকমুনি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোণাগমনের স্তূপের উপর একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল এবং মহর্ষি অশোক স্তূপটির যা আকৃতি ছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ আকৃতি করে পুনঃনির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর বিংশতিবর্ষ[৭] রাজ্যাভিষেকের সময় স্তূপটিকে পূজা করেছিলেন। হিউ এন সাঙ[৮] এর বর্ণনানুযায়ী কোণাগমনের জন্মস্থানে তিনি স্তূপটিকে দেখেছিলেন এবং এইস্থানে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে ও দেখা করেছিলেন। ফা-হিয়েন[১০] স্তূপটিকে অন্যত্র দেখেছিলেন এবং তিনি কোণাগমন বুদ্ধের মৃত্যুস্থলটিকেও পরিদর্শন করেছিলেন।

১। দীঘ-নিকায়, ১ খণ্ড, পৃঃ ৭;
জাতক, ১ খন্ড, পৃঃ ৪২,

২। ঐ, ১ খন্ড, পৃঃ ৯৪

৩। বুদ্ধবংস-অট্‌ঠকথা, পৃঃ ২১৩-১৪

৪। দীপবংস, ২ : ৬৭; ১৫:২৫, ৪৪, ৪৮; ১৭:৯, ১৭, ৭৩; মহাবংস, ১৫: ৯১-১২৪

৫। সংযুক্ত-নিকায়, ২য় খন্ড, পৃ: ১৯১

৬। ধম্মপদ-অট্‌ঠকথা, ২ খণ্ড, পৃ: ২৩৬

৭। দিব্যাবদান, পৃঃ ৩৩৩

৮। Hultszch : Inscriptions of Asoka, p. 165

৯। Beal, Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 19

১০। Travels, p. 36.

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G.P.-Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p.681-82.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণবের জাতক—(জাতক নং ৩১৮)

একজন ভিক্ষু পুনরায় তাঁর গৃহস্থাশ্রমস্থ স্ত্রীর প্রলোভনে পড়েছিলেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে ভগবান জেতবনে অবস্থানকালে এই কাহিনী বলেছিলেন। ভগবান বললেন, হে ভিক্ষু পূর্বেও এই রমণীর জন্য অসির আঘাতে তোমার শিরচ্ছেদ হয়েছিল। তারপর তিনি সেই অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গৃহপতির ঘরে জন্মেছিলেন। যে নক্ষত্রে তিনি জন্মেছিলেন, তার প্রভাবে লোকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। ফলে বোধিসত্ত্ব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। তিনি সাহসী ও বলশালী ছিলেন এবং তাঁকে ধরতে পারে এমন শক্তি কারও ছিল না।

বোধিসত্ত্ব একদিন এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে সিঁধ কেটে প্রচুর ধন অপহরণ করেছিলেন। নগরবাসীরা মহাচোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে রাজার কাছে নালিশ করলে রাজা নগরপালকে বোধিসত্ত্বকে ধরে আনতে আদেশ দিলেন। নগরপাল রাত্রে বিভিন্ন স্থানে প্রহরী নিয়োগ করে বোধিসত্ত্বকে হাতে নাতে ধরে ফেললেন। রাজা বোধিসত্ত্বের শিরচ্ছেদ করতে আদেশ দিলেন। তখন নগরপাল বোধিসত্ত্বকে দড়িতে বেঁধে গলায় রক্ত করবী ফুলের মালা পরিয়ে ও মাথায় ইঁটের গুঁড়ো মাখিয়ে মারতে মারতে মশানের দিকে নিয়ে চলল এবং সমগ্র নগরবাসীরা তাতে আনন্দিত হল।

তখন বারাণসীতে শ্যামা নামে এক গণিকা ছিল। সে রাজারও প্রণয়পাত্রী ছিল। শ্যামা প্রাসাদ থেকে দেখতে পেল বোধিসত্ত্বকে রাজপুরুষেরা মশানে নিয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্বের রূপ ছিল অতি মনোহর, দেহ অতি তেজঃপূর্ণ ও দিব্যলাবণ্যময়।

বোধিসত্ত্বকে দেখে শ্যামা প্রেমে পড়ে গেল এবং স্বামীরূপে পাওয়ার অভিলাসে কিভাবে বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করা যায় তার চিন্তা করতে লাগল। তারপর সে একজন পরিচারিকার মাধ্যমে নগরপালের নিকট এক সহস্র মুদ্রা পাঠিয়ে বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে দিতে বলল।

মহাচোরকে ছাড়া নগরপালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বললেন যদি এর পরিবর্তে অপর একটি লোককে পাই তাহলে বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। পরিচারিকা ফিরে এসে শ্যামাকে এই কথা বলল।

সেই সময় জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তাকে প্রত্যহ এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করত। সেদিনও সে সহস্র মুদ্রা নিয়ে সূর্যাস্তকালে শ্যামার কাছে উপস্থিত হল। শ্যামা সেই মুদ্রা নিয়ে কাঁদতে লাগল। শ্রেষ্ঠীপুত্র তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শ্যামা বলল তার ভাইকে চুরির দায়ে নগরপাল ধরে রেখেছে এবং সহস্র মুদ্রা দিলে ছাড়বে বলেছে। আমার কান্নার কারণ এই যে কে এই সহস্র মুদ্রা নগরপালের কাছে পৌঁছে দেবে তা নিয়ে। শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামাকে খুব ভালবাসত তাই সে তারই নিয়ে আসা সহস্রমুদ্রা নিয়ে নগরপালের কাছে গেল।

নগরপাল শ্রেষ্ঠীপুত্রকে একটি গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রেখে, বোধিসত্ত্বকে শ্যামার কাছে পাঠিয়ে দিল এবং রাত্রি গভীর হলে শ্রেষ্ঠীপুত্রকে মশানে নিয়ে শিরশ্ছেদ করল। তারপর দেহটাকে শূলে চড়িয়ে নগরে প্রত্যাগমণ করল।

তারপর থেকে শ্যামা অন্যের হাত থেকে উপঢৌকন নেওয়া বন্ধ করল এবং বোধিসত্ত্বের পরিচর্যায় নিয়ত নিজেকে নিয়োজিত রাখল। বোধিসত্ত্ব এতে চিন্তিত হলেন এবং ভাবলেন শ্যামা মিত্রদ্রোহিণী পরে অন্য কোন সুপুরুষ ব্যক্তিকে দেখে তাঁকেও এই রমণী হত্যা করাতে পারে। তাই তিনি শ্যামাকে বললেন উদ্যানে গিয়ে উদ্যানকেলি করবেন। শ্যামাও অতি উৎসাহে খাদ্য, ভোজ্য ও তার সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার পরে আবৃত গাড়িতে চড়ে উদ্যানে গমণ করল। সেখানে দুজনে আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হলেন এবং বোধিসত্ত্ব সময় বুঝে শ্যামাকে আলিঙ্গন করার ছলে করবী গুল্মের মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং এমন নিপীড়ন করলেন যে শ্যামা সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে পড়ে গেল। এই সুযোগে বোধিসত্ত্ব শ্যামার পরিহিত অলঙ্কার সমুহ খুলে নিজের উত্তরাসঙ্গে বেঁধে পালিয়ে গেলেন।

শ্যামার জ্ঞান ফিরলে সে তার পরিচারিকাদের বোধিসত্ত্ব কোথায় গেলেন জিজ্ঞাসা করলে তারা তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে অজ্ঞাত বলে জানাল। শ্যামা ভাবল যে সে মরেছে এই ভেবে বোধিসত্ত্ব পালিয়ে গেছেন। শ্যামা পণ করল যতক্ষণ না বোধিসত্ত্বের দেখা পাবে ততক্ষণ সে অলঙ্কৃত শয্যায় শয়ন করবে না, উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করবে না, দুবার আহার করবে না। মালাগন্ধাদি ব্যবহার করবে না। তারপর নটদের ডেকে সহস্র মুদ্রা দিল এবং বলল আর্যপুত্রকে যে ভাবে হোক খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। শ্যামা নটদের একটি গান শিখিয়ে দিয়েছিল, তারা সেই গান বিভিন্ন স্থানে গাইতে লাগল। বোধিসত্ত্ব এক জায়গায় নটদের গানের মাধ্যমে শ্যামা মরেনি জানতে পারেন। তথাপি তিনি শ্যামার কাছে ফিরলেন না। তখন শ্যামা পুনরায় তার নিজস্ব বৃত্তি অবলম্বন করে দিন যাপন করতে লাগল।

সমাধানে বুদ্ধ বললেন—তখন এই ভিক্ষু ছিলেন এই শ্রেষ্ঠীপুত্র, ইহার পূর্ব পত্নী ছিল শ্যামা এবং আমি ছিলাম সেই চোর।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E.B., The Jātakas, Vol. III, pp. 39-42
২। 'ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭-৪০]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণিষ্ক

কণিষ্ক ছিলেন কুষাণবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ এবং রাজত্বকালের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত হইতে পারেন নি। কিন্তু বহু পণ্ডিত যথা জেমস্ ফারগুসন, এইচ ওল্ডেনবার্গ, জে থমাস, ডঃ বন্দোপাধ্যায় ও জে র‍্যাপসন-এর মতে কণিষ্ক খৃষ্টীয় ৭৮ অব্দে এক নতুন অব্দের প্রচলন করেন যেটি শকাব্দ নামে পরিচিত। (দ্রঃ পণ্ডিত এ, এ্যল্ বাসাম-এর কণিষ্কের সময়কাল নিয়ে প্রবন্ধ, লেডেন, ১৯৬৮) কণিষ্ক একজন সার্থক যোদ্ধাও ছিলেন, তিনি বহু রাজ্যজয়ের দ্বারা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। পেশোয়ার, সুইবিহার, জেডা এবং মানিকিয়ালায় (রাওলপিণ্ডির কাছে) প্রাপ্ত কণিষ্কের খরোষ্ঠী লেখ থেকে জানা যায় যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর সিন্ধুদেশ ও গন্ধার তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' ও কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থে কণিষ্কের কাশ্মীর শাসনের উল্লেখ আছে। একটি বৌদ্ধগ্রন্থের চীনা অনুবাদে পার্সিয়ার সঙ্গেও কণিষ্কের যুদ্ধের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কাশ্মীর, কাবুল, গন্ধার, পূর্বভারতের গাজীপুর, গোরক্ষপুর, পশ্চিমে পার্থিয়া, চীন সাম্রাজ্যের কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান তিনি জয় করেছিলেন। তিনি সাকেত (অযোধ্যা) ও পাটালিপুত্র আক্রমণ করেছিলেন। এককথায় তাঁর সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত এবং উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এটি একটি মধ্যএশীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ এই মধ্য এশীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল যেটি ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি। তাঁর রাজত্বে ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু পূর্বভারতের পাটলিপুত্র নগর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়।

কণিষ্ক শুধু বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য নয় তিনি ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। তাঁর মুদ্রা ও পেশোয়ারের সম্পুট (casket) লেখ অনুযায়ী তিনি তাঁর রাজত্বকালের সূচনাতেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে তাঁর রাজত্বের কয়েক বছর পরে যখন তিনি পাটলিপুত্র জয় করেন তখন তিনি অশ্বঘোষের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। পেশোয়ার সম্পুট লেখটি খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত একটি দানপত্র বিশেষ। এটি কণিষ্কপুরের সর্বাস্তিবাদী আচার্যগণের জন্য দান করা হয়েছিল। সম্পুটটির গায়ে এবং ওপরে বুদ্ধের মূর্তি আছে যেটা থেকে বোঝা যায় যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত সর্বাস্তিবাদী আচার্যগণ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে উৎসাহ দিতেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে পুরুষপুর বা পেশোয়ারের একটি বহুতল চৈত্য ও বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের নিমিত্ত একটা সংঘারাম প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। জানা যায় যে পেশোয়ারের সংঘারামটি

সমসাময়িক ভারতের বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কণিষ্কের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বৌদ্ধধর্মের দুটি শাখার উদ্ভব যথা—হীনযান ও মহাযান। কথিত আছে যে কণিষ্ক পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আচার্য পার্শ্বকের (পার্শ্বের) পরামর্শে জলন্ধরের কুবনবিহারে (অথবা কাশ্মীরের কুন্দলবনবিহারে) একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতির আহ্বান করেছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে একে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্রের সভাপতিত্বে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত তারানাথের মতে এই সঙ্গীতিতে আঠারটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ নিষ্পত্তি করে ত্রিপিটকের অলিখিত অংশের প্রথম লিখিত রূপ দেওয়া হয় এবং লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তি দূর করা হয়। (এইচ কার্ন রচিত 'ম্যানুয়াল অফ ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিজিম পৃঃ ১২১) সেই সময় বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে বহু টীকা গ্রন্থ রচিত হয় যেগুলি বৌদ্ধসাহিত্যে বিভাষাশাস্ত্র নামে পরিচিত।

এস্থলে উৎপন্ন মহাযানের মূল তত্ত্ব হল 'বোধিসত্ত্বযান'। এই মতবাদ অনুযায়ী একপক্ষে সাধারণ মানুষ ও অন্যপক্ষে বুদ্ধের মধ্যবর্তী বোধিসত্ত্বের (অর্থাৎ পরোপকারে আত্মোৎসর্গীকৃতের) কল্পনা করা হয়েছে। বোধিসত্ত্বগণ তাঁদের পুণ্যকর্মের দ্বারা সমষ্টির মুক্তি ঘটাতে পারে বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য কণিষ্কের সময়ের বহু দিন আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছিল। চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে এই পরিবর্তন করে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়। রাজা কণিষ্ক স্বয়ং মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে এই সঙ্গীতির সমগ্র ফলাফল অর্থাৎ রচিত গ্রন্থগুলি তাম্রশাসনে খোদিত আছে একটি স্তূপের অভ্যন্তরে যদিও এখনও পর্যন্ত এগুলি পাওয়া যায়নি। হিউয়েন সাঙ ও তারনাথ উভয়েই গ্রন্থগুলিতে কোন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করেননি। কিন্তু সংস্কৃত পণ্ডিতাচার্য অশ্বঘোষ যেহেতু এই গ্রন্থগুলির রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেহেতু এগুলিতে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছিল বলে ধরা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে পূর্বের সঙ্গীতিগুলিতে পালিভাষার প্রয়োগ সর্বজনবিদিত, এবং এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অশ্বঘোষের 'সূত্রালঙ্কার' গ্রন্থে কণিষ্কের পূর্বভারত জয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি একান্ত আনুগত্যের কথা লিপিবদ্ধ আছে। (দ্রঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে) রচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' পৃঃ ৮৭)।

কণিষ্কের সময়কালের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর মুদ্রায় তিনি 'কণেষ্কি' নামে চিহ্নিত। মুদ্রাগুলিতে 'বোদ্দো (বুদ্ধ' অথবা 'সকৌমা বোদ্দো' (শাক্যমুনি বুদ্ধ) নাম খোদিত আছে। এটি তাঁর শাক্যমুনি বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় বহন করে।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পাল রাজা দেবপালের সময়ে লিখিত একটি লিপি থেকে জানা যায় যে কণিষ্কের নির্মিত কণিষ্ক মহাবিহারটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হত। ভারতের বাইরে বিশেষতঃ মধ্য এশিয়ায় ও দূর প্রাচ্যে যথা, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি জায়গায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল মূলতঃ তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রেও তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতো পার্শ্ব, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক, নাগার্জুন, সংঘরক্ষ, মাঠর, গ্রীক এজোসিলেওস প্রভৃতি সাহিত্যিক ও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রচয়িতাগণ। মথুরার কাছে মাত নামক স্থানে কণিষ্কের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি পাওয়া গেছে খননকার্যের ফলে। তাঁর রাজত্বকালে মহিলা উপাসিকাগণের দ্বারা বহু বোধিসত্ত্বের মূর্তি স্থাপনার উল্লেখও পাওয়া যায়। কণিষ্কের সময়েই গন্ধার শিল্পের উদ্ভব, গ্রীক, রোমাণ ও বৌদ্ধশিল্পের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। অমরাবতী, কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায়, মথুরা, তক্ষশিলা ও কণিষ্কপুরে গন্ধার ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে তিনি স্বয়ং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে তবুও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিরূদ্ধ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, কারণ তাঁর মুদ্রাগুলিতে দেখা যায় যে অন্যান্য ধর্মের দেবদেবীদের মূর্তিও তাতে অঙ্কিত রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে কণিষ্ক কেবলমাত্র কুষাণবংশেরই শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন না তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

[দ্রষ্টব্য ঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ এ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া; ড: ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর 'রাইস এ্যান্ড ফল অফ দি কুষাণ এম্পায়ার'; ড: কানাইলাল হাজরা বিরচিত 'রয়্যাল পেট্রোনেজ অফ বুদ্ধিজিম; মণিকুন্তলা হালদার (দে) বিরচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'।]

মণিকুন্তলা হালদার দে

কণ্টক (কণ্ডক)

বৌদ্ধধর্মে একজন শিক্ষানবীশ। উপনন্দ এঁকে দীক্ষান্তরণ করেছিলেন। কণ্টক অপর এক শিক্ষানবীশ মহকের সঙ্গে একপ্রকার অপরাধ দোষে দুষ্ট হয়েছিলেন। এটা জানাজানি হওয়ার পর ভিক্ষু সংঘে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হল, এরপর কোন ভিক্ষু দুজন শিক্ষানবীশকে[১] দীক্ষান্তকরণ করতে পারবেন না। পরবর্তীকালে এই নিয়ম অবশ্য রদ করা হয়েছিল[২]। বিনয় পিটকের[৩] আলোচনাতে এটাও আবার পরিলক্ষিত হয় যে কণ্টকা নাম্নী এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে কণ্টক যৌনসংসর্গে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁকে ভিক্ষুসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ছবগ্গিয় ভিক্ষুরা কণ্টককে তাঁদের সংঘে স্থান করে দিয়েছিল এবং সমন্তপাসাদিকার (বিনয় পিটক অট্ঠকথা) মতে বজ্জিপুত্তদের মত কণ্টকও একজন বুদ্ধের প্রধান শত্রু হিসাবে পরিণত হন।

১. বিনয়-পিটক, ১ খণ্ড, পৃঃ ৭৯

২. ঐ পৃঃ ৮৩

৩. ঐ পৃঃ ৮৫

৪. সমন্তপাসাদিকা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৭৪

[দ্রষ্টব্য ঃ Malalasekara, G.P. - Dictionary of Pali Proper Names, Vol I. p. 498]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্টক সুত্ত

ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর কূটাগারশালায় বসবাসকালীন সময়ে লিচ্ছবিরা তাদের বহুসংখ্যক অনুচরবর্গের সঙ্গে বিরাট কোলাহল করতে করতে তাঁর দর্শন লাভের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। চাল, উপচাল, কক্কট, কড়িম্ভ, নিকট, এবং কটিস্সহ প্রভৃতি বুদ্ধের খ্যাতিবান শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে বসবাস করছিলেন, সেই কোলাহল শুনে তাঁরা পশ্চাদগমন করে নিকটস্থ যে সমস্ত বনভূমি ছিল যেমন গোসিঙ্গসালাবন প্রভৃতি নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। তাঁদের এই নির্জন গমনকে ভগবান বুদ্ধ প্রশংসা করেছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন কোলাহল ধ্যানের পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এবং তারপর তিনি ধ্যানের পক্ষে দশটি প্রতিবন্ধকতা[১] কি কি তা এই সূত্রে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১। অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ খণ্ড, পৃঃ ১৩৩-১৩৫

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I. p. 493]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্টকী সুত্ত

সূত্রটি তিনটি সূত্রের সংমিশ্রণ। সূত্রটিতে বলা হয়েছে সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অনুরুদ্ধের কাছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। অনিরুদ্ধ বলেছিলেন সেখ (সুদক্ষ) এবং অসেখ (শিক্ষার্থী) উভয় প্রকার শিক্ষার্থীরই চারটি সতিপট্‌ঠান লাভ করা উচিত এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি নিজে চারটি[১] সতিপট্‌ঠানের উন্নতি করে সহস্রগুণ সম্পন্ন পৃথিবীর নিয়মাবদ্ধ রীতিকে বুঝতে পেরেছিলেন।

১। সংযুক্ত-নিকায় - ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৯৮

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I. p. 494]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্টকী বন

সাকেতের নিকটে একটি কুঞ্জবন। সারিপুত্ত ও মোগ্গলানের মধ্যে এই স্থানে যে কথোপকথন হয়েছিল তা পদেস সুত্তে[১] লিপিবদ্ধ করা আছে। অন্য কোন একটি উপলক্ষে উপরোক্ত দুজন ও অনুরুদ্ধের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা কণ্টকী সুত্তে[২] বলা হয়েছে। কুঞ্জবনটিকে (কণ্টকীবনটিকে) তিকণ্টকী নামেও অভিহিত করা হত এবং টীকা গ্রন্থে একে মহাকরমদ্দ-বন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান বুদ্ধও এই কুঞ্জবনে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন এবং ভিক্ষুদের একটি ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই ধর্মোপদেশটি তিকণ্টকী সুত্তে[৩] লিপিবদ্ধ আছে।

১। সংযুক্ত-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪

২। ঐ পৃঃ ২৯৮

৩। অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I. p. 494]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্ডিন-জাতক (জাতক নং ১৩)

কোন কোন ভিক্ষু সংসার ত্যাগ করেও স্ত্রী বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হতেন। ভগবান বুদ্ধ একজন ভিক্ষুকে বললেন 'তুমি এই নারীর জন্য আগের জন্মেও মারা গিয়েছিলে, এবং লোকে আগুণে দগ্ধ করে তোমার মাংস খেয়েছিল। ভিক্ষুগণের অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

প্রাচীনকালে মগধ অধিপতিরা রাজগৃহ নগরে থেকে রাজ্যশাসন করতেন। তখন ফসলের সময় মগধবাসী হরিণদের খুব বিপদের আশঙ্কা ছিল। সেইজন্য মাঠে ফসল হলে হরিণেরা পাহাড়ে উঠে বনে জঙ্গলে বসবাস করত। একবার একটি পর্বতের হরিণের সঙ্গে সমতলবাসিনী একটি মৃগীর প্রণয় হয়েছিল। সমতলবাসী হরিণেরা যখন পাহাড় থেকে নেমে আসার আয়োজন করল, সেই পাহাড়ী হরিণীটিও তাকে অনুসরণ করতে চাইল। মৃগী তাতে আপত্তি করল। গ্রামের কাছে তাদের বিভিন্ন প্রকার বিপদের আশঙ্কা আছে এবং পাহাড়ী মৃগ হওয়ায় সে যেহেতু লোকালয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় তারজন্য তাকে বিপদেও পড়তে হতে পারে। কিন্তু প্রণয়াবদ্ধ পাহাড়ী হরিণ কিছুতেই নিরস্ত হল না।

অপরদিকে মগধবাসীরা পাহাড়ী হরিণদের নামার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে তারা হরিণদের মারবার জন্য বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রইল। যে রাস্তা দিয়ে পাহাড়ী হরিণ ও তার প্রেমিকা মৃগীটি আসছিল, সেই রাস্তায় এক ব্যাধ লুকিয়েছিল। মৃগী মানুষের গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারল তাদের প্রাণনাশের জন্য কেউ লুকিয়ে আছে। তখন সে পাহাড়ী হরিণটিকে আগে যেতে বলে নিজে দূরত্ব বজায় রেখে চলল।

পাহাড়ী হরিণটি ব্যাধের কাছাকাছি আসায় সে একটি মাত্র তীর নিক্ষেপ করে তাকে বধ করল এবং তা দেখে মৃগী দ্রুতবেগে পালিয়ে গেল। তারপর ব্যাধ হরিণের চামড়া ছাড়িয়ে কিয়দংশ পাক করে নিজে খেল এবং বাকি অংশ বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে গেল।

সেই সময় বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতারূপে সেই জায়গায় বসবাস করছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ভাবলেন যে এই কামান্ধ মৃগ নির্বুদ্ধিতার জন্য মারা গেল। কামের আরম্ভ খুব সুখকর হলেও পরিণামে এর থেকে বন্ধনাদি নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়। এ সংসারে অপরের প্রাণসংহার নিন্দনীয়। যে দেশ নারীদের আধিপত্য সে দেশ নিন্দনীয়, যে সব ব্যক্তি নারীদের বশীভূত সে দেশ নিন্দনীয়। বৃক্ষদেবতারূপ বোধিসত্ত্বের এই কথাগুলি শুনে বনবাসী অন্যান্য দেবতারা পুষ্পগন্ধাদিদ্বারা বোধিসত্ত্বের পূজা অর্চ্চনা করলেন।

কাহিনী শেষ করে ভগবান বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিয়ে সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করলেন এবং তা শুনে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। তারপর ভগবান

বললেন, তখন এই বণিতা বিরহবিধুর ভিক্ষু ছিল সেই পাহাড়ী হরিণ এবং এর স্ত্রী ছিল সেই মৃগী এবং আমি ছিলাম সেই বনদেবতা।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B. The Jātakas, Vol. I.
২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৩৯]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কল্লকথল

উজুঞ্ঞাতে অবস্থিত একটি মৃগবন। ভগবান বুদ্ধ এখানে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। অচেল কস্‌সপের সঙ্গে এই বনে একবার বুদ্ধের দেখা হয়েছিল এবং তিনি কস্‌সপকে কস্‌সপসীহনাদ সুত্ত[১] এই জায়গায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। কস্‌সপ বিবিধ প্রকার তপশ্চরণের উল্লেখ করে ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ দেহ নির্য্যাতিক তপশ্চরণকে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করেন, তা কি ঠিক। ভগবান বুদ্ধ তদুত্তরে বললেন, উক্ত তপশ্চরণ সমূহ যতই পালিত হোক না কেন, যদি শীল সম্পদা, চিত্ত সম্পদা ও প্রজ্ঞা সম্পদা সঠিকভাবে অনুশীলন না হয় এবং সাফল্য না আসে তাহলে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণফল অসম্ভব। এরপর তিনি শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে কস্‌সপকে শিক্ষা দিলেন।

বুদ্ধ কোশলের রাজা প্রসেনজিৎকেও এই মৃগবনে কনকথল সুত্ত[২] শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

১. দীঘ-নিকায় - ১ খণ্ড, পৃঃ ১৬১

২. মজ্‌ঝিম-নিকায় - ২ খণ্ড, পৃঃ ১১৫

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কল্লকথল সুত্ত

মজ্‌ঝিম-নিকায় এর অন্তর্গত কল্লকথল সুত্তে দেখা যায় রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে কল্লকথল মৃগবনে দেখা করে তাঁর দুই মহিষী সোমা ও শকুলার অভিবাদন জানিয়েছিলেন। প্রসেনজিৎ এরপর ভগবান বুদ্ধের কাছে জানতে চান, আপনার মতে এই জগতে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি সর্বজ্ঞ বা সর্বদর্শী এমন দাবী করতে পারেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন তিনি কোন সময়েই মনে করেন না যে কোন একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে একই সময়ে এবং একবারে সর্বজ্ঞ হতে পারেন। এরপর তিনি জাতিভেদ প্রথা ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনরূপ দেবতার অধিষ্ঠান আছে কিনা জানতে চান। বিড়ূডভ ও আনন্দ এই আলোচনাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং বলেন ভগবান বুদ্ধের উপদেশগুলির অপব্যাখ্যা করে জনসমক্ষে ভ্রান্তরূপে প্রচার করা হচ্ছে। এরপর রাজা প্রসেনজিৎ ভগবান বুদ্ধের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব কথা শ্রবণ করে অতিশয় আনন্দিত হয়ে তাঁর রথে চড়ে প্রত্যাগমণ করলেন।

১। মজ্‌ঝিম-নিকায় - ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. - Dictionary of Pali Proper Names Vol. I. pp. 497-98]

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

কণ্‌হ

ওক্‌কাক বংশীয় দিশা দাসীর পুত্র, অতীব কালো ও রাক্ষসের মত দেখতে বলে তাঁকে কণ্‌হ নামে অভিহিত করা হত। জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা বলতে শুরু করেন। কণ্‌হায়নগোত্রের[১] তিনি পূর্বপুরুষ। পরবর্তীকালে তিনি দাক্ষিণাত্য গিয়েছিলেন এবং গূঢ় বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে একজন মহান ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাতে পরিণত হয়েছিলেন। ওককাকয় ফিরে এসে কণ্‌হ রাজকন্যা মদ্দরূপীকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু রাজা প্রথমে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন কিন্তু পরে তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে রাজা তাঁর হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করেন।[২]

১। দীঘ-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩

২। ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬; সুমঙ্গল-বিলাসিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৬

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্‌হ জাতক (কৃষ্ণ জাতক) জাতক নং - ৪৪০

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা ছিলেন তখন বারাণসী নগরে আশী কোটি ধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পুত্র কামনায় ব্রাহ্মণ শীলব্রত গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর বোধিসত্ত্ব তাঁর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিলেন। বোধিসত্ত্বের গায়ের রঙ কালো ছিল বলে লোকে তাঁকে কৃষ্ণকুমার নামে অভিহিত করত।

বোধিসত্ত্বের ষোল বৎসর বয়সে বিদ্যালাভের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে তক্ষশিলায় পাঠালেন। তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর পিতা একটি উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকুমার সমস্ত ধন ও সম্পত্তির অধিকারী হলেন। একদিন তিনি রত্নভাণ্ডারগুলি ঘুরে দেখার পর তাতে কি লেখা আছে তা দেখার জন্য সুবর্ণপট্ট আনালেন। তিনি দেখলেন তাতে কেবল পূর্বপুরুষগণ কত ধন উপার্জন করেছেন তা লেখা আছে।

তা দেখে কৃষ্ণকুমার চিন্তা করলেন, যাঁরা ধন উপার্জন করে গেছেন তাঁদের বিষয় জানার কোন উপায় নেই। তাঁরা কেউই উপার্জিত ধন নিয়ে যেতে পারেন নি। চোর, শত্রু, রাজা, জল ও আগুন—এই পঞ্চ উপদ্রব থেকে ধনের ক্ষয় হয়। দানই হচ্ছে এই অসার ধনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ।

তিনি ঠিক করলেন এই অসার ধন দান করবেন। তাই রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে সাতদিন ধরে দান করলেন কিন্তু তবুও ধন না ফুরানোয় গৃহের দ্বার খুলে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি অশুচিজ্ঞানে পরিত্যাগ করে হিমালয়প্রদেশে গিয়ে এক ইন্দ্রবারুণি বৃক্ষ দেখে তার নীচে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি বাসের জন্য কোন পর্ণশালা নির্মাণ করলেন না। গাছের নীচে মাটিতে শুতেন। পাক না করে সমস্ত খাদ্য খেতেন এবং তাও সারা দিনের মধ্যে একবার।

তাপস কৃষ্ণকুমার অল্পদিনের মধ্যে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করে ধ্যান সুখ ভোগ করতে লাগলেন। তিনি যে গাছের নীচে বসবাস করতেন সেই গাছ ছিল তাঁর খাদ্যদ্রব্যের একমাত্র উৎস। সেই গাছে যখন ফল হত তখন সেই ফল খেতেন। যখন

হত না তখন পাতা, ফুল অথবা গাছের ছাল ও মূল খেতেন। তিনি গাছের ফল নেবার জন্য আসন ছেড়ে এক পা কোথাও যেতেন না। ফুল, ফল, পাতা নিজের থেকে যা এসে তাঁর কাছে পড়ত তাই খেতেন। কোনটি ভাল কোনটি মন্দ ফল তার বিচার তিনি করতেন না। এইভাবে দীর্ঘকাল সন্তুষ্টচিত্তে একা গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

এইভাবে একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যা করার ফলে তাঁর শীলতেজে একদিন স্বর্গলোকে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। শক্রের এই আসনের নাম ছিল পাণ্ডুকম্বল শিলাসন। এই আসন শক্রের আয়ুক্ষয়কালে, পুণ্যক্ষয়কালে, কোন পুণ্যাত্মা মহাসত্ত্ব শক্রপদ প্রার্থনা করলে অথবা ধার্মিক কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ্যের শীল-তেজে উত্তপ্ত হয়ে উঠত।

আসন উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শক্র স্বর্গ মর্ত্যের চর্তুদিক দৃষ্টিপাত করলেন। কঠোর তপস্বী বনবাসী কৃষ্ণ তাপসকে ধ্যানবলে তিনি দেখতে পেলেন। এবং অনতিবিলম্বে আকাশপথে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণ করলেন। তাপস রাগ করেন কিনা তা জানার জন্য শক্র কুরূপকীর্তন করতে লাগলেন। তিনি বললেন কালো গায়ের রং দেখে ঘৃণা হয়, নিজে কালো হওয়ার জন্য কালো ফল, পাতা খায় এমনকি যে জায়গায় ঘাস রয়েছে তার মাটিটাও কালো। সব কালো একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

একথা শুনে কৃষ্ণ দিব্যচক্ষুতে দেখতে পেলেন স্বয়ং দেবরাজ শক্র তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন। কৃষ্ণ তখন বললেন কেউ শরীরের রঙে কালো হয় না, পাপেই মানুষ প্রকৃত কালো হয়। এরপর কৃষ্ণ পাপের বিভিন্ন প্রকৃতি ভালভাবে ব্যাখ্যা করে পাপের নিন্দা ও শীলের প্রশংসা করলেন। তাঁর এই ধর্মকথা শুনে দেবরাজ শক্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে কৃষ্ণকে বর দিতে চাইলেন। কৃষ্ণ ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ থেকে মুক্ত থাকার ও কারো প্রতি যাতে স্নেহশীল না হন তার বর চাইলেন।

শক্র বললেন ক্রোধ, দ্বেষ, লোভের দোষ বুঝলাম, কিন্তু স্নেহশীল হতে চাওনা কেন?

কৃষ্ণ বললেন, স্নেহের বন্ধনে অবিদ্যা বাড়ে ও স্নেহবদ্ধ জীব যন্ত্রণা পায়।

শক্র তাঁকে এই চারটি বর দেওয়ার পর আর একটি বর দিতে চাইলেন।

কৃষ্ণ বললেন, রোগভোগে তপস্যার বিঘ্ন ঘটে তাই এই বনে যেন কখনও রোগ না প্রবেশ করে। তারপর শক্র আর একটি বর দিতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন, তিনি যেন কখনো কায়মনোবাক্যে কারও অনিষ্ট না করেন এমন বর তাঁর চাই।

শক্র তখন তাঁকে ছয়টি বর দান করে সেই বৃক্ষটিকে ধ্রুবফল করলেন। তারপর বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনি আরোগ্য হয়ে এখানে অবস্থান করুন।

এই বলে শক্র সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। বোধিসত্ত্বও ধ্যানবল অক্ষুণ্ন রেখে ব্রহ্মলোক পরায়ণ হলেন।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B. The Jātakas, Vol. IV, pp. 4 - 8
২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫ - ১০]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্হদিন্ন থের

একজন অর্হৎ। রাজগহ (রাজগীর) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম, সারিপুত্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করছেন শুনে তিনি ভিক্ষু সংঘে দীক্ষা নেন এবং ধর্মীয় শিক্ষান্তে অর্হত্বে উন্নীত হন। পূর্ব জন্মে তিনি সোভিত বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পুন্নাগ পুষ্পা উপহার দিয়েছিলেন।[১]

তিনি ভরদ্বাজ থের পুত্র কণ্হদিন্ন নামেও পরিচিত ছিলেন এবং অপদান গ্রন্থের গিরিপুন্নগিয়ও সম্ভবত একই ব্যক্তি।

১. থেরগাথা, ৫, ১৭৯, থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩০৪

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কণ্হদীপায়ন জাতক (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) জাতক নং - ৪৪৪

অতীতকালে বৎস্যরাজ্যে কৌশাম্ভিকক নামে এক রাজা কৌশাম্বী নগরে ছিলেন। তখন কোন এক দূর গ্রামে আশীকোটি ধনসম্পন্ন দুজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। উভয়ে উভয়ের বন্ধু ছিলেন। বাসনার শেষ দেখতে গিয়ে তারা সমস্ত ধন ব্যয় করতে লাগলেন।

অবশেষে দুজনেই বিষয়বাসনা ত্যাগ করে এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে গেলেন। সেখানে পর্ণকুটীরে বসবাস করে ফলমূল ভক্ষণ করে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এইভাবে পঞ্চাশ বছর কাটানোর পরও ধ্যানবল লাভ করতে পারলেন না।

এরপর তাঁরা লবণ ও অম্ল সংগ্রহের জন্য জনপদে ভিক্ষা করতে কাশীরাজ্যে উপস্থিত হন। এই রাজ্যে মাণ্ডব্য নামে কোন এক ব্যক্তির বাস ছিল। হিমালয়বাসী এই দুজন তপস্বীর একজনের নাম দ্বৈপায়ন ও অপর জনের নাম মাণ্ডব্য। দ্বৈপায়ন যখন গৃহী ছিলেন তখন মাণ্ডব্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। দুই তপস্বী ভিক্ষা করতে করতে মাণ্ডব্যের ঘরে উপস্থিত হলেন।

মাণ্ডব্য তাঁদের দেখে খুবই আনন্দিত হল। সে তাঁদের বাসের জন্য পর্ণশালা নির্মাণ করে ভিক্ষুদের ব্যবহার্য বস্ত্র, আসন ও শয্যা ইত্যাদি সব যোগাড় করে দিল। মাণ্ডব্যের বাড়িতে তিন চার বছর অতিবাহিত করার পর বারাণসীতে গিয়ে শ্মশানে একটি পর্ণশালা নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন। দ্বৈপায়ন কিছু সময় সেই শ্মশানে বসবাসের পর পুনরায় তাঁর বন্ধু মাণ্ডব্যের কাছে ফিরে এলেন এবং তপস্বী মাণ্ডব্য একাকী সেই শ্মশানে রয়ে গেলেন।

একদিন রাত্রিতে এক চোর ধনভাণ্ড নিয়ে পালিয়ে গেলে গৃহস্বামী চোরকে তাড়া করলে নগরের প্রহরীরাও চোরকে তাড়া করল। তখন নগরদ্বার বন্ধ থাকায় নর্দমা দিয়ে চোর তপস্বীর পর্ণকুটীরে উপস্থিত হল ও ধনভাণ্ডটি সেখানে রেখে পালিয়ে গেল। প্রহরীরা ও অন্য লোকেরা চোরকে না পেয়ে তপস্বীকে চোর ভেবে গালিমন্দ করতে করতে তারা তপস্বীকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সত্যাসত্য বিচার না করে তাঁকে শূলে চড়াতে বললেন, কিন্তু তাঁর শরীর তাতে বিদ্ধ হল না।

তপস্বী মাণ্ডব্য বিনা দোষে শাস্তি পাওয়ায় পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে বুঝতে

পারলেন যখন তিনি সূত্রধরের পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন তখন একদিন তিনি পিতার কারখানায় গিয়ে একটি মাছি ধরে আবলুস কাঠের একটি কনাকে শূলের মত করে তাতে মাছিটিকে চড়িয়ে শূলবিদ্ধ করেছিলেন। মাণ্ডব্য বুঝতে পারলেন পূর্বজন্মকৃত পাপ থেকে মুক্তি নাই, তাই তিনি ঘাতকদের আবলুস কাঠের শূল আনতে বললেন এবং সেই শূলেই তাঁর শরীর বিদ্ধ হল কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল না।

এদিকে তাপস দ্বৈপায়ন তাঁর বন্ধুকে দেখতে এসে শুনলেন তাঁকে শুলে চড়ানো হয়েছে। তিনি তখন মশানে মাণ্ডব্যের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন বন্ধুর অপরাধের কথা। মাণ্ডব্য চোরের পূর্বোক্ত কথাগুলি দ্বৈপায়নকে শুনালেন।

দ্বৈপায়ন ছিলেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব মাণ্ডব্যকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন তাঁর এই দশার জন্য তিনি রাজা বা অন্য কাউকে দায়ী করেন না। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন তোমার মত পুণ্যাত্মার ছায়াতে বসলেও ভাল।

তখন বোধিসত্ত্ব (দ্বৈপায়ন) শূলের নিকট বসলেন এবং মাণ্ডব্যের দেহ থেকে রক্তবিন্দু দ্বৈপায়নের গায়ে পড়ে শুকিয়ে কালো দাগ হওয়ায় তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে ও অভিহিত হলেন।

প্রহরীরা আড়াল থেকে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাজাকে জানালে রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং মশানে দ্বৈপায়নের কাছে এলে রাজাকে তিনি পুণ্যাত্মা মাণ্ডব্যের দোষ ও কি কারণে তাঁকে শাস্তি দিলেন তা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বললেন তিনি কোনরূপ সত্যাসত্য বিচার না করেই দণ্ড দিয়ে ফেলেছেন।

রাজার এই স্বীকারোক্তি শুনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, রাজাদের কর্তব্য সমস্ত বিষয় ভালভাবে জেনে বিচার করা। এরপর তিনি রাজাকে ধর্মোপদেশ দান করলেন।

রাজা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে মাণ্ডব্যের দেহ থেকে শূল বের করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজার লোকেরা শূল বের করতে অক্ষম হলে মাণ্ডব্য শূলের বাইরের অংশটি কেটে দিতে বললেন। শূলের যে অংশটি ভিতরে ছিল তা ভিতরেই থেকে গেল। তখন মাণ্ডব্য বললেন পূর্বজন্মে তিনি একটি মাছির মলদ্বারে হীরকশলাকা বিদ্ধ করেছিলেন এবং তা মাছিটির দেহের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। তাতে তার মৃত্যু হয়নি। পূর্বজন্মকৃত ফলের জন্য তাঁর দেহেও শূলের কিছুটা অংশ থেকে গেল, মৃত্যু হল না।

রাজা তখন উভয় তপস্বীর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁদের রাজ-উদ্যানে থাকার ব্যবস্থা করলেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। সেই থেকে মাণ্ডব্য, অণি (সূচ বা শলাকা) মাণ্ডব্য নামে অভিহিত হলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুকাল মাণ্ডব্যের সঙ্গে রাজোদ্যানে কাটালেন এবং মাণ্ডব্যের ঘা শুকিয়ে গেলে তিনি চলে গেলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই গ্রামে তাঁর বন্ধু মাণ্ডব্যের গৃহের নিকটবর্তী পর্ণশালায় ফিরে গেলে মাণ্ডব্য গৃহীপুত্রসহ সেখানে গিয়ে তাঁর সম্মান ও পূজা করলেন।

গৃহী মাণ্ডব্যের যজ্ঞদত্তকুমার নামে একটি পুত্র ছিল। সে একদিন কান্দুক ও বন্দুক নিয়ে একটি উইঢিবির কাছে খেলা করছিল। একসময় সে বন্দুকটি উইঢিপির উপর রেখে আঘাত করলে সেটা উইঢিবির গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। গর্তের মধ্যে একটি

বিষধর সাপ ছিল বন্দুকটা আনতে গেলে বিষধর সাপটি তাকে দংশন করল এবং বিষ-ক্রিয়ার ফলে সে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তখন যজ্ঞদত্তকে তার বাবা-মা দ্বৈপায়ন তপস্বীর কাছে নিয়ে এল কিন্তু তিনি প্রথমে বলেন তাঁর ঔষধ বা বৈদ্যক্রিয়া সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তখন মাণ্ডব্য তাঁকে সত্যক্রিয়া করতে বললেন।

তখন দ্বৈপায়ন ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বললেন, তিনি কেবল সপ্তাহকাল প্রসন্নচিত্তে শুদ্ধ ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। তারপর পঞ্চাশ বছর বা তার বেশী কপট ব্রহ্মচারীরূপে নানাস্থানে বিচরণ করেছেন। এই গুপ্ত সত্যবলে বিষ নষ্ট হোক। যজ্ঞদত্ত জীবন লাভ করুক।

এই সত্যক্রিয়ার ফলে যজ্ঞদত্তের বুকের উর্দ্ধভাগে যে বিষ ছিল তা পড়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করল। বালক যজ্ঞদত্ত তখন চোখ খুলে মাতা-পিতার দিকে তাকাল ও পাশ ফিরে শুল।

দ্বৈপায়ন তার বন্ধু মাণ্ডব্যকে বললেন তুমি সত্যক্রিয়া কর।

মাণ্ডব্য তখন তার পুত্রের বুকের উপর হাত রেখে বলল, আমি অতিথি অভ্যাগতদের অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করেছি। দান করেই আমি অনুতপ্ত হতাম। কিন্তু এটা কোন অতিথি, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ বুঝতে পারতেন না। আমার এই দানের রহস্য চিরদিন গোপন রয়েছে। আমার এই গুপ্ত সত্যের বলে বিষ নষ্ট হোক। যজ্ঞদত্ত জীবন লাভ করুক।

এই সত্যক্রিয়ার ফলে বালকের বিষ বুক থেকে কটিতে নেমে এসে বার হয়ে পৃথিবীতে পড়ল। যজ্ঞদত্ত এবার উঠে বসল। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। মাণ্ডব্য তার স্ত্রীকেও সত্যক্রিয়া করতে বলল।

তার স্ত্রী বলল তার একটি গুপ্ত সত্য আছে এবং সে সেটা মাণ্ডব্যের সামনে বলতে পারবে না। ছেলেটার প্রাণ বাঁচুক, সত্য যা হোক সে তাতে কিছু মনে করবে না।

রমণী তখন বলল, যে উগ্রবিষ সাপ বিবর থেকে উঠে এসে তোকে দংশন করল, সে সাপ ও তোর পিতা সমান অপ্রিয় তার কাছে। একথা বলতে তার বড় লজ্জা হচ্ছে। একথা সে কখনও কাউকে বলেনি, এই সত্যবলে বিষ নষ্ট হোক। যজ্ঞদত্ত জীবন লাভ করুক।

এই কথা বলার পর সমস্ত বিষ মাটিতে পড়ল ও বালক উঠে দাঁড়াল ও খেলতে লাগল।

এরপর মাণ্ডব্য তার বন্ধু দ্বৈপায়নকে ব্রহ্মচর্য পালন করেও ভণ্ডামির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে তিনি শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু লোক-নিন্দার ভয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি ব্রহ্মচর্য পালনের ভাণ করে চলেছেন। এরপর দ্বৈপায়ন মাণ্ডব্যকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দান করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মাণ্ডব্য বললেন তার পিতা ও পিতামহ শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতেন আর যদি সে দান-ধ্যান না করে তবে লোকে তাকে কুলাঙ্গার বলবে এই ভয়ে সে অশ্রদ্ধার সঙ্গে দান করে। এরপর মাণ্ডব্য তার স্ত্রীকে তার প্রতি অনিচ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করলে

রমণী পাছে লোকে তাকে কুলকলঙ্কিনী বলে এই ভয়ে সে এতদিন তার সেবা করে আসছে। এ কথা স্বীকার করে সে তার স্বামীর কাছে তাকে ক্ষমা করার মিনতি জানাল।

এরপর মাণ্ডব্য তার স্ত্রীকে ক্ষমা করল এবং সেও অনিচ্ছায় আর দান-ধ্যান করবে না ঠিক করল এবং দ্বৈপায়নকে মাণ্ডব্য বলল যে তিনিও যেন এরপর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করেন।

তারপর থেকে মাণ্ডব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতে লাগল। তার স্ত্রীও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীর সেবা করতে লাগল। বোধিসত্ত্বও ধ্যান নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করে ধ্যাননিরত হয়ে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হয়ে উঠলেন।

[দ্রষ্টব্য :

১। Cowell, E. B. The Jātakas, Vol. IV pp. 17-22

২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯-২৬]

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

কথাবত্থু

পালি বৌদ্ধসাহিত্যের পিটকত্রয়ের মধ্যে কথাবত্থু অভিধম্ম-পিটকের[১] সাতটি গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে। অভিধম্ম-পিটকটিকে যিনি নিপুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তাঁকে প্রজ্ঞাবান বলা হয়।

কথাবত্থু অভিধম্মপিটকের অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ। ত্রিপিটকের গ্রন্থরাজির মধ্যে আমরা কেবলমাত্র কথাবত্থুরই সংকলকের নাম পাই। রাজর্ষি অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে[২] তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই বৌদ্ধসঙ্গীতির অন্তে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স কথাবত্থু সংকলন করেন। সিংহলী পালি গ্রন্থ মহাবংশের মতানুযায়ী সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধসম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং থেরবাদী সম্প্রদায়ের স্থান অন্য কোন শাখা কর্তৃক অধিগৃহীত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। থেরবাদীরা তাঁদের সত্তা বজায় রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই কথাবত্থু গ্রন্থটির বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত হয়েছে বিরুদ্ধবাদী শাখার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং উত্তরগুলিতে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে থেরবাদী সম্প্রদায়ের অভিমতকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। বিরুদ্ধমতবাদীদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও বিনয় ও সুত্তপিটকের উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ কথাবত্থুর উপর কথাবত্থু-অট্‌ঠকথা নামে একটি টীকা গ্রন্থ রচনা করেন এবং কথাবত্থুতে উল্লিখিত ও খণ্ডিত মতবাদগুলি কোন কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তার আলোচনা করেছেন।

কোন কোন পণ্ডিতের মতানুযায়ী[৩] সম্রাট অশোকের নবম প্রস্তর লিপিটি কথাবত্থু গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত। অতএব এই গ্রন্থটি যে অশোকের সময়ে রচিত তা বলা যায়। সিংহলী ও পালি ঐতিহ্যানুসারে কথাবত্থু খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে রচিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থটিতে পরবর্তীকালের কিছু সংযোজন আমরা দেখতে পাই। অতএব গ্রন্থটি

নিঃসন্দেহে পিটক পরবর্তীযুগের রচনা। অভিধম্ম পিটকের ধম্মসংগনি ও বিভঙ্গের অংশবিশেষ এবং পট্ঠানে কিছু অংশ এতে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তির কোন উল্লেখ এই গ্রন্থে নাই। অধুনা গ্রন্থটির যে রূপ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে গ্রন্থটি হয়তো সেইরূপে না পাওয়া গেলেও সেই সময়কার বৌদ্ধ প্রজ্ঞার একটি পরিচয় আমরা এখান থেকে পাই এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ অভিধর্ম শাস্ত্রের বিকাশ এবং পরিণতি বিষয়ে এই গ্রন্থ আলোকপাত করে। বুদ্ধের মৃত্যুর আড়াইশো বছরের মধ্যে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছিল তার ইতিহাস সম্বন্ধেও গ্রন্থটিতে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

কথাবত্থু গ্রন্থটি ২৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ৮ থেকে ১২টি প্রশ্নোত্তর আছে। এখানে একজন কাল্পনিক বিরুদ্ধবাদী প্রশ্ন করেছেন এবং তার উত্তর দিয়ে বিরুদ্ধবাদী মত খণ্ডিত হচ্ছে। এইভাবে গ্রন্থটিতে থেরবাদী মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কথাবত্থুকে মৌলিক গ্রন্থ না বলে থেরবাদী মতবাদের ব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত করা যেতে পারে।[৪] মিলিন্দ পঞ্ঞহ সঙ্গে ব্যাখ্যানগত দিক দিয়ে এই গ্রন্থের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। পালি সাহিত্যে তর্কশাস্ত্রের উপর কোন গ্রন্থ না থাকলেও এই গ্রন্থটিকে আমরা ন্যায়শাস্ত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পটভূমি বলে মনে করতে পারি, কারণ গ্রন্থটি বাদ-প্রতিবাদের ভিত্তিতে ও রূপে বিরচিত।

কথিত আছে বুদ্ধের প্রাধানা ভিক্ষুণী ক্ষেমা নিজেকে 'কথাবত্থুবিসারদা'[৫] হিসাবে অভিহিত করত। ক্ষেমার এই উপাধি গ্রহণ থেকে বোঝা যায় অভিধম্ম বিষয়ক আলোচনা তথা কথাবত্থুর অস্তিত্ব বুদ্ধের সময়েই পরিণতি লাভ করেছিল।

১। কখনো কখনো কথাবত্থুকে অভিধম্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। মহাবংস—অধ্যায় ৯৪

২। ঐ, অধ্যায় ৫ : ২৭৮; দীপবংস, ৭:৪১, ৫৬-৫৮

৩। J. R. A. S. 1915, P. 805 ff.

৪। Law, B. C., History of Pali Literature, Vol. I. P. 316

৫। থেরীগাথা-অট্ঠকথা-১৩৫

[দ্রষ্টব্য : Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. II pp. 169-171
Malalasekera, G.P. - Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I p. 505.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কদম্ব (কদম্বক)

অতীতে অনুরাধপুরের পূর্বদিকে কদম্ব নামক একটি নদী প্রবাহিত ছিল, বর্তমানে একে মালবত্তওয়া নামে অভিহিত করা হয়।[১] নিবত্ত চৈত্য এই নদীটির ধারে অবস্থিত ছিল।[২] মহাবিহারের কাছে নদীটিতে একটি সেতুর মত আকার ধারণ করেছিল, যা পায়ে হেঁটে নদীটির পর পারে যাতায়াত করা যেত এবং এটি মহাবিহারের সীমা রেখা তৈরী করেছিল।[৩] অনুরাধপুর থেকে একটি রাস্তা চেতিয়গিরি ছাড়িয়ে কদম্ব নদীটির ধার

পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধার্মিক রাজা মহাদাঠিক-মহানাগ নদী থেকে পর্বত শিখর পর্যন্ত কার্পেট দিয়ে আচ্ছাদিত করেছিলেন যাতে পরিব্রাজকরা নদীতে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে মন্দিরের পাশে যেতে পারেন[৪]।

রাজমাতুদ্বার[৫] পার হয়ে একটি রাস্তা কদম্ব-নদী থেকে থুপারাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগ্গলান ২, কদম্ব নদী ও পর্বতমালার মধ্যে বাঁধ তৈরী করে পত্তপাষাণবাপী, ধনবাপী ও গরীতর[৬] নামে তিনটি জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন এবং উদয় ২ বাঁধের উপর জল তোলার জন্য নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি বাঁধ তৈরী করেছিলেন।[৭]

ককুসন্দ বুদ্ধের সময়ে শ্রীলঙ্কার রাজধানী অভয়নগর কদম্ব-নদীর পূর্বে অবস্থিত ছিল।[৮]

১। মহাবংস, ৮ : ৪৩
২। ঐ ১৫ : ১০
৩। ঐ ৫ : ১৯১
৪। ঐ ৩৪ : ৭৮
৫। সারত্থপকাসিনী, ১ খণ্ড, পৃ: ১৭৩
৬। চুল্লবংস, ৪১ : ৬১
৭। ঐ ৫১ : ১৩০
৮। মহাবংস, ১৫ : ৫৯; দীপবংস, ১৫ : ৩৯ : ১৭ : ১২

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G.P., Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I. p-506]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কন্থক (কণ্টক)

২৯ বছর বয়সে গৌতম তাঁর ঘোড়া কণ্টককে চড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ছন্ন (গৌতমের পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তি)। কণ্টককে জিন পরানো হলে সে সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরে আনন্দে উচ্চস্বরে হ্রেষারব করছিল। তার হ্রেষারব ও প্লুতগতি কপিলাবস্তু নগরবাসীর অতি পরিচিত। তার এই শব্দে নগরবাসী যাতে জেগে না ওঠে ও গৌতমের গৃহত্যাগে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেইজন্য দেবতারা ঘোড়াটির মুখ ও পায়ের শব্দকে আচ্ছাদিত করেছিলেন। কণ্টক দৈর্ঘ্যে আঠারো হাত লম্বা এবং প্রস্থেও একইভাবে প্রশস্থ ছিল। তার গায়ের রং ছিল শ্বেতশুভ্র শাঁখের ন্যায়।

এই যাত্রায় গৌতমের সহচর ছন্ন কণ্টকের ল্যাজ ধরে পথ পার হচ্ছিল। বলবান কণ্টক ছন্নকে পেছনে নিয়ে আঠারো হাত দৈর্ঘ্য নগরদ্বারের সীমারেখা এক লাফে পার হয়েছিল। নগরের প্রান্তে এসে কপিলাবস্তুকে শেষবারের মতো দেখার জন্য সিদ্ধার্থ ঘোড়াটিকে থামালেন। পরে এইস্থানে কণ্টকনিবত্ত-চেতিয় নামে একটি চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। ঘোড়াটি এমনই দ্রুতগতি সম্পন্ন ছিল যে অনোমা নদী পর্যন্ত প্রায় নব্বই মাইল মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত ছুটেছিল। কণ্টক এক রাত্রে সমস্ত চক্রবাল যাত্রা করতে পারত বলে কথিত আছে। আটচল্লিশ ফুট প্রশস্ত নদীটি সে এক লাফে পার হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব নদী পার হয়ে কণ্টককে কপিলাবস্তুতে ফেরৎ নিয়ে যেতে বললে

কন্টক তার প্রভুর দিকে ফিরে তাকিয়ে রইল যতক্ষন পর্যন্ত তাঁকে দেখা যায় এবং ভগ্ন হৃদয়ে মারা গেল এবং কন্টক-দেবপুত্র নামে তাবত্রিংশে লোকে পুর্নঃ জন্মগ্রহণ করল।[১] কন্টক একই দিনে বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল।[২] স্বর্গে অত্যুৎকৃষ্ট রত্নভূষিত তার একটি প্রাসাদ ছিল। তাবত্রিংশলোকে ভ্রমণ করার সময় মোগ্গল্লান এই প্রাসাদটি পরিদর্শন করেছিলেন।[৩]

১। জাতক, ১ খণ্ড, পৃঃ ৬২-৫; মহাবস্তু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯, ১৬৫, ১৮৯-৯০; সম্মোহ—বিনোদনী-পৃঃ ৩৪

২। জাতক, ১ খণ্ড, পৃঃ ৫৪; বুদ্ধবংস-অট্ঠকথা পৃঃ ১০৬, ২৩৪

৩। বিমান-বত্থু, পৃঃ ৭৩; বিমান-বত্থু-অট্ঠকথা - পৃঃ ৩১১-১৮

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P. ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, pp. 509-10.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

কন্দগলক জাতক (জাতক নং ২১০)

শাস্তা সুগতের অনুক্রিয়া সম্বন্ধে বেণুবনে এই কথা বলেছিলেন। তিনি শুনলেন দেবদত্ত বুদ্ধলীলার অনুকরণ করছে। তখন শাস্তা ভিক্ষুদের বললেন, দেবদত্ত পূর্বেও তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিনষ্ট হয়েছিল। তারপর তিনি সেই কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকুটযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খদিরবনে বিচরণ করতেন বলে 'খদিরবণীয়' রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। কন্দগলক নামে একটি পাখির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে সুস্বাদুফলযুক্ত বনে বিচরণ করত।

একদিন কন্দগলক বোধিসত্ত্বের কাছে এলে, তিনি তাকে খদিরবনে নিয়ে মুখের আঘাতে কাঠ থেকে কীট বের করে খেতে দিলেন। কীট খেতে খেতে তার মনে হল সে যেন মধু মাখানো পিঠে খাচ্ছে। এরপর তার মনে গর্বের সঞ্চার হল। সে ভাবল যে সে কাষ্ঠকুটযোনিতে জন্মেছে, বোধিসত্ত্বেরও কাষ্ঠকুটযোনিতে জন্ম তবে সে কেন অনুগ্রহান্নভোজী হবে। এই ভেবে সে স্থির করল এরপর থেকে সে খদিরবনে বসবাস করবে এবং নিজে নিজে খাদ্য সংগ্রহ করবে। বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন যে তার যে কুলে জন্ম সেই কুলের পাখিরা অসার শাল্মলীর ও সুস্বাদু ফলবান বৃক্ষের খাদ্য সংগ্রহ করে। খদির কাঠ অতি সারবান ও কঠিন। তার পক্ষে সারবান কাঠ নিপাটন করা খুব শক্ত। কন্দগলক তাঁর কথা না শুনে দ্রুত ধাবিত হয়ে মুখ দিয়ে সজোরে খদির বৃক্ষে আঘাত করল। কিন্তু তখনই তার মুখ দু টুকরো হল, চোখ দুটি কোটর থেকে বেরিয়ে এল এবং মাথা বিদীর্ণ হল। সে গাছের উপর থেকে নীচে পড়ে গেল এবং মারা গেল।

সমাধানে বুদ্ধ বললেন, তখন দেবদত্ত ছিল সেই কন্দগলক এবং তিনি (বুদ্ধ) ছিলেন খদিরবণীয়।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B. The Jātakas, Vol. II.
২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৩-৪]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কন্দরক সুত্ত

মজ্ঝিম-নিকায়ের অন্তর্গত কন্দরক[১] সূত্রে বলা হয়েছে যখন ভগবান মহাভিক্ষুসংঘের সঙ্গে চম্পকনগরের কাছে গগ্‌গরা পুষ্করিণী তীরে চম্পক-বনে অবস্থান করছিলেন তখন মাহুত পুত্র পেষ্য ও পরিব্রাজক কন্দরক ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একস্থানে উপবিষ্ট হয়ে কন্দরক বললেন যে আপনার দ্বারা ভিক্ষুসংঘ উত্তমরূপে সুনিয়ন্ত্রিত। পুর্বেও যে সমস্ত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ ছিলেন তাঁরাও ভিক্ষুসংঘকে সুনিয়ন্ত্রিত রেখেছিলেন এবং ভবিষ্যতেও যে সমস্ত সম্যকসম্বুদ্ধগণ অবতীর্ণ হবেন তাঁদের সংঘও এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে।

এরপর ভগবান চতুর্বিধ স্মৃতি উপস্থান ব্যাখ্যা করলে প্রেষ্য ভগবানের গুণগান করল এবং মানুষেরা অতি গভীর জ্ঞান সম্পন্ন, পশুরা অগভীর স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন বলল, তদুত্তরে ভগবান বললেন যে ইহ জগতে চার প্রকার ব্যক্তি আছেন ১) আত্মন্তপী ও আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত, ২) আত্মপরন্তপ ও পরপরিতাপানুযোগে নিয়োজিত ৩) আত্মপরন্তপ ও আত্মপরিতাপানুযোগে নিযুক্ত আত্মন্তপও নন আত্মন্তপরিতাপানুযোগেও নিযুক্ত নন, পরন্তপও নন পরন্তপানুযোগেও নিযুক্ত নন। এবং শেষোক্ত মহাপুরুষই ইহজীবনে তৃষ্ণা মুক্ত, নিবৃত শীতীভূত সুখ অনুভব করতে করতে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হয়ে অবস্থান করেন।

এরপর ভগবান এই চার প্রকার মনুষ্য জীবনের সদর্থক ও নঞর্থক দিকগুলি বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুসংঘের কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি ভিক্ষুসংঘকে বোঝান চতুর্থ প্রকার মনুষ্য জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ এই অবস্থায় মানুষ প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষুজনোচিত শিক্ষা ও জীবিকা পরায়ণ হয়ে প্রাণী হত্যা থেকে বিরত হয়, দণ্ড বিরহিত, অস্ত্র বিরহিত, হিংসায় লজ্জাশীল, জীবের প্রতি দয়া পরায়ণ, সর্বপ্রাণী ও সর্বভূতের হিতানুকম্পী হয়ে জীবনযাপন করে। চৌর্যবৃত্তি পরিহার করে, অব্রহ্মচারী পরিহার করে ব্রহ্মচারী হয়। মৈথুন থেকে দূরে থাকে, মিথ্যা বলা পরিহার করে। ভেদবাক্য পরিহার করে। সে বিচ্ছিন্নের মিলন কর্তা, সম্মিলিতদের উৎসাহদাতা, সমপ্রানন্দ ও ঐক্যকর বাক্য ভাষণ করে। কর্কশ বাক্য পরিহার করে, সুমধুর বাক্য ভাষণ করে। বৃথাবাক্য পরিত্যাগ করে পরিচ্ছদযুক্ত ও অর্থসমন্বিত বাক্য ব্যবহার করে, বীজগ্রাম ভূতগ্রাম থেকে বিরত থাকে, বিকাল ভোজন থেকে বিরত হয়ে রাতে উপবাসী ও দৈনিক একবার ভক্ষণ করে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-উৎসব দর্শনে বিরত থাকে। মালা-গন্দ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ জনক দ্রব্য ব্যবহার করে না। উচ্চ শয্যা ও মহাশয্যা গ্রহণে বিরত থাকে। সোনা, রূপা, কাঁচা ধান, কাঁচা মাংস গ্রহণে বিরত থাকে। স্ত্রী, দাস-দাসী গ্রহণে প্রতিবিরত থাকে। ছাগল, ভেড়া, কুকুর, শুকর, হাতী, গরু, ঘোড়া গ্রহণে বিরত থাকে। ক্ষেত্র-বাস্তু গ্রহণে বিরত হয়, দৌত্যকর্ম, তুলাকূট-কাংস্যকূট, উৎকোচ গ্রহণ, ছেদন-বধ-বন্ধন-বিপর্যয় বিলোপসাধন-দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে দেহরক্ষার উপযোগী

চীবর ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী ভিক্ষান্নে সন্তুষ্ট থাকে। এইভাবে চতুর্থ প্রকার মহাপুরুষগণ শীল ও স্কন্দে সমন্বিত হয়ে আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করে।

সে পঞ্চেন্দ্রিয় সংযমের জন্য প্রতিপন্ন হয় এবং আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ত সুখ অনুভব করে। ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে চিত্তের উপক্লেশ ও প্রজ্ঞার দুর্বলকারী পঞ্চবিধ বাধা দূর করে যাবতীয় কামসম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও অকুশল চিন্তা থেকে বিরত হয়ে সবিতর্ক, সুবিচার, বিবেক, প্রীতি-সুখমণ্ডিত হয়ে প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। বিতর্ক-বিচার পরিহার করে প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানে, প্রীতির প্রতি বিরাগ হয়ে উপেক্ষা নামক তৃতীয় ধ্যানে এবং সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, না সুখ-না দুঃখ, উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যানে অবস্থান করে।

এরপর নিজের চিত্তকে সমাহিত, পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করে বহু পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করে। তারপর অপর সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত নিয়োজিত করে। এইরূপে সে আস্রব সমূহের ক্ষয়কর জ্ঞানের নিমিত্ত চিত্ত সংযোজিত করে এবং দুঃখ সত্য, দুঃখ সমদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদ আর্যসত্য যথার্থরূপে জানে, এবং কামাস্রব, ভাবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব ও অবিদ্যাস্রব থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। বিমুক্তিতে বিমুক্তি এই জ্ঞান তার উপলব্ধি হয়। এবং এঁরাই অনাত্মন্তপ অপরন্তপ পরমপুরুষ।

১। মজ্ঝিম-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৫

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কন্দরী জাতক (জাতক নং ৩৪১)

অতীতকালে বারাণসীতে কন্দরি নামে এক অতীব সুন্দর রাজা ছিলেন। অমাত্য পারিষদরা তাঁর জন্য প্রত্যহ সহস্র গন্দক আহরণ করতেন। এই গন্দ দিয়ে তাঁর প্রাসাদে মাখাতেন এবং করগুগুলি চিরে গন্দদারু দিয়ে রাজার খাদ্য পরিপাক করতেন। রাজার পত্নীও পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল কিন্নরা। রাজার সমবয়সী পঞ্চালচন্ড নামে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজার পৌরহিত্য করতেন।

প্রাসাদের কাছে প্রাকারের অন্তর্ভাগে একটি জম্বুবৃক্ষ জন্মেছিল। তার শাখাগুলি প্রাকারের উপর ঝুলত এবং তার ছায়ায় একজন জুগুপ্সিত কদাকার খঞ্জ বসবাস করত। একদিন রানী কিন্নরা বাতায়ন থেকে এই লোকটিকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হলেন। তিনি রাত্রে প্রথমে রাজাকে রতিদানে সন্তুষ্ট করে রাজা ঘুমালে মশারি তুলে বাইরে আসতেন এবং সুবর্ণপাত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত খাদ্য নিয়ে বস্ত্ররজ্জুর সাহায্যে বাতায়ন থেকে নামতেন। সেই খঞ্জকে খাইয়ে তার সঙ্গে ব্যভিচার করতেন এবং পুনরায় রাজার অজ্ঞাতে তাঁর কাছে শুতেন। এইভাবে প্রত্যহ পাপ কর্মে রানী লিপ্ত হতেন কিন্তু রাজা কিছুই জানতে পারতেন না।

একদিন রাজা প্রাসাদে প্রবেশ করার মুখে সেই কদাকার খঞ্জটিকেজম্বুগাছের নীচে শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং পুরোহিতকে বললেন এর প্রতি কি কখনো কোন রমণী কামবশে আসক্ত হতে পারে। রাজার এই কথা শুনে খঞ্জের মনে অভিমান হলো। সে জম্বুবৃক্ষকে সাক্ষী রেখে বলল 'প্রভু জম্বুবৃক্ষদেব। তুমি ভিন্ন এ বৃত্তান্ত কেউ জানে

না যে রানী কিন্নরা প্রত্যহ রাত্রে কামসক্ত হয়ে আমার কাছে আসে।' পণ্ডিত রাজ পুরোহিত খঞ্জের এইরূপ ক্রিয়াকাণ্ড দেখে ভাবলেন রাজার অগ্রমহিষী নিশ্চয়ই এর কাছে এসে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তখন তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন রাত্রে রানীর শরীর স্পর্শ করলে কেমন বোধ হয়? রাজা তদুত্তরে বললেন, শীতল মনে হয়। তখন পুরোহিত বললেন অন্য রমনীর কথা থাকুক, কিন্নরা দেবীই এই লোকটার সঙ্গে ব্যভিচার করেন। রাজা কিন্তু কিছুতেই মানতে চান না যে কিন্নরার মত অপরূপ সুন্দরী এই কদাকার খঞ্জের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে পারেন। তাই পরীক্ষা করার জন্য রাজা সায়মাশ গ্রহণ করার পর কিন্নরার সঙ্গে শয়ন করলেন এবং নিদ্রার ভান করে শুয়ে থাকলেন। কিন্নরা তখন উঠে পূর্ব্ববৎ নিজের কাজ আরম্ভ করলেন। রাজাও তাঁকে অনুসরণ করে জম্বুচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং অবলোকন করতে থাকলেন। অন্যদিনের তুলনায় রানীর যেতে দেরী হয়েছে বলে খঞ্জটি রাগ করে রানীর কর্ণের কাছে আঘাত করল। তখন রানী বললেন, "স্বামিন রাগ করবেন না। রাজা কখন নিদ্রিত হবেন তার প্রতীক্ষা করছিলাম।" তারপর রানী ঐ ব্যক্তির কুটীরে তার গৃহিনীর মত কাজ করতে লাগলেন।

খঞ্জের হস্তাঘাতে মহিষীর কর্ণ থেকে সিংমুখ কুণ্ডলী খুলে রাজার পদযুগলে পড়েছিল। রাজা সেটিকে কুড়িয়ে প্রমাণস্বরূপ সেটিকে নিয়ে ফিরে এলেন। রানী পূর্ব্ববৎ খঞ্জের সঙ্গে ব্যভিচার করে রাজার পাশে এসে শুলেন। রাজা তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

পরদিন রাজা তাঁর দেওয়া সমস্ত গহণা রানীকে পরিধান করে তাঁর সম্মুখে হাজির হতে আদেশ দিলেন। রানী প্রথমবারে এলেন না। দ্বিতীয়বার আসতে আদেশ দেওয়ায় রানী একটি মাত্র সিংহমুখ কুণ্ডল পরিধান করে রাজার সম্মুখে হাজির হলেন। রাজা অপর কুণ্ডলীটির কথা জিজ্ঞাসা করলে রানী বললেন স্বর্ণকারের কাছে। রাজা স্বর্ণকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু স্বর্ণকার বললে যে রানী তাকে কোনরূপ কুণ্ডল দেননি। তখন রাজা রাগভরে তাঁর কাছে থাকা কুণ্ডলটি রানীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং রাজা পুরোহিতকে রানীর মস্তক ছেদন করতে আদেশ দিলেন। পুরোহিত কিন্নরাকে রাজভবনের কোন একটি স্থানে রেখে এসে রাজাকে বললেন কিন্নরার প্রতি যেন রাজা কোন রাগ না করেন কারণ স্ত্রীলোক মাত্রই এইরূপ। রাজা যদি স্ত্রীলোকদের দুঃশীলভাব দেখতে চান তাহলে তিনি দেখাতে পারেন এরা কত পাপীষ্ঠা, মায়াবী। তারপর পুরোহিত ও রাজা ঠিক করলেন ছদ্মবেশ ধারণ করে স্ত্রীলোকেদের চরিত্র পরীক্ষা করতে সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করবেন। তাঁরা এক যোজন হেঁটে রাজপথের একজায়গায় বসলেন, এমন সময় দেখলেন, কোন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ মঙ্গলাচরণান্তে নিজের পুত্রের জন্য এক কুমারীকে আবৃত যানে বসিয়ে বহু অনুচরসহ নিয়ে যাচ্ছেন। পুরোহিত রাজাকে বললেন আপনার ইচ্ছা হলে এই কুমারীকে দিয়ে আপনার সঙ্গে ব্যভিচার করাতে পারি। রাজা বললেন এটা অসম্ভব। এটা আপনি করাতে পারবেন না। তখন পুরোহিত পথের অবিদূরে একস্থানে একটি পর্দা খাটালেন এবং রাজাকে পর্দার ভিতরে রেখে নিজে পথপার্শ্বে বসে কাঁদতে লাগলেন। তখন গৃহস্থটি তাঁর কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন পুরোহিত বললেন যে তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী, তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে, সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক না থাকায় তিনি যেতে পারছেন না। গৃহস্থটি বললেন, "তাঁর নিকট একজন স্ত্রীলোক থাকা দরকার

বটে, আপনার ভয় নাই, এখানে অনেক স্ত্রীলোক আছে, একজন তাঁর নিকট যাবে।" "তবে এই কুমারীই যাক, তাতে এর পক্ষেও মঙ্গলকর হবে।" গৃহস্থটি ভাবল প্রসবকালে তার পুত্রবধূ থাকলে তার শুভ হবে সে বহুপুত্র ও কন্যার জননী হবে, এইরূপ স্থির করে তিনি পুত্রবধূকে সেখানে পাঠালেন। সেই কুমারী পর্দার ভিতরে গিয়ে রাজাকে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হল এবং রাজার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হল, রাজা তাকে তাঁর নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় দান করলেন। কার্য্য সমাধা করে কুমারী ফিরলে লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে? তদুত্তরে সে বলল পুত্র সন্তান। গৃহস্থ তারপর পুত্রবধূকে নিয়ে গমন করলেন। পুরোহিত তখন রাজাকে বললেন, 'দেখলেন মহারাজ, কুমারীরাই যখন এমন পাপাসক্তা, তখন অন্য নারীর তো কথাই নাই।" তারপর পুরোহিত জানতে পারলেন রাজা তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় কুমারীটিকে দিয়েছেন। তখন পুরোহিত দ্রুতবেগে গমন করে যানখানি ধরলেন। লোকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমার ব্রাহ্মণী বালিশের উপর অঙ্গুরী রেখেছিল, কুমারী তা নিয়ে এসেছেন। কুমারী অঙ্গুরীয়টি দেওয়ার সময় পুরোহিতের হাত নখ দিয়ে বিদ্ধ করল এবং বলল, "এই নে, চোর।"

পুরোহিত এইভাবে আরও নানা উপায়ে বহু অতিচারিণী নারী দেখালেন। সমস্ত জম্বুদ্বীপ পর্যটন করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে স্ত্রীজাতি এইরূপ। তারপর বারাণসীতে ফিরে পুরোহিতের অনুরোধে কিন্নরাকে ক্ষমা করলেন কিন্তু প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করলেন এবং অপর এক নারীকে অগ্রমহিষী করলেন, সেই খঞ্জটাকেও তাড়িয়ে দিয়ে জম্বুবৃক্ষের শাখাগুলি কাটালেন।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B., The Jātakas, Vol. III, p. 87. See also Kunāla Jātaka.

২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯, পুনঃ দ্রষ্টব্য কুণাল জাতক]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কন্নকুজ্জ (কান্যকুব্জ)

জম্বুদ্বীপের একটি জেলা। ভগবান বুদ্ধ নৈরঞ্জনা থেকে বারাণসী যাওয়ার পথে কণ্বকুজ্জের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। তিনি নৈরঞ্জনা, সরযূ, সঙ্কস্য, কণ্বকুজ্জ ও প্রয়াগতীর্থের রাস্তা ধরে গঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হন এবং নদীর পরপারে গিয়ে বারাণসীতে উপস্থিত হন[১]। সম্ভবতঃ বেরত ও সঙ্কস্য থেকে বহির্গমণপূর্বক কণ্ণকুজ্জ, উদুম্বর, এবং অগ্গলপুরের পথ ধরে সহজাতি নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন[২]।

সিংহলী ঘটনাপঞ্জী দীপবংসে কন্নকুজ্জকে কন্নগোচ্ছ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং মহাসম্মত বংশীয় নয় জন নৃপতির রাজধানীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশের শেষ নৃপতি ছিলেন নরদেব।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাঙ্-এর মতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সঙ্কস্য থেকে কন্নকুজ্জের দূরত্ব দুইশত লি বা তেত্রিশ মাইল ছিল। কিন্তু অপর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের মতানুযায়ী উভয় শহরের দূরত্ব ছিল উনপঞ্চাশ মাইল।[৩]

বুদ্ধবংসের টীকা গ্রন্থানুযায়ী ফুস্‌স বুদ্ধ প্রথম তাঁর প্রধান দুই শিষ্যকে কন্নকুজ্জতেই উপদেশ প্রদান করেছিলেন। এই গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে যে বুদ্ধ ককুসন্ধ কন্নকুজ্জের ফটকে দুটি অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেছিলেন।[৪]

১। বিনয় পিটক, ৩ খণ্ড, পৃঃ ১১

২। ঐ ২ খণ্ড, পৃঃ ২৯৯

৩। Buddhist Records, p. 205

৪। বুদ্ধবংস অট্‌ঠকথা, পৃঃ ২১০

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপি জাতক (জাতক নং ২৫০)

একজন কুহকী ভিক্ষুকে অবলম্বন করে শাস্তা জেতবনে এই কাহিনীর অবতারণা করেন। ভগবান ভিক্ষুদেরকে বললেন - এই ভিক্ষু কেবলমাত্র এ জন্মে নয়, পূর্ব জন্মেও কুহকী ছিল। এ যখন মর্কট হয়ে জন্মেছিল, তখনও কেবল অগ্নির উত্তাপের জন্য কুহকের আশ্রয় নিয়ে ছিল। এরপর শাস্তা পূর্ব কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছিলেন। বোধিসত্ত্বের একটি পুত্রসন্তান জন্মবার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হল। তখন ব্রাহ্মণ পুত্রটিকে কোলে নিয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমবন্ত প্রদেশে বসবাস করতে লাগলেন। পুত্রও তাপসকুমার রূপে বড় হয়ে উঠতে লাগল।

একবার প্রবল বৃষ্টি হওয়ার ফলে একটি মর্কট শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেড়াতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব একটি বড় কাঠ নিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে মঞ্চে শুয়ে পড়লেন। পুত্রসন্তানটিও তাঁর পাশে বসে পা টিপতে লাগল। এদিকে সেই মর্কট এক মৃত তাপসের বল্কলাদি পরে তাপস সাজল, সে অর্ন্তবাস ও সঙ্ঘটি পরে, এক কাঁধে অজিন ধারণ করে, বাঁক ও কমণ্ডলু নিয়ে ঋষিবেশে বোধিসত্ত্বের পর্ণশালায় উপস্থিত হয়ে অগ্নি-সেবার আশায় কুহক করতে লাগল। বোধিসত্ত্বের পুত্র তপস্বীকে শীতে কাঁপতে দেখে পিতাকে অনুরোধ করল তপস্বীকে ডাকার জন্য।

পুত্রের কথা মত বোধিসত্ত্ব শয্যা থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছদ্মবেশী মর্কটরূপী তপস্বীকে চিনতে পারলেন এবং একটি জলন্ত কাঠ নিয়ে মারতে গেলে মর্কট সেখান থেকে চিরকালের জন্য পালিয়ে গেল।

সমাধানে শাস্তা বললেন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপসপুত্র এবং তিনি ছিলেন সেই তাপস।

দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B., The Jātakas, Vol. II.

২। ঘোষ, ঈশান চন্দ্র, জাতক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯-৭০।

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপি জাতক (জাতক নং ৪০৪)

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দেবদত্তের পৃথিবীগর্ভে প্রবেশ সম্বন্ধে এই কাহিনীটি বলেছিলেন। ভিক্ষুরা বলাবলি করছিল দেবদত্ত অনুচরবর্গের সহিত বিনষ্ট হল। শাস্তা সেখানে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদেরকে বললেন দেবদত্ত অনুচরবর্গের সহিত কেবল এই জন্মে নয় পূর্বেও বিনষ্ট হয়েছিল। এরপর সেই কাহিনী শাস্তা বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপিযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক পাঁচশত কপি পরিবৃত হয়ে রাজকীয় উদ্যানে বসবাস করতেন। তখন দেবদত্ত কপিরূপে জন্মে অপর পাঁচশত কপিসহ সেই উদ্যানেই বসবাস করতেন।

একদিন রাজপুরোহিত উদ্যানে গিয়ে স্নানান্তে গন্ধমালাদি দ্বারা সুশোভিত হয়ে বেরোচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি দুষ্ট কপি তোরণের মস্তকে বসেছিল। পুরোহিত তোরণ দ্বারে উপস্থিত হলে সেই কপি মস্তকে মলত্যাগ করল এবং পুরোহিত উর্দ্ধমুখে দৃষ্টিপাত করলে সে তাঁর মুখেও মলত্যাগ করল। পুরোহিত কপিদেরকে ধ্বংস করার ভয় দেখিয়ে পুনরায় স্নান করে চলে গেলেন।

কপিরা বোধিসত্ত্বকে জানাল পুরোহিত ক্রুদ্ধ হয়ে ভয় দেখিয়ে গেছেন তখন বোধিসত্ত্ব সহস্র কপিকে অন্যত্র চলে যাওয়ার অনুরোধ করলেন কিন্তু একটি অবাধ্য কপি তাঁর কথা না শুনে তার অনুচরদের সহিত সেখানেই থাকার মনস্থ করল। বোধিসত্ত্ব কিন্তু নিজের অনুচরদের সহিত অরণ্যে চলে গেলেন।

এক দাসী ধান ভাঙতো। সে রৌদ্রে শুকনোর জন্য কিছু ধান শুকতে দিয়েছিল। একটি ছাগল ধান খাচ্ছে দেখে দাসী তাকে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে আঘাত করল। ছাগলটার শরীর জ্বলে উঠল। সে ছুটে হস্তীশালার পাশে একটি তৃণকুটীরের বেড়ায় গা ঘসতে লাগল। এতে তৃণকুটীরে আগুণ লাগল এবং সেখান থেকে হস্তিশালায়ও আগুণ লাগল, তাতে হস্তীদের পিঠ পুড়ল। হস্তীবৈদ্যেরা হস্তীদিগের চিকিৎসা করতে লাগলেন।

এদিকে পুরোহিত কপিদের ধরার উপায় চিন্তা করছিলেন। তিনি একদিন রাজদর্শনে গিয়ে রাজার পাশে উপবেশন করলে রাজা পুরোহিতকে বললেন, হাতীদের পিঠ পুড়ে গেছে, রাজবৈদ্যেরা কিছু করতে পারছেন না, পুরোহিত কি কোন ঔষধ জানেন? কপিদেরকে মারার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে পুরোহিত বললেন রাজার উদ্যানেই বহু মর্কট আছে। অমনি রাজা তাঁর তীরন্দাজদের আদেশ দিলেন মর্কটগুলিকে মেরে বসা সংগ্রহ করতে। রাজার তীরন্দাজরা পাঁচশত কপিকে শরবিদ্ধ করল। কিন্তু বড় কপিটি শরাহত হয়েও সেখান থেকে পলায়ন করে বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে হাজির হল এবং সেখানেই মারা গেল। বোধিসত্ত্ব এই খবর শুনে কপিদেরকে বললেন, "যারা শত্রুস্থানে বাস করে, তারা এইরূপেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

সমাধানে বুদ্ধ বললেন তখন দেবদত্ত ছিল সেই অবাধ্য কপি, দেবদত্তের অনুচরেরা ছিল সেই কপির অনুচর এবং তিনি ছিলেন পণ্ডিত কপিরাজ।

দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B., The Jātakas, Vol. III pp. 218-19
২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩-৪।

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপিট্‌ঠবন

গোদাবরী নদীর ধারে একটি উদ্যান। এই উদ্যানের ধারে বাবরির বাসভূমি ছিল।[১] বুদ্ধঘোষের মতে[২] নদীর ধারে এই দ্বীপটি (অন্তরদ্বীপ) কাঁটা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং এর সীমানা ছিল সাড়ে চার মাইল। এই স্থানটি অস্‌সক ও অড়ক এই দুই রাজধানীর মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং এই দুই রাজ্যের নৃপতির নিকট থেকে দু হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রীত হয়েছিল। দুই নৃপতি পুনরায় তিন মাইল জায়গা দান হিসাবে বাবরিকে দিয়েছিলেন। সরভঙ্গ[৩] ও সাল্লসসর[৪] মত ধার্মিক বৃদ্ধদের বাসভূমি ছিল উদ্যাটি। কপিট্‌ঠ-গাছে পরিপূর্ণ ছিল বলে এই জায়গাটিকে কপিট্‌ঠবন নামে অভিহিত করা হত।

১। থেরগাথা-অট্‌ঠকথা - ১ খণ্ড, পৃঃ ৭৩

২। সুত্তনিপাত - অট্‌ঠকথা - ২ খণ্ড, পৃঃ ৫৮১

৩। জাতক - ৫ খণ্ড, পৃঃ ১৩২

৪। ঐ - ৩ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩

দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P., Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I. p. 513.

চিত্তরঞ্জন পাত্র।

কপিলবস্তু

প্রাচীন নগর কপিলবস্তু শাক্য রাজবংশের রাজধানী ও শাক্যসিংহ ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় এই জায়গায় প্রচুর লোকের বসবাস ছিল, সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান প্রভৃতি ছিল।

ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-সাঙ কপিলবস্তু পরিদর্শন করেন ও 'কি-আ-বো-লো-বে' ও কি-পি-লো-ফ-সসে তি' নামে অভিহিত করেন। হিউ-এন-সাঙের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই কপিলবস্তু একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এর পরিধি প্রায় ৬০০ মাইল। বর্তমানে ফৈজাবাদ থেকে ঘর্ঘরা ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্তী স্থান এবং এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত চীনা পরিব্রাজকগণের বর্ণিত কপিলবস্তু বলে অনুমান করা হয়। ফৈজাবাদ থেকে ২৫ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত বস্তিজেলার অন্তর্গত মনসুরনগর পরগণায় সামীল ভুইয়া নামক স্থানই প্রাচীন কপিলবস্তু নগর বলে স্বীরকৃত হয়েছে। বর্তমানে সকলে একে 'ভুইলা তাল বলে'[১]।

লুম্বনী উদ্যানে সম্রাট অশোক দ্বারা নির্মিত স্তম্ভগাত্রে উৎকলিত এবং নিগালীবা স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ কপিলবস্তুর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ে কিছুটা সাহায্য করে। পিপরাওয়া গ্রামে পাত্রাধারটি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই জায়গাটি কপিলবস্তু ছিল এই অনুমান করা যেতে পারে।

প্রাচীনকালে এই নগরটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হত। যথা-কপিলাবস্তু, কপিলবস্তু, কপিল্যবাস্তু, কপিলপুর, কপিলনগর প্রভৃতি। কপিলবস্তু শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের রাজধানী ছিল। এর আয়তন খুব একটা বড় ছিল না। কিন্তু মগধাধিপ বিম্বিসার রাজগৃহে, অঙ্গাধিপতি চম্পানগরে, লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে এবং সাকেতপুরী পরিত্যাগের পর

যখন কোশলপতি প্রসেনজিৎ উত্তরে শ্রাবস্তীনগরে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে রাজ্যশাসন করছিলেন, সেই সময়ে কোশল রাজ্যের পূর্বভাগে রোহিনী নদীর তীরে শাক্য ও কোলিয় নামে দুটি ক্ষত্রিয় শাখা ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করছিল। এই সময়ে মগধ ও কোশলরাজ নিজেদের রাজ্যসীমা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এই সুযোগে রোহিনী নদীর একদিকে শাক্যগণ এবং অপরদিকে কোলিয়গণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করেন এবং কপিলবস্তুতে শাক্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন দুই কোলিয় রাজ্যকন্যাকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠারাজমহিষীর গর্ভে সন্তান এলে তিনি কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু রাস্তায় লুম্বিনী উদ্যানেই একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। এই সন্তান শাক্যবংশোদ্ভূত বলে শাক্যসিংহ নামে পরিচিত হন। ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীবন বা লুম্বিনী উদ্যানটি বৌদ্ধদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'ললিতবিস্তর'এ কপিলবস্তুর তিনটি নাম দেখা যায়। কপিলবস্তু, কপিলপুর[২] এবং কপিলাহবয়-পুর[৩]। মহাবস্তুতেও এই নামগুলির উল্লেখ দেখা যায়[৪]। দিব্যাবদান গ্রন্থানুসারে ঋষি কপিলের এইস্থানে আশ্রম ছিল বলে এর কপিলবস্তু নামকরণ হয়েছে। বুদ্ধঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত গ্রন্থে কপিলাহ্বয়পুর কথাটি ব্যবহার করেছেন।

পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায় সাকেত বা পোতলকবাসী সূর্য বংশীয় রাজা ইক্ষাকুর পুত্রেরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে কপিলবস্তু নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইক্ষাকুবংশীয়রা তাদের রক্ত বিশুদ্ধি রক্ষা করার জন্য স্বীয় ভগিনীদের বিবাহ করে শাক্য নামে পরিচিত হন এবং শাক্যবংশীয়গণের প্রতিষ্ঠিত নগরই কপিলাবস্তু বা কপিলবস্তু।

রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী এবং গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান হিসাবে কপিলবস্তু বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে আছে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে কপিলবস্তু সেইসময়ে বিশেষ মর্যাদা ছিল না। কোশল রাজার অধীনে থেকে শাক্যগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। বিড়ুড়ভ কর্তৃক কপিলবস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অবশিষ্ট শাক্যগণ উৎপীড়িত হয়ে হিমালয়ে গিয়ে মোরীয় নগর স্থাপন করেছিলেন[৫]। তথাপি কতিপয় শাক্য কপিলবস্তুতে থেকে গিয়েছিলেন বলে অনুমিত হয় কারণ দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বাণ সুত্তন্তে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর পুতাস্থি গ্রহণের জন্য শাক্যগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় দেখা যায় তখন কপিলবস্তুতে মাত্র দশটি উপাসক পরিবারের অবস্থান ছিল এবং বুদ্ধের জীবনকথার সঙ্গে জড়িত কিছু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা অট্টালিকা ও ভাস্কর্যমূর্তি ছিল। এই ভাস্কর্যমূর্তিগুলির মধ্যে শ্বেতহস্তীরূপ বোধিসত্ত্বের মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ, শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই কপিলবস্তুতে সেই সময়ে অতি অল্পসংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। তাঁর নজরে এসেছিল প্রাচীন নগরের ভিত্তি, রাজকীয় বাসগৃহের ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠামো এবং কিছু বৌদ্ধ ইমারত।

চারটি বৌদ্ধতীর্থস্থানের মধ্যে কপিলবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানটি অন্যতম। কপিলবস্তু শহরের নিকটে রোহিণী নদী প্রবাহিত ছিল এবং নদীটি শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে একটি সীমারেখা তৈরী করেছিল[৬]। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কপিলবস্তুর রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। কপিলবস্তুর 'সন্থাগার' বা সংস্থাগার থেকে গণপ্রধানদের নির্দেশানুসারে রাজ্যশাসন পরিচালিত হওয়ার জন্য রাজ্যটি ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।[৭] সংস্থাগারশালাতেই কপিলবস্তুবাসীরা রাজকুমার বিড়ুড়ভকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।[৮]

কপিলবস্তু শহরটি ১৮ হাত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[৯] রাজগৃহ থেকে প্রায় ৬০ লীগ দূরে স্থানটির অবস্থান ছিল। গৃহত্যাগ করে গৌতম কপিলবস্তু থেকে ৩০ যোজন পথ অতিক্রম করে অনোমা নদীর তীরে পৌঁছেছিলেন। বুদ্ধ তাঁর বোধিলাভের পর দুই মাসে এই পথ অতিক্রম করে পিতা শুদ্ধোদনকে দর্শন দান করেছিলেন। প্রায় ২০ হাজার ভিক্ষুসহ কালুদায়ীর সঙ্গে তিনি কপিলবস্তু নিকটস্থ ন্যাগ্রোধারামে বসবাস করেছিলেন। তিনি প্রাতিহার্য-প্রদর্শনপূর্বক স্বজাতীয় আত্মীয়বর্গকে বিমোহিত করেন এই কপিলবস্তুতেই। বেস্সন্তর জাতকটি তিনি কপিলবস্তুতেই বর্ণনা করেন। কপিলবস্তু নগরে তিনি ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলে তাঁর পিতা শুদ্ধোদন এবং আত্মীয়বর্গ সিদ্ধার্থকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে বিহুল ও বেদনাহত হন। শুদ্ধোদন পুত্র বুদ্ধকে আমন্ত্রন করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান। বুদ্ধের ধর্মকথা শ্রবণ করে শুদ্ধোদন সোতপত্তি ফল লাভ করেন। রাহুলমাতা গোপা ব্যতীত রাজপ্রাসাদের সকলেই বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ধর্মকথা শুনতে তাঁর সমীপে উপনীত হন। পুনঃর্বার ধর্মকথা শুনে শুদ্ধোদন সকদাগামীফল প্রাপ্ত হন এবং মহাপজাপতি গৌতমী সোতপত্তি স্তরে উপনীত হন। তারপর বুদ্ধ রাহুলমাতার বাসস্থানে গিয়ে সেখানে 'চন্দকিন্নর জাতক'টি উপদেশচ্ছলে বলেন। রাহুলমাতাকে উপদেশ দানের পরদিন ভ্রাতা নন্দ বৌদ্ধধর্মে প্রব্রজিত হন এবং এর সাতদিন পর পুত্র রাহুল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, অষ্টমদিনে 'মহাধম্মপাল জাতক'টি শুনে পিতা শুদ্ধোদন অনাগামি ফলে উন্নীত হন। কপিলবস্তু থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বুদ্ধ প্রায় অশীতিসহস্র শাক্যগণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - আনন্দ, ভগ্‌গু, অনিরুদ্ধ, কিম্বিল, দেবদত্ত প্রভৃতি।[১০] সারিপুত্তের অনুরোধে বুদ্ধ 'বুদ্ধবংস'র গাথাসমূহ কপিলবস্তুতেই প্রচার করেন। বুদ্ধ কপিলবস্তুতে বহুবার আগমন করলেও দুবারের ঘটনা কপিলবস্তুর জনমনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথম ঘটনাটি হল রোহিনী নদীর জলবণ্টন নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ নিরসন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল রাজা বিড়ুড়ভের হাতে শাক্যকুল বিনাশ নিবারণার্থে কপিলবস্তুতে একাদিক্রমে তিনবার আগমণ। এই উপলক্ষে তিনি ফন্দন, দদ্দভ, লকুটিক, রুক্খধম্ম, বট্টক প্রভৃতি জাতক ও অট্টদন্ত সুত্ত উপদেশ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে এসে তিনি ন্যাগ্রোধারামে বসবাস না করে মহাবনে বসবাস করেছিলেন।

১। Cunningham's Archaeological Survey of India, Vol. XII, pp. 83-172.

২। Lalitavistara, p. 202

৩। ঐ p. 20

৪। Mahâvastu p. 50, 55

৫। ধম্মপদট্ঠকথা ৩/২৫৪

৬। ঐ

৭। দীঘনিকায় ১, ১৯; জাতক ৪, ১৪৫

৮। ঐ ৮,১৫৬

৯। ঐ ১, ৬৩; মহাবস্তু ২, ৫

১০। বিনয়পিটক ২,১৮০ ধম্মপদট্ঠকথা, ১, ১৩৩

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপোতকন্দর

রাজগৃহের নিকটে মৃত্তিকার নীচে একটি গুহা। এই জায়গায় পরবর্তীকালে কপোতকন্দর নামে একটি গুহা নির্মিত হয়েছিল। এক সময় বহুসংখ্যক কপোত এই গুহাটিতে বসবাস করত। তাই এটিকে এই নামে অভিহিত করা হত।[১] কোন একটি বিশেষ উপলক্ষ্যে সারিপুত্র তাঁর মস্তকমুণ্ডন করে সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে সেখানে বসেছিলেন এবং একটি যক্ষ তার বন্ধুসহ যক্ষসভাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে সারিপুত্রের মস্তকোপরি গমন করছিল। তার বন্ধু বারণ করা সত্ত্বেও সে ভিক্ষুটির উজ্জ্বল চক্চকে মস্তকের উপর খট্খট্ শব্দ করে কুকর্ম করতে প্ররোচিত করছিল। তৎক্ষণাৎ যক্ষটি অগ্নিনরকে পতিত হয়ে মারা গেল।

একটি হস্তীকে[২] পেষণ করতে যে ভারের প্রয়োজন হয় সেইরূপ ভারী যক্ষটির আঘাতে সারিপুত্রের অল্প শিরঃপীড়া দেখা দিয়েছিল।

বিসুদ্ধিমগ্গের[৩] অভিমতানুযায়ী সারিপুত্র সেই মুহূর্তে সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

১। উদান-অট্ঠকথা, পৃঃ ২৪৪

২। উদান, পৃঃ ৩৯; থেরগাথা, পঙক্তি নং ৯৯৮; পেতবত্থু-অট্ঠকথা, পৃঃ ৪৯৪

৩। বিসুদ্ধিমগ্গ, পৃঃ ৩৮০

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপোত জাতক (জাতক নং ৪২)

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক লোভী ভিক্ষু সম্বন্ধে কোপতজাতকের অবতারণা করেন। অতীতকালেও লোভবশতঃ তার প্রাণহানি হয়েছিল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিও স্বীয় বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। শাস্তা এরপর অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

অতীতকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কপোতরূপে জন্মেছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীবাসীরা পুণ্যকামনায় পাখিদের সুবিধা ও আশ্রয়ের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে বাসা বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখত। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রান্না ঘরে একটি

ঝুড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিল। বোধিসত্ত্ব এই ঝুড়িতে বসবাস করতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে আহারের খোঁজে বাইরে বেরিয়ে রাত্রিতে আবার সেই ঝুড়িতে ফিরে আসতেন।

একদিন একটি কাক ঐ রান্নাঘরের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় মাছ ও মাংসের গন্ধ পেয়ে তা খাওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল। সায়ংকালে সে বোধিসত্ত্বকে সেই রান্নাঘরে প্রবেশ করতে দেখে স্থির করল এই কপোতের মাধ্যমেই সে তার কার্যসিদ্ধি করবে।

পরদিন সকালে কাক সেই রান্নাঘরের কাছে বসে রইল এবং বোধিসত্ত্ব আহার সংগ্রহের জন্য যাত্রা করলে কাক তাঁর পেছনে চলতে লাগল। বোধিসত্ত্ব কাককে তাঁর পেছনে অনুসরণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কাক তদুত্তরে জানাল বোধিসত্ত্বকে তার খুব ভাল লেগেছে। বোধিসত্ত্ব তবুও কাককে নিবারণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু না পেরে তাকে সাবধানে চলতে বললেন।

এরপর বোধিসত্ত্ব স্বীয় খাদ্যান্বেষণ করতে লাগলেন। কাকও গোময়পিণ্ডাদি উল্টে কীটাদি প্রাণী খেতে লাগল। বোধিসত্ত্বের খাওয়া শেষ হলে সন্ধ্যার সময় বাসস্থানের দিকে চলতে লাগলেন, কাকও তাঁর অনুগামী হয়ে সেই রান্নাঘরে প্রবেশ করল।

একদিন শ্রেষ্ঠী প্রচুর মাছ ও মাংস আনলে পাচক সেগুলি রান্নাঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখল। তা দেখে কাকের লোভ হল এবং সে ঠিক করল পরের দিন বাইরে আহারান্বেষণে যাবে না এবং এই মাংস খাবে। এরপর সে সমস্ত রাত পীড়ার ভাণ করে চিৎকার করতে লাগল। সকালে বোধিসত্ত্ব কাককে বাইরে গিয়ে আহারান্বেষণ করার কথা বললে কাক তার কুক্ষিপীড়ার কথা বলল। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন কাক মাছ-মাংস খাবার লোভে কুক্ষি-পীড়ার কথা বলছে। তখন বোধিসত্ত্ব কাককে বললেন লোভের বশবর্তী না হতে এবং তারপর তিনি আহারান্বেষণের জন্য বাইরে চলে গেলেন।

পাচক মাছ-মাংস বিভিন্ন ভাবে রান্না করে বাষ্প নির্গমণের জন্য পাত্রগুলির মুখ একটু করে খুলে রেখে পাত্রের উপর ঝাঁঝরি রেখে বাইরে গিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে লাগল। কাক ঝুড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল পাচক বাইরে, এই সুযোগে সে ঝাঁঝড়ির উপর বসে একটি বড় মাংস পিণ্ড আনতে গেলে ঝাঁঝরি মাটিতে পড়ে গেল। পাচক শব্দ শুনে রান্নাঘরে এসে দেখে কাক মাংস খেতে এসেছে। পাচক কাকটিকে ধরে তার গায়ের সমস্ত পালক তুলে ফেলে আদা, নুন ও জিরা বেটে ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে কাকের গায়ে মাখিয়ে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল। বোধিসত্ত্ব ফিরে এসে দেখলেন কাক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা গেল। বোধিসত্ত্বও ঐ রান্নাঘরে থাকা উচিত নয় ভেবে অন্যত্র চলে গেলেন।

সমাধানে বুদ্ধ বললেন—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল এই কাক, এবং তিনি ছিলেন সেই কপোত।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B. The Jātakas, Vol. I.

২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৮]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপোত জাতক (জাতক নং ৩৭৫)

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। শাস্তা সেই ভিক্ষুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে প্রকৃতই লোভী কি না? তদুত্তরে সে তা স্বীকার করেছিল। শাস্তা বললেন শুধু এই জীবনে নয় পূর্বজন্মেও সে লোভী ছিল। তারপর সেই বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের সভায় বোধিসত্ত্ব পারাবত যোনিতে জন্মেছিলেন এবং বারাণসী শ্রেষ্ঠীর পাকশালায় একটি ঝুড়িতে বাস করতেন।

একসময়ে এক কাক মৎস্য-মাংসের লোভে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সখ্যস্থাপনপূর্বক সেখানে বাস করতে লাগল। সে একদিন প্রচুর মাছ মাংস দেখে তা খাওয়ার লোভে ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে শরীরে কষ্টের ভান করে শুয়ে থাকল। বোধিসত্ত্ব কাককে খাদ্যান্বেষণে যাওয়ার জন্য আহ্বান করলে তার অজীর্ণ হয়েছে বলে বোধিসত্ত্বকে একাকী যেতে বলল।

বোধিসত্ত্ব চলে গেলে পাচকের পাক করা মাছ-মাংস খাওয়ার জন্য কাক অপেক্ষা করতে লাগল। পাচক ঘাম মোছার জন্য বাইরে গেলে কাক ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে ঝোলের পাত্রের কাছে লুকালো, তাতে পাত্রটিতে শব্দ হল। সেই শব্দ শুনে পাচক ঘরে ঢুকে কাকটিকে ধরে তার পালক তুলে ফেলল এবং কাঁচা আদা ও শ্বেত সরিষা বেটে পচা ঘোলে মিশাল এবং কাকটিকে মাখিয়ে দিল এবং ঝুড়ির ভিতরে আটকে রাখল। পারাবত ফিরে তাকে তদবস্থায় দেখে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল, "এ কোন্ বলাকা আমার বন্ধুর ঝুড়িতে শুয়ে আছে? বন্ধু আসলে যে রাগ করবে ও ওকে মেরে ফেলবে।"

তারপর কাককে বিভিন্নভাবে ভৎর্সনা করে বোধিসত্ত্ব আর সেখানে থাকলেন না। কাক সেখানেই প্রাণত্যাগ করল।

সমাধানে শাস্তা বললেন তখন সেই ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং তিনি ছিলেন সেই পারাবত।

[দ্রষ্টব্য : ১। Cowell, E. B., The Jātakas, Vol. III, pp 148-50
২। ঘোষ, ঈশানচন্দ্র, জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১-৩৩]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপ্প থের

একজন অর্হৎ। কপ্প থের মগধ রাজ্যের কোন একটি প্রদেশের রাজ্যপালের পুত্র ছিলেন এবং আত্ম-চরিতার্থে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধদৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে দেখলেন এবং সতর্ক করলেন, শরীরের অশুচি প্রকৃতির কথা তাঁকে বললেন, উদাহরণ, উপমা ও অলংকার সহযোগে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিলেন। কপ্প বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে সংঘে যোগ দিলেন। মুণ্ডিতমস্তক হওয়ার পর তিনি একজন অর্হতে পরিণত হলেন। সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় তিনি একজন ধনী গৃহস্থ ছিলেন এবং বুদ্ধ মন্দিরে বহু মূল্যবান ধনরত্ন সহযোগে একটি কল্পবৃক্ষ প্রদান করেছিলেন। তাঁর জন্মগ্রহণ কালে একটি স্বর্গীয় বৃক্ষ ঘরের বাইরে বেড়ে উঠেছিল। সুচেল[১] নাম ধারণ

করে তিনি আট বার রাজা হয়েছিলেন, অপদান[২] গ্রন্থের কপ্পরুক্খিয় এবং কপ্প থের সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

১। থেরগাথা - ৫৬৭-৭৬; থেরগাথা-অট্ঠকথা, ১ খণ্ড, পৃঃ ৫২১

২। অপদান, ১ খণ্ড, পৃঃ ৯১

[দ্রষ্টব্য : Malalasekera, G. P., Dictionary of Pali Proper Names, Vol I. p. 521.]

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কপ্পটকুর থের

ইনি ছিলেন অর্হৎ। 'কপ্পট' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিন্নবস্ত্র এবং 'কুর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সিদ্ধ অন্ন। শ্রাবস্তীর এক দরিদ্রকুলে তাঁর জন্ম এবং তিনি জীর্ণবস্ত্র বরিধান করে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করতেন বলে তাঁর ঐ নাম হয়। যৌবনপ্রাপ্ত হলে তিনি ঘাস বিক্রয় করে জীবনধারণ করতেন। একদিন জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট ধর্মদেশনা শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন। এইভাবে তিনি সাতবার সঙ্ঘে প্রবেশ করে সাতবার গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একদিন বুদ্ধ তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। এতে তাঁর চৈতন্যোদয় হয় এবং বিপস্সনা বর্ধিত করে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

বিপশ্যী বুদ্ধের সময়ে তিনি বিনতা নদীর তীরে বুদ্ধকে কিছু কেতকী পুষ্প দান করেছিলেন। অপদান গ্রন্থের 'কেতকপুপ্ফিয়' এবং বর্তমান 'কপ্পটকুর থের' সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি ছিলেন।[১]

১। ডি.পি.পি.এন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৩।

সুকোমল চৌধুরী

কপ্পিতক থের

ইনি বিনয়বিশারদ উপালি স্থবিরের উপাধ্যায় ছিলেন। একবার তিনি বৈশালীর নিকটে একটি শ্মশানে অবস্থান করছিলেন। ঐ শ্মশানেই ছব্বগ্গীয় ভিক্ষুণীরা তাঁদের পরলোকগত এক নেত্রীর চিতাভস্মের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করছিলেন। ঠিক তার পার্শ্বে স্থবিরের ধ্যানগুহা। স্থবির তাঁদের রোদনে বিরক্ত হয়ে ঐ স্তূপ ভেঙ্গে দেন। এতে ভিক্ষুণীরা ক্রুদ্ধ হয়ে স্থবিরকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে একদিন তাঁর ধ্যানগুহা ধূলিসাৎ করে দেন। তাঁরা মনে করলেন যে স্থবিরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু স্থবির তাঁর শিষ্য উপালির দ্বারা সতর্কিত হয়ে পূর্বেই ঐ গুহা ত্যাগ করেছিলেন। পেতবত্থু ও পেতবত্থু-অর্থকথা অনুসারে কপ্পিতক বৈশালীর নিকট কপিনচ্চান নামক স্থানে বাস করতেন। জনৈক প্রেতের হয়ে লিচ্ছবি অম্বসক্খর প্রত্যহ তাঁর জন্য মধ্যাহ্ন আহার সরবরাহ করতেন। বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হবার পূর্বে তিনি সহস্র-সংখ্যক জটিল-তাপসদের প্রধান ছিলেন। সমন্তপাসাদিকায়[১] বলা হয়েছে : 'আয়স্মা কপ্পিতকো তি অয়ং জটিলসহস্সস্স অব্ভন্তরো থেরো।'[২]

১। পৃ: (রোমান) ৯৩৭, নালন্দা সংস্করণ, পৃঃ ৯৭৯।

২। ডিপিপিএন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৪।

সুকোমল চৌধুরী

কবলিংকার-আহার (সং কবলীকৃত আহার)

অভিধর্মে আহারকে 'পরিপোষণ করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আহার চার প্রকার: কবলীকৃত আহার, স্পর্শাহার, মনঃসঞ্চেতনা আহার এবং বিজ্ঞান আহার। কবলীকৃত আহার—স্থূল খাদ্য কবলীকৃত আকারে বা গ্রাস তৈরী করে আহার করা হয় বলে তাকে কবলীকৃত আহার বলা হয়। এই কবলীকৃত আহার রূপদেহকে পরিপোষণ করে।

[স্পর্শাহার—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ। ইহা পাঁচ প্রকার বেদনাকে পরিপোষণ করে।

মনঃসঞ্চেতনা আহার—২৯ প্রকার কুশল এবং অকুশল লোকীয় চিত্তকে মনঃসঞ্চেতনা আহার বলা হয়। এগুলি ত্রিভবে উৎপত্তির কারক বা পরিপোষক।

বিজ্ঞানাহার—ইহা হচ্ছে প্রতিসন্ধি চিত্ত যা সহজাত নামরূপকে পরিপোষণ করে। প্রতিসন্ধিচিত্ত ১৯ প্রকার। অসংজ্ঞসত্ত্বের ক্ষেত্রে আহার কেবল রূপকে পরিপোষণ করে এবং অরূপ সত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবল নামকে পরিপোষণ করে। যে ভূমিতে পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান সে ভূমিতে আহার নামরূপকে পরিপোষণ করে।]

সুকোমল চৌধুরী

কমলশীল

কমলশীল ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতের সুযোগ্য শিষ্য। তাঁর পূর্বজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন নালন্দায় তন্ত্রের অধ্যাপক। তিব্বতীয় সূত্রানুসারে তিনি তিব্বতরাজ খ্রিসোন ডেত্ সান (K'ri-sron–Ide–btsan)-এর আমন্ত্রণে তিব্বতে গমনপূর্বক শান্তরক্ষিত অনুসৃত মাধ্যমিক শাখার সাতন্ত্র সম্প্রদায়ের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য রাজা খ্রি-সোন-ডেত্-সান যখন সাম্-ইয়াজ মঠাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন তখন থেকে আমৃত্যু শান্তরক্ষিত তিব্বতেই অবস্থান করেন এবং তাঁর জীবনের শেষ পর্বে মহাযানপন্থী এক চীনা ভিক্ষু স্বীয় মতবাদ প্রচার করতে থাকায় তিব্বতে এক ধর্মীয় সংকট সৃষ্টি হয়। মৃত্যুশয্যায় শান্তরক্ষিত রাজাকে প্রয়োজন হলে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কমলশীলকে আনার কথা বলেন। এইসূত্রে কমলশীল তিব্বতে আসেন এবং শান্তরক্ষিতের স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর সাম-ইয়াজ্ মঠে অনুষ্ঠিত তর্কযুদ্ধে চীনা পণ্ডিত হা-সান (Hva-San)-কে পরাস্ত করে পুনরায় শান্তরক্ষিত তথা আচার্য নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। দুঃখজনকভাবে এক চক্রান্তের স্বীকার হয়ে তিনিও নিহত হন। এই সম্পর্কে বু-স্তোন জানিয়েছেন হা-সানের অনুগামীরা তাঁকে হত্যা করেন আর তিব্বতের প্রাচীন কাহিনীকারদের মতে কমলশীলের হত্যাকারীরা ছিলেন বোন্‌পো (Bonpo) নামক স্থানীয় বিরুদ্ধবাদী এক সম্প্রদায়।

কমলশীল শান্তরক্ষিত বিরচিত 'তত্ত্বসংগ্রহে'র ওপর 'তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা' নামক টীকা রচনা করে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থে তত্ত্বসংগ্রহের দুর্বোধ্য কারিকাগুলো তিনি সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। 'ন্যায়বিন্দুপূর্বপক্ষ সংক্ষেপ' নামক তিব্বতীয় ভাষায় দুষ্প্রাপ্য এক গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। বিতর্কে চীনা পণ্ডিত

হা-সানকে পরাজিত করার পর 'মাধ্যমিকালোক', 'ভাবনাক্রম' এবং 'উত্তরভাবনাক্রম' নামক তিনটি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। যোগাচার-মাধ্যমিক মতানুযায়ী ধ্যানের মাধ্যমে সত্য নির্ণয়ের ক্রমিক প্রগতির ওপর ব্যাখ্যা সম্বলিত ঐ পুস্তকত্রয়ে ধ্যান শিক্ষার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঞ্জুর অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি পুস্তকেরও প্রণেতা কমলশীল। পুস্তক চারটি হল—

১) আর্যসপ্তশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা টীকা;

২) আর্যবজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা টীকা;

৩) প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়নাম টীকা;

৪) ডাকিনীবজ্রগুহ্য গীতিনাম টীকা;

মনে করা হয় কমলশীল 'মহামুদ্রোপদেশ বজ্রগুহ্যগীতি' নামক একটি গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

[দ্রষ্টব্য : 1. Majumdar, R. C. ed. 'The History of Bengal' Vol- I (Hindu period), pages, 301f, 333f, 674f. The University of Dacca, Dacca, 1943, Re. 1963.

2. Joshti. L. M. Studies in the Buddhistic Culture of India. page-160, Motilal Banarasidass, Delhi, First edn. 1967, Revised edn. 1977, Re-1987.]

ঐশ্বর্য বিশ্বাস

কম্পিল্ল (কম্পিল্লক, কম্পিল্লিয়)

সম্ভবত: ইহা ছিল উত্তরপাঞ্চাল রাজ্যের রাজধানী। দুর্মুখ একবার এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে যে, কম্পিল্লই ছিল রাজ্যের নাম এবং ইহার রাজধানী ছিল উত্তরপাঞ্চাল। একবার অলীনসত্তকেই কম্পিল্ল বলা হয়েছে, যেহেতু তিনি কম্পিল্ল নগরীরই রাজা ছিলেন।[১]

১। ডিপিপিএন, ১ম, পৃঃ ৫২৫

সুকোমল চৌধুরী

কম্বোজ (কম্বোজক)[১]

প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের একটি জনপদ। ঘোড়ার জন্মস্থানের জন্য বিখ্যাত। কুণাল জাতকে (সংখ্যা ৫৩৬) বর্ণিত হয়েছে কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় কম্বোজবাসীরা ঘোড়া শিকার করতেন। ঘোড়া যেখানে জল খেতে আসে তাঁরা সেখানে শেওলার উপর মধু ছিটিয়ে দেন। ঘোড়া মধুর গন্ধে ছুটে আসে এবং ধরা পড়ে যায়। অস্সলায়ন সুত্তে আছে যে, বুদ্ধের সময়ে যোন, কম্বোজ এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক ছিল—প্রভু এবং ভৃত্য (দাস)। তবে নজির আছে যে, কর্মবিপাকে প্রভুও ভৃত্য হয়ে যেতেন, আবার ভৃত্যও প্রভু হয়ে যেত। মজ্ঝিমনিকায়ের অট্ঠকথা (২য়, পৃঃ ৭৮৪) তে আছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র নিয়ে কম্বোজে গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে, সেখানে

তাঁর মৃত্যু হয়। ফলতঃ বাঁচার তাগিদে এবং সন্তানদের রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে অন্যের কাজ করতে হোত এবং তাঁর সন্তানগণ ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল। ভূরিদত্ত জাতকে (সংখ্যা ৫৪৩) দেখা যায় যে, কম্বোজবাসীরা তাঁদের আগের আচার রীতি-নীতি ভুলে গিয়ে বর্বরে পরিণত হয়েছিল। তাই অন্যদেশের স্ত্রীজাতি ভয়ে কম্বোজে যেতেন না। পেতবত্থু (পৃঃ ২৩) থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সার্থবাহরা কম্বোজ হয়ে তাঁদের সার্থ নিয়ে যেতেন। দ্বারকা থেকে কম্বোজে যাতায়াতের সোজা রাস্তা ছিল। অশোকের প্রস্তরলিপি (নং ১৩) থেকে জানা যায় যে, অশোক কর্তৃক প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণ কম্বোজেও গিয়েছিলেন। চূলবংসের[২] বর্ণনায় দেখা যায় যে, পশ্চিম শ্যামদেশকেই কম্বোজ বলা হ'ত।

১। ডিপিপিএন, ১ম, পৃঃ ৫২৬-২৭

২। চূলবংস, অধ্যায় ৭৬, পৃঃ ২৫, ৫৫

সুকোমল চৌধুরী

কম্ম (কর্ম)

প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনায় জীবের দুঃখের যে কারণগুলি উল্লেখ আছে, তার মধ্যে কর্মের উল্লেখ নাই। অনুপস্থিত থাকলেও, কর্মবাদ এই মতের একটি রূপ, কর্মবাদ উপনিষদ দর্শনেও সম্মত। বুদ্ধ উপনিষদের মতকে অনুসরণ করে মানুষের বর্তমান জীবন, তার অতীত জীবনের ফল এবং তার ভাবী জীবন তার বর্তমান জীবনের যা ফল তা হবে বলিয়াছেন, মিলিন্দ পঞ্‌ঞ গ্রন্থে নাগসেন বলেছেন "কর্মের পার্থক্য হেতু সব মানুষ এক হয় না, কেউ স্বল্পজীবী, কেউ দীর্ঘজীবী, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ স্বাস্থ্যহীন, কেউ সুশ্রী, কেউ কুৎসিত, কেউ বলবান, কেউ দুর্বল, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ উচ্চ, কেউ নীচ, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ।"

সব কর্মই যে ফলপ্রসূ হবে এমন কোন কথা নাই। যে সকল কর্মের মূলে আসক্তি নাই, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নাই, তাদের কোনও ফল উৎপন্ন হয় না। তৃষ্ণা বর্জিত কর্ম নিজে কোনও ফল উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হলে, তখন লোকে অর্হৎ হয়। অর্হত্ব প্রাপ্তির পর কর্ম কোন ফল উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না। শুভ বা অশুভ কোন ফলই উৎপাদিত হয় না। কর্মের প্রবর্তক কামনা দ্বারাই কর্মের ফল উৎপন্ন হয়। কামনা নিবৃত্তি হলে অজ্ঞান, দ্বেষ ও উপাদানের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং পুনর্জ্জন্মজনক কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফলভোগ করলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হেতু অর্হৎ মুক্ত পুরুষ।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে কর্ম ত্রিবিধ। কর্মের মূল চেতনার মধ্যে নিহিত। জীব হত্যার উদ্দেশ্যে কেউ বনে ঘুরে পশু দৃষ্টিগোচর না হলেও, যখন কেউ জীব হত্যা করে না, তখন তার কর্ম দৈহিক না হলেও মানসিক। জীব হত্যার আদেশ প্রদানের পরে কোন কারণে যদি প্রত্যাহৃত হলে তা বাচিক পাপ কর্ম। অসৎ চিন্তা বা ইচ্ছা কাজে পরিণত না হলেও, তা মানসিক কর্ম। কায়িক ও বাচিক কর্মের মূলে যদি মানসিক কর্ম না থাকে তা হলে তাকে কর্ম বলে না এবং তার ফলও উৎপন্ন হয় না। ফলের দিক থেকে কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ১) অসৎকর্ম, ২) সৎকর্ম, ৩) অংশতঃ সৎ, অংশতঃ অসৎ কর্ম, ৪) যা সৎও নয়, অসৎও নয়। অসৎ কর্ম শুদ্ধি ও অশুদ্ধি

উভয়ের জনক। যে কর্ম সৎও নয়, অসৎও নয়, তা শুদ্ধিজনকও নয়, অশুদ্ধি জনকও নয়, তার দ্বারা কর্মের বিনাশ হয়।

দেবতা, মানুষ সকলেই যদি কর্মের অধীন হয়, এবং মানুষের কর্ম যদি তার পূর্বকৃত কর্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে স্বাধীন ইচ্ছার কোন স্থান দেখতে পাওয়া যায় না, ধর্মের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করার প্রয়োজনও থাকে না। মানুষকে তো তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে বাধ্য হয়ে কর্মের নিয়মানুযায়ী কর্ম করতে হয়। তাহলে মানুষ কর্ম করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় কি? কর্মের স্বাধীনতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে বুদ্ধ দর্শনে সুস্পষ্ট কিছু বলা নাই। কিন্তু বুদ্ধের উপদেশাবলী থেকে কর্মে মানুষের স্বাধীনতা আছে, এবং তা যে তিনি বিশ্বাস করতেন, তা বুঝতে পারা যায়। তিনি রাগ, দ্বেষ বর্জন করতে, অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন, অতএব কর্মে যে স্বাধীনতা আছে তা বুদ্ধের উপদেশগুলি থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্বন্ধ কি যান্ত্রিক নিয়মে নির্ধারিত? তাহার অন্যথা কি অসম্ভব? বর্তমান কি অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য ফল? বুদ্ধ বলেছেন[১] (অঙ্গুত্তর নিকায় ৩/৯৯) "কেউ যদি বলে যেমন কাজ করবে তার ফল সেরূপ হবে। তা হলে ধার্মিক জীবনের সম্ভাবনা থাকে না। এবং দুঃখের ঐকান্তিক নাশের কোন সুযোগও পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি কেউ বলে মানুষ যে পুরস্কার লাভ করে, তা তার কৃতকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত, তা হলে ধার্মিক জীবনের সম্ভব হয়, এবং দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশের সুযোগ পাওয়া যায়।" ধার্মিক নিয়মে কর্মফল উৎপন্ন হয়, এইভাবে কর্ম-নিয়মের ব্যাখ্যা ধর্ম ও চরিত্র-নীতির বিরোধী। বুদ্ধ সেভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

উপনিষদের কর্মবাদের সঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরোধ নাই, কেননা উপনিষদে মন ও মানসিক অবস্থা সকলকে নিয়ে স্বাধীন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত; বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব। সমুৎপাদিক জগতের কার্যকারণ নিয়ম দ্বারা তিনি বাহ্য ও অন্তর উভয় জগতকেই ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ তিনি যে সব উপদেশ দিয়েছেন, ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে, তারা অর্থহীন হয়ে পড়ে। বুদ্ধ মনের যে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সমুৎপাদভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না। সমুৎপাদগুলি কার্যকারণ শৃঙখলে আবদ্ধ। সেখানে স্বাধীনতার কোন স্থানই নাই। কিন্তু মানসিক সমুৎপাদগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করার জন্য এক আত্মার প্রয়োজন। আত্মাই মানসিক সমুৎপাদগুলির মধ্যে বর্তমান থেকে তাদের একাত্মবিধান করে এবং তাদের উর্দ্ধে থেকেও সমগ্র মন নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধ জীবাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বললেও তাঁর শিক্ষার মধ্যে মানুষের অন্তরে একত্ব বিধায়ক এক তত্ত্ব স্বীকৃত।

বিশ্বে স্থায়ী কিছুই নয়। মানব-জীবন পরিবর্তনের সমষ্টি। তাতে সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও একপ্রকার একত্ব ও তার অনুভূতি বর্তমান। মৃত্যু ও জন্ম ও পরিবর্তন-যুগযুগান্তকারী জীবন প্রবাহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এক জীবন যে সব কর্মের ফলভোগের জন্য উদ্দিষ্ট, সেই সব কর্মের ভোগ হলে মৃত্যু উপস্থিত হয়, এবং নতুন জন্মে নতুন সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সুযোগের ব্যবহার করে পাপ-পুণ্যের

বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণকে লাভ করবে, যদি নির্বাণ ভোগ করার জন্য বহু পরিবর্তনের মধ্যে উপস্থিত সুযোগের সংব্যবহার করার কেউ না থাকে।

আত্মা যে এক জন্মের পর জন্মান্তর গ্রহণ করে, একথা বৌদ্ধধর্মে বলে না। আত্মার অস্তিত্বই বুদ্ধ স্বীকার করেননি। মানুষের ভৌতিক দেহই তার মানসিক দেহের প্রতিষ্ঠা ভূমি। মৃত্যুতে যখন ভৌতিক দেহ তার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন তাতে প্রতিষ্ঠিত মানসিক জীবনেরও পরিসমাপ্তি হয়। তখন থাকে কি, যার পুনর্জন্ম হবে? যার মৃত্যু হল, তার পুনর্জীবন হয় না। যার জন্ম হল, সে ভিন্ন ব্যক্তি। যে মরে গেছে, তার চরিত্র থাকে এবং সেই চরিত্রই নতুন দেহে অধিষ্ঠিত হয়। সে চরিত্র দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু কিভাবে দুটি জীবনের মধ্যে এই সাতত্য, এই অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়, তার ব্যাখ্যা কোথাও নাই। এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পরপর সব জীবন কার্য কারণের নিয়ম মাধ্যমেই সংযোজিত, এটা বলা হয়েছে। মুমূর্ষুর শেষ চিন্তা হল সে এক সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে তার উপযোগী মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এই শেষ চিন্তাই মুমূর্ষের নৈতিক ও মানসিক জীবনের সার ভাগ, এবং মৃত্যু হলে, এটাই নূতন জীবনের আকাঙ্খারূপে থেকে যায়, কর্মের স্বকীয় শক্তি থেকে এই আকাঙ্খার উৎপত্তি হয়, এটাই উপাদান। এর শক্তিবশেই মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন জীবনের অংশগুলি নূতনভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। এই উপাদান ব্যতীত কর্মের কিছু করার সামর্থ্য নাই।

বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ বলেছেন—'মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, যখন বেদনা ও চিন্তাশক্তি হৃদয়ের মধ্যে অন্তিম দশায় উপনীত হয়, তখন কর্ম সংস্কার দ্বারা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রক্ষিত হয়। জীবিতকালে বহুবার অনুষ্ঠিত অভ্যস্ত গুরুতর কর্মের সংস্কার অথবা ঐ সব কর্মের প্রতিবিম্ব বা আরম্ভমান নূতন জীবনের প্রতিবিম্ব তখন উপস্থিত হয়। এটাই তখন বিজ্ঞানের বিষয় হয়। তখনও অবিদ্যা ও কামনার অস্তিত্ব থাকে বলে বিজ্ঞান তার বিষয়ের প্রতি লোলুপ হয়, এবং উপস্থিত কর্ম কর্তৃক তার দিকে ধাবিত হয়। বিজ্ঞান যখন তার আশ্রয়স্থান দেহ ত্যাগ করে, তখন তার অবলম্বন হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রভৃতি। তখন কর্ম সৃষ্ট অন্য দেহ গ্রহণ করতেও পারে; নাও পারে। পূর্ব বিজ্ঞানের তখন বিলোপ হয়, নূতন বিজ্ঞানের জন্ম হয়। এটাই পুর্নজন্ম। কিন্তু এই শেষোক্ত পূর্ববর্তী বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত নয়। পূর্ববর্তী জীবনে এর কারণ কর্ম অথবা সংস্কাররূপে বর্তমান ছিল। তা থেকেই এর উদ্ভব।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীত হয়, মৃত্যুর পরে পূর্বজন্মের কর্মই কেবল অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও বিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে এটাও বলা হয়েছে। নির্বাণে কর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই বিলোপ সাধন হয়, ব্যক্তিগত জীবনের তখন অবসান হয়। **(Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I pp. 444-45).**

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কম্মট্ঠান (সং কর্মস্থান)

কম্মট্ঠান হচ্ছে ভগবান বুদ্ধ-বর্ণিত ধ্যানের আলম্বন। চল্লিশ প্রকার শমথ-ধ্যানের আলম্বন আছে, প্রত্যেকটি আলম্বনকেই 'কম্মট্ঠান' বলা হয়। প্রত্যেকটি আলম্বনের মাধ্যমে সাধক স্বয়ং বুঝতে পারেন যে জগতের সমস্ত কিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল—সমস্ত কিছুই অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। বুদ্ধের মতে, চল্লিশটি কম্মট্ঠানের যে কোন

একটি অবলম্বন করেই নিষ্ঠাবান সাধক ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং বুদ্ধোপদিষ্ট আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারেন এবং অন্তিমে পরমসুখ নির্বাণ উপলব্ধি করতে পারেন। চল্লিশ প্রকার কম্মট্‌ঠান নিম্নরূপ : ১০ কৃৎস্ন, ১০ অশুভ, ১০ অনুস্মৃতি, ৪ ব্রহ্মবিহার, ৪ আরূপ্য, ১ সংজ্ঞা এবং ১ ব্যবস্থান।

১। ১০ প্রকার কৃৎস্ন, যথা, পৃথিবী কৃৎস্ন, অপ্, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, অবদাত, আলোক এবং আকাশকৃৎস্ন।

২। ১০ প্রকার অশুভ কৃৎস্ন যথা, উর্দ্ধস্ফীত মৃতদেহ, বিনীলক মৃতদেহ, পূযপূর্ণ মৃতদেহ, ছিদ্রকৃত মৃতদেহ, বিখাদিত মৃতদেহ, বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ, ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ, রক্তাক্ত মৃতদেহ, কীটপূর্ণ মৃতদেহ এবং অস্থি-পঞ্জর।

৩। ১০ প্রকার অনুস্মৃতি, যথা, বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, মরণানুস্মৃতি, কায়গতা স্মৃতি, আনাপান স্মৃতি এবং উপশমানুস্মৃতি।

৪। ৪ প্রকার ব্রহ্মবিহার, যথা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা।

৫। ৪ প্রকার আরূপ্য, যথা, আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন এবং নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।

৬। ১ প্রকার সংজ্ঞা, যথা, আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা।

৭। ১ প্রকার ব্যবস্থান, যথা, চতুর্ধাতুব্যবস্থান।

সুকোমল চৌধুরী

কম্ম-পচ্চয় (কর্ম-প্রত্যয়)

চিত্ত প্রয়োগ নামক ক্রিয়া বা চেতনা দ্বারা উপকারক (সাহায্যকারী) ধর্মই কর্ম-প্রত্যয়। কম্ম-পচ্চয় দু প্রকার - সহজাত ও নানাক্ষণিক। চেতেতীতি চেতনা। যা চিন্তা করায় তাই চেতনা। যখন চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করে আলম্বনে যোগ করে এবং তাদের কর্ম সিদ্ধির জন্য প্ররোচিত করে তখন সহজাত কর্ম প্রত্যয় হয়। লোভাদি হেতু সংক্ষেপে এই চেতনা 'কর্মে' পরিণত হয় এবং সংস্কাররূপে চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন থাকে। এবং অবকাশ পেলে বাক্-দ্বারে বা কায়-দ্বারে প্রকাশিত হয়। যখন এটা কুশলাকুশলে প্রবর্তিত হয়, তখন নানাক্ষণিক কর্ম-প্রত্যয় হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, চেতনা সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহ কর্ম-প্রত্যয় দ্বারা তৎ তৎ উৎপন্ন রূপ-সমূহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সহজাত প্রত্যয়ের প্রত্যয়ধর্ম হচ্ছে ৮৯ প্রকার চিত্তের ৮৯ প্রকার চেতনা এবং প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম হচ্ছে ৮৯ প্রকার চিত্ত। চিত্তজ রূপ ও প্রতিসন্ধিতে কর্মই রূপ। নানাক্ষণিক কর্মপ্রত্যয়ের প্রত্যয়ধর্ম হচ্ছে পূর্ব-পূর্ব জন্ম-পরম্পরাগত লোকীয় ৩৩ প্রকার কুশালাকুশল চেতনা। (অর্থাৎ লোকীয় ২৯ + লোকোত্তর ৪)।

জীবের মৃত্যুতে চেতনা থেমে গেলেও নানাক্ষণিক কর্ম-প্রত্যয়ের শক্তিসন্ততিতে ইহা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং যতদিন না জীবন নির্বাণলাভ করে ততদিন জন্মজন্মান্তরে ধাবিত হয়।

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কম্মপথ

কর্মের পদ্ধতি। কুশল ও অকুশলভেদে কম্মপথকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পালি সাহিত্যে এই কম্মপথ বা কর্মপদ্ধতিকে দশ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক[১]। এই দশ কম্মপথ পরিত্যাগ করা উচিত। প্রাণনাশ, চৌর্য ও পরদার গমন এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। অসৎবাক্য, কর্কশবাক্য, নিষ্ঠুরবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এই চারপ্রকার বাক্য বলা উচিত নয়। পর-সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হয়ে সর্বজীবে সৌহার্দ স্থাপন করে এবং কর্মের ফল আছে এইরূপ চিন্তা করে কাজ করা উচিত।

১। বিনয়পিটক, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮; সংযুক্ত-নিকায়, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৮; অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭, ২০৮

চিত্তরঞ্জন পাত্র

কম্মাসদম্ম (কম্মাসধম্ম)

প্রাচীন কুরুদের একটি সমৃদ্ধ নগরী। ভগবান বুদ্ধ বহুবার এখানে অবস্থান করেছিলেন। এখানেই তিনি ভারদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণের অগ্যাগারে (যজ্ঞশালায়) কিছুদিন ছিলেন। মাগন্দিয় সুত্ত (মজ্ঝিম, সুত্ত নং ৭৫) অনুসারে এখানেই বুদ্ধবিদ্বেষী পরিব্রাজক মাগন্দিয় বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে তাঁর কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। এই কম্মাসধম্মেই বুদ্ধ অনেক সুত্ত দেশনা করেছিলেন, তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—মহানিদানসুত্ত (দীঘ, সুত্ত নং ১৫), মহাসতিপট্ঠানসুত্ত (দীঘ, সুত্ত নং ২২) এবং আনঞ্জসপ্পায়সুত্ত (মজ্ঝিম, সুত্ত নং ১০৬)। সংযুক্তনিকায় এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ের কিছু কিছু সুত্তও এখানে উপদিষ্ট হয়েছিল। বুদ্ধঘোষের মতে কুরু জনপদের অধিবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত। তাই বুদ্ধ ঐ সকল মূল্যবান সুত্ত কম্মাসদম্মেই দেশনা করেছিলেন।

কম্মাসদম্ম এবং কম্মাসধম্ম দুই বানানই প্রচলিত এবং দুটিই অর্থবহ। কম্মাসপাদ নামক রাক্ষস এখানেই বোধিসত্ত্ব দ্বারা দমিত হয়েছিল বলে এই নগরীর নাম কম্মাসদম্ম। অন্যদিকে বলা হয়েছে যে কুরুদের একটি সাম্মানিক নীতি ছিল যার নাম কুরুবত্তধম্ম। রাক্ষস কম্মাসপাদকে এই ধম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলে এই নগরীর নাম কম্মাসধম্ম। অথবা কুরুদের প্রতিপাল্য ধর্মে কম্মাস=কল্মাষ (পাপ) উৎপন্ন হয়েছিল বলে এই নগরীর নাম কম্মাসধম্ম। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে "কম্মস্‌সদম্ম (=কর্মাশ্বদম্য)ই কুরুনিগমের যথার্থ নাম।"[১]

জাতকের মতে চূলকম্মাসদম্ম এবং মহাকম্মাসদম্ম নামে দুইটি স্থান আছে। মহাসুতসোমজাতকে (নং ৫৩৭) বর্ণিত রাক্ষস পোরিসাদ যেস্থানে দমিত হয়েছিল সেখানেই মহাকম্মাসদম্ম নগরীর পত্তন হয়েছিল। অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা জয়দ্দিস যেখানে রাক্ষসকে পরাজিত করেছিলেন সেস্থানের নাম হয়েছিল চূলকম্মাসদম্ম (জয়দ্দিস জাতক, নং ৫১৩)। দিব্যাবদানগ্রন্থে এই স্থানের নাম কল্মাসদম্য। ভিক্ষুণী নন্দুত্তরা এবং মিত্তাকালিকা এখানেই বসবাস করতেন।

১। মধ্যমনিকায়, ১ম (অনুবাদ), পৃঃ ৫৭, পাদটীকা ২

সুকোমল চৌধুরী

করুণা

বুদ্ধের ব্রহ্মবিহারের পরিকল্পনায় চারটি অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। এই চারটি ভাবনাকে ব্রহ্মবিহার ভাবনা বলার কারণ এ ভাবনা সাহায্যে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মবিহারী হওয়া যায়। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় করুণা। পরের দুঃখ অপনোদনের ইচ্ছার নাম করুণা। মমতাবোধ হতে করুণার উদ্রেক হয়। মমতা অর্থে মৈত্রীই দাঁড়ায়; কারণ যার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তাকে আপন জ্ঞান করি। দুঃখে যারা অভিভূত, তাদের নিরাশ্রয় ভাব দর্শন করুণা উৎপত্তির কারণ। পরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করুণার স্বভাব। করুণার দুটি দিক আছে — একটি হৃদয়বৃত্তি হিসাবে অনুকম্পাবোধ, অপরটি সেই বোধ হেতু যে দুর্দশাগ্রস্থ তার দুর্দশা মোচনের প্রবল আকুতি। এইভাবে এখানেও অনুভূতি ও কর্ম যুগপৎ জড়িত। সকল প্রাণী দুঃখমুক্ত হোক—এটাই হল করুণার মূল মন্ত্র। করুণার আলম্বন পরের দুঃখ। করুণা চিত্তকে প্রসারিত করে, আমিত্বহীন করে।

চিত্তরঞ্জন পাত্র

করেরিকুটিকা

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবনে চারিটি প্রধান কুটিকা (=ভবন) ছিল, তন্মধ্যে একটির নাম করেরিকুটিকা। ঐ ভবনের প্রবেশদ্বারে করেরিবৃক্ষের একটি মণ্ডপ ছিল বলে ঐ নাম। স্বয়ং অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের জন্য ঐ কুটিকা নির্মাণ করেছিলেন কয়েকটি স্তম্ভের উপর। এই করেরিকুটিকাতেই বুদ্ধ মহাপদান সুত্ত (দীঘনিকায়, সুত্ত নং ১৪) দেশনা করেছিলেন। জেতবনস্থ অন্য তিনটি কুটিকার নাম : কোসম্বকুটি, গন্ধকুটি এবং সললঘর।

সুকোমল চৌধুরী

করেরিমণ্ডলমালা

চতুর্দিকে খোলা কাঠের খুঁটির উপর তৃণাচ্ছাদনযুক্ত একটি মণ্ডপের নাম করেরিমণ্ডলমালা। করেরি কাঠের খুঁটি দ্বারা ঐ মণ্ডপ তৈরী হয়েছিল বলে উক্ত নাম। সম্ভবত: জেতবনের গন্ধকুটি, করেরিকুটিকা এবং উক্ত মণ্ডপ সমস্তই নিয়ে করেরিমণ্ডলমালা। "গন্ধকুটি পি করেরিকুটিকা পি সালাপি করেরিমণ্ডলমালা তি বুচ্চতি।" (সুমঙ্গল, ২য়, পৃঃ ৪০৭)

সুকোমল চৌধুরী

কলণ্ডুক জাতক (জাতক নং ১২৭)

বারাণসীর জনৈক শ্রেষ্ঠীর ভৃত্যের নাম ছিল কলণ্ডুক। সে পালিয়ে গিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একজন ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করে। শ্রেষ্ঠী কলণ্ডুকের সন্ধানে একটি তোতাপাখিকে পাঠায়। তোতাপাখি কলণ্ডুকের সন্ধান পেয়ে শ্রেষ্ঠীকে জানায়। শ্রেষ্ঠী তাকে ধরে নিয়ে এসে আবার দাসে পরিণত করে।

সুকোমল চৌধুরী

কলন্দক নিবাপ

ইহা রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থিত। এখানে কলন্দক বা কাঠবিড়ালীর জন্য নিত্য নিবাপ বা খাদ্যশস্য দেয়া হোত। একদিন জনৈক রাজা দলবল নিয়ে ঐস্থানে বনভোজন করতে এসেছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করায় রাজা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। রাজাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে তাঁর দলবল ঐ বনে ফল-পুষ্প আহরণের জন্য চারদিকে চলে গেল। মদের গন্ধ পেয়ে একটি বিষধর সাপ গাছ থেকে নেমে আসে। রাজাকে উক্ত সাপ দংশন করতে পারে ভেবে জনৈক বৃক্ষদেবতা কাঠবিড়ালীর রূপ ধরে এসে কিচির-মিচির শব্দ করে রাজাকে জাগিয়ে দিল। রাজা ঘুম থেকে উঠে অদূরে ঐ সাপ এবং কাঠবিড়ালীকে দেখতে পেয়ে সমস্ত ঘটনা বুঝতে পারলেন। কৃতজ্ঞতাবশে রাজা ঐদিন থেকে ঐ বেণুবনস্থ সমস্ত কাঠবিড়ালীর জন্য প্রাত্যহিক খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যরা প্রায়ই এই কলন্দকনিবাপে অবস্থান করতেন।

সুকোমল চৌধুরী

কল্হণ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কলহণ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর কবি সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। পালি কল্লাণ (সং-কল্যাণ) শব্দের অপভ্রংশ রূপ সম্ভবতঃ কলহণ। ভারতবর্ষের বহু কবি, সাহিত্যিক ও লেখকের কথা যেমন কেবলমাত্র তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য কর্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন—কল্হণের কথাও সেইরকম তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'র মধ্যেই সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের ভৌগোলিক পরিচয়, আর্থিক-অবস্থা ও অন্যান্য স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। খ্রীঃ ১১৪৮-১১৫০ এর মধ্যে কল্হণ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের প্রতি-পরিচ্ছেদের পুষ্পিকা এবং তাঁর উত্তরসূরী জোনরাজ সংযোজিত অংশের মুখবন্ধ থেকে আমরা কল্হণের নিম্নলিখিত পরিচয় পাই। কল্হণের পিতা ছিলেন কাশ্মীর রাজ হর্ষের (খৃঃ ১০৮৯—১১০১) খ্যাতনামা মন্ত্রী চম্পক। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল পরিহাসপুর। কলহণ ও তাঁর বংশ ছিল শৈবধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ক্ষুদ্র ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কলহণের বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থ থেকে।

[দ্রষ্টব্য : 1. Somnath Dhar. 'Poet-Historian of Kâsmir' The Indian Institute of Culture, Bangalore.
2. M. A. Stein. ed. Kalhana's Râjatarangini or Chronicle of the Kings of Kâshmir Vol-1, page 6-41.
3. R. C. Majumdar, ed. 'The Struggle for Empire']

ঐশ্বর্য বিশ্বাস

কলহবিবাদসুত্ত

ভগবান বুদ্ধ কপিলবস্তুর মহাবনে যে ছয়টি সুত্ত দেশনা করেছিলেন তার একটির নাম কলহবিবাদসুত্ত। এই সুত্তের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে প্রিয়বস্তু এবং তৃষ্ণা থেকেই

কলহ উৎপন্ন হয়। ইহাই সুত্তনিপাতের অট্ঠকবগ্গের একাদশতম সূত্র। স্বেচ্ছচরিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই এই সূত্র উপদিষ্ট হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, মহাপজাপতি গোতমী—এই সূত্রোপদেশ শুনেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন।

সুকোমল চৌধুরী

কলায়মুট্ঠি জাতক (জাতক নং ১৭৬)

বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজ পসেনদিকে এই জাতকের কাহিনী বলেছিলেন। একবার বর্ষাকালে কোশলরাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ দেখা দেয়। রাজার সৈন্যরা দু-তিনবার যুদ্ধ করেও বিদ্রোহ দমন করতে পারল না। তখন রাজা স্বয়ং বিদ্রোহদমনে বের হলেন। ঘোর বর্ষাকাল বলে রাজার মনেও সংশয় ছিল। তিনি বুদ্ধকে প্রণাম করে যাত্রা করবেন মনে করে জেতবন বিহারে প্রবেশ করে বুদ্ধকে প্রণিপাতপূর্বক তাঁর অভিযানের কথা বললেন। বুদ্ধ 'মহারাজ, আপনি অভিযান বন্ধ করুন, এখন ঘোর বর্ষাকাল'—একথা না বলে অতীতের কাহিনী রাজার নিকট ব্যক্ত করলেন। পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত একবার ঘোর বর্ষাকালে প্রত্যন্তপ্রদেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক উদ্যানে স্কন্ধাবার স্থাপন করলেন। রাজার অশ্বপালেরা তখন অশ্বদের জন্য কলায় সিদ্ধ করে দ্রোণির মধ্যে রাখছিল। ঐ উদ্যানে বহু বানর থাকত। একটি বানর গাছ থেকে নেমে দ্রোণি থেকে কলায় নিয়ে কিছু মুখে পুরল এবং হাতেও যতটা নেওয়া যায় নিয়ে লাফাতে লাফাতে গাছে উঠে কলায় খেতে আরম্ভ করল। হঠাৎ তার হাত থেকে একটি কলায় মাটিতে পড়ে গেল। তখন সেই মূর্খ বানর মুখের ও হাতের সমস্ত কলায় ফেলে দিয়ে গাছ থেকে নেমে ঐ কলায়টি খুঁজতে লাগল। খুঁজে না পেয়ে গাছে উঠে বিষণ্ণমনে বসে রইল যেন তার সহস্র মুদ্রা নষ্ট হয়েছে। রাজা সব দেখছিলেন এবং অমাত্যকে জিজ্ঞেস করলেন—'বয়স্য সব দেখলে ত। তোমার কি মনে হচ্ছে?' অমাত্য বললেন—'মহারাজ যারা মূর্খ তারাই অল্পের জন্য বহুকিছু নষ্ট করে ফেলে।' রাজা বুঝতে পারলেন যে ঘোর বর্ষায় অভিযান বন্ধ করার জন্যই পরোক্ষে অমাত্য ঐকথা বলছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন।

কোশলের প্রত্যন্তবাসী দস্যুরাও রাজা স্বয়ং তাদের দমন করতে আসছেন শুনে পালিয়ে গেল। রাজা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তাঁকে বন্দনা করে শ্রাবস্তীতে ফিরে গেলেন।

অতীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের বুদ্ধিমান অমাত্য ছিলেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব এবং রাজা ছিলেন আনন্দ।

সুকোমল চৌধুরী

কল্যাণধম্ম জাতক (জাতক নং ১৭১)

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীতে ধনী শ্রেষ্ঠী ছিলেন। একবার তিনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যান। ইতিমধ্যে তাঁর শাশুড়ী কন্যাকে দেখতে এলেন। শাশুড়ী কানে কম শুনতেন। তিনি এসে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন জামাতার সঙ্গে সে সুখে ঘরকন্না করতে পারছে কিনা। মেয়ে বলল যে তাঁর স্বামীর মত শীলবান ও সদাশয়সম্পন্ন

লোক সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দুর্লভ। শাশুড়ী এতকথার মধ্যে শুধু 'সন্ন্যাসী' কথাটাই শুনে ভাবলেন যে তাঁর জামাতা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। তিনি মহা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। শুনে চতুর্দিকে কান্নার রোল পড়ে গেল। সকলেই ভাবল যে শ্রেষ্ঠী বুঝি সত্যি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।

শ্রেষ্ঠী ফিরে এসে সব শুনে ভাবলেন তাঁর সম্বন্ধে 'সন্ন্যাসী' এই মঙ্গলজনক শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। এটা উপেক্ষণীয় নয়। তিনি আবার রাজার কাছে গিয়ে বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন এবং হিমালয়ে চলে গেলেন।

শ্রাবস্তীর জনৈক শ্রেষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ উক্ত জাতকের অবতারণা করেছিলেন। অতীতের শ্রেষ্ঠী এবং বুদ্ধের সময়কার শ্রেষ্ঠীর জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। সংস্কৃত 'জাতকমালা' গ্রন্থেও এই গল্পটি অবিকল সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে জাতকের নাম 'শ্রেষ্ঠি জাতক'।

সুকোমল চৌধুরী

কল্পনামণ্ডিতিকা, কল্পনালংকৃতিকা (সূত্রালংকার)

সূত্রালংকারেরই অন্য নাম কল্পনামণ্ডিতিকা বা কল্পনালংকৃতিকা। চৈনিক অনুবাদক কুমারজীবের (৪০৫ খৃঃ) মতে অশ্বঘোষ এর গ্রন্থকার। কিন্তু বস্তুতপক্ষে অশ্বঘোষেরই সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ কেউ এর রচয়িতা। H. Luders তুরফান[১] অঞ্চলে এর যে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ আবিষ্কার করেছেন তার শেষ পৃষ্ঠায় উক্ত শিরোনাম দেওয়া আছে। Entai Tomomatsu ফরাসী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[২]

জাতক এবং অবদানের পদ্ধতি অনুসরণ করে হিতোপদেশ মূলক কাহিনীসমূহের অবতারণা করা হয়েছে এই আলোচ্য গ্রন্থে। ভাষা গদ্য এবং পদ্য মিশ্রিত সংস্কৃত। জাতকের দীর্ঘায়ু কুমার এবং রাজা শিবির গল্পেরও পুনরাবৃত্তি আছে। বেশীর ভাগ কাহিনীর উদ্দেশ্য মহাযান ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করা। অনেক গল্প সর্বাস্তিবাদীদের পিটক থেকে নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায়নি।

১। মতান্তরে 'কুইজীল' (Qizil)

২। Journal Asiatigue, 1931, Oct - Dec.

পৃঃ ১৩৫-১৭৪; ২৪৫-৩৩৭

সুকোমল চৌধুরী

কল্যাণী(কল্যাণিকা)-বিহার

শ্রীলঙ্কায় শাস্তা যেখানে রাজা মণিঅকিখক এবং তাঁর অনুচরদের নিকট ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন সেখানে কল্যাণী-চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি সেই চৈত্য বৌদ্ধদের নিকট তীর্থস্থান। এই কল্যাণীচৈত্যের নিকটেই কল্যাণীবিহার। ধম্মগুত্ত, গোদত্ত স্থবির প্রভৃতি বিশিষ্ট ভিক্ষুগণ এবং ধম্মগুত্তের পাঁচশত সতীর্থ এই বিহারেই অবস্থান করতেন। এখানেই পিণ্ডপাতিয় স্থবির 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' (দীঘনিকায়, সুত্ত নং ১) আবৃত্তি করেছিলেন এবং তাঁর আবৃত্তির শেষে ভূমিকম্প হয়েছিল। উক্ত বিহারের সন্নিকটস্থ কালিদীঘবাপিগ্রামে ভিক্ষুরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহে যেতেন।

রাজা কনিট্‌ঠতিস্‌স এই বিহারে একটি উপোসথাগার নির্মাণ করেছিলেন। দমিলদের (তামিলদের?) আক্রমণে কল্যাণীবিহারের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। রাজা তৃতীয় বিজয়বাহু এই বিহারের সংস্কার করেন এবং কল্যাণী চৈত্যকে নতুন করে নির্মাণ করেন যার চূড়ায় কারুকার্যখচিত স্বর্ণালী লতাপাতা ছিল। পূর্বদিকের প্রবেশপথে তিনি একটি গম্বুজও নির্মাণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে রাজা অলগক্কোনার এই বিহারের বহু সংস্কারসাধন করেন। পঞ্চদশ শতকে এই বিহার শ্রীলঙ্কায় দর্শনীয় স্থান সমূহের অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এজন্য রামঞঞ নগর (=প্রাচীন ব্রহ্মদেশ) থেকে রাজা ধম্মচেতি কল্যাণীবিহারের সীমায় উপসম্পদা গ্রহণের জন্য বৌদ্ধ শ্রমণদের পাঠাতেন। কারণ রাজা ধম্মচেতি মনে করতেন যে কল্যাণীবিহারের সীমা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ। কল্যাণীবিহারে উপসম্পন্ন ভিক্ষুরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে পেগুনগরে কল্যাণী-সীমা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১]

১। মহাবংস, ৩২শ, ৫১;

মহাবংস ৩৬শ, ১৭, চূলবংস, ৮১তম, ৫৯;

পপঞ্চসূদনী, ১ম, ১০০; সুমঙ্গলবিলাসিনী, ১ম, ১৩১; মনোরথপূরণী, ১ম, ১৩।

সুকোমল চৌধুরী

কসিন (সং কৃৎস্ন)

কসিন অর্থে 'সমগ্র', 'সকল', 'সম্পূর্ণ' বুঝায়। বৌদ্ধ কর্মস্থান ভাবনায় ১০ প্রকার কৃৎস্নের কথা বলা হয়েছে। যেমন পৃথিবী কৃৎস্ন, অপ, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, অবদাত, আলোক এবং আকাশ কৃৎস্ন।

১। পৃথিবী কৃৎস্ন— কোন নির্জন স্থানে মাটীতে ষোল আঙুল ব্যাস বিশিষ্ট পূর্ণিমার চন্দ্রতুল্য পরিমণ্ডলাকার ও অতিশয় মসৃণ একটি মৃত্তিকাপিণ্ডকে পৃথিবী-কৃৎস্ন বলা হয়। তারপর কৃৎস্ন মণ্ডল থেকে আড়াই হাত দূরে ষোল আঙুল উচ্চ একটি চৌকীতে বসে কৃৎস্নমণ্ডলের দিকে মন নিবিষ্ট করতে হবে। এবং মনে মনে জপ করতে হবে 'পৃথিবী, পৃথিবী' অর্থাৎ 'মাটী মাটী'। কখন চোখ খোলা রেখে কখনও বা চোখ বন্ধ করে জপ করতে হবে। এতে মনের একাগ্রতা লাভ হয়। যোগী যখন এভাবে কিছু সময় অর্থাৎ কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস বা বৎসরকাল ধ্যানাভ্যাস করেন তবে চোখ বন্ধ করলেও মনে হবে যেন সেই কৃৎস্নমণ্ডল চোখের সামনেই অবিকল রয়েছে। তখন 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' লাভ হয়েছে বুঝতে হবে। তৎপর যোগী আর মণ্ডলের সামনে বসবেন না। নিজের বাসস্থানে প্রবেশ করে ভাবনা করবেন। যদি কোন কারণে নিমিত্ত চলে যায় আবার মণ্ডলের সামনে বসে নিমিত্ত গ্রহণ করবেন। পুনরায় বাসস্থানে গিয়ে মনশ্চক্ষে নিমিত্ত দেখতে দেখতে 'পৃথিবী পৃথিবী' বলে তৎপ্রতি চিত্ত সংযোগ করবেন। এভাবে 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত' উৎপন্ন হবে। এই উদ্‌গ্রহ নিমিত্তের উপর যোগীকে নিরন্তর ভাবনা করতে হবে যতদিন পর্যন্ত তা 'প্রতিভাগ নিমিত্তে' রূপান্তরিত না হয়। এই প্রতিভাগ নিমিত্ত হবে সকল প্রকার কৃৎস্নদোষবর্জিত। যখন যোগী নিয়মিত প্রতিভাগ নিমিত্তে মনঃসংযোগ করে ভাবনা করেন তখন সে ভাবনাকে 'উপচার সমাধি' বলা হয়। এই স্তরে পঞ্চনীবরণ (অর্থাৎ কাম, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-

কৌকৃত্য ও সংশয়) সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। অত:পর তিনি 'অর্পণা সমাধি' লাভ করেন।[১]

১। অর্পণা বিষয়ে আরও জানার জন্য দ্রষ্টব্য : বৌদ্ধ কোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩ (অপ্পনা)।

২। অপকৃৎস্ন

পাত্রস্থিত বর্ণহীন বৃষ্টির জল, পুকুর বা হ্রদ বা সমুদ্রের জল ইত্যাদি অপকৃৎস্ন। তার উপর দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ করে যতদিন পর্যন্ত 'অর্পণা' সমাধি লাভ না হয়, ততদিন 'অপ্ অপ্' বা 'জল, জল' জপ করে যোগী ভাবনা করবেন। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবী কৃৎস্ন' বৎ।

৩। তেজ কৃৎস্ন

পূর্ববৎ আড়াই হাত দূরে বসে মাদুর বা চামড়ার মধ্যস্থিত এক বিঘত চার আঙুল পরিধিযুক্ত ছিদ্রের মাধ্যমে প্রদীপ শিখার উপর মন নিবদ্ধ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যতদিন পর্যন্ত 'অর্পণা' সমাধি লাভ না হয় ততদিন 'তেজ, তেজ' রূপ মনে মনে জপ করতে হবে। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবী কৃৎস্ন' বৎ।

৪। বায়ু কৃৎস্ন

জানালার মধ্য দিয়ে বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে বায়ু প্রবেশ করে তার উপর মন নিবিষ্ট করে 'বায়ু, বায়ু' রূপে জপ করবেন। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবী কৃৎস্ন' বৎ।

৫-৮। বর্ণ কৃৎস্ন

(নীল, হলদে, লাল বা শ্বেত বর্ণের কৃৎস্ন)

পূর্ববৎ আড়াই হাত দূরে বসে এক বিঘত চার আঙুল মাপের নীল, হলদে, লাল বা শ্বেত কৃৎস্নের উপর মন নিবিষ্ট করে যে কৃৎস্ন সে রংয়ের নাম বার বার জপ করতে হবে (যেমন, নীল হলে 'নীল, নীল', হলদে হলে 'হলদে, হলদে' ইত্যাদি। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবীকৃৎস্ন' বৎ। নীল, হলদে, লাল বা সাদা কালোর উপর মন নিবিষ্ট করে ধ্যানাভ্যাস করা যায়।

৯। আলোক কৃৎস্ন

আলোক কৃৎস্ন নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস করতে হলে চন্দ্রালোক বা স্থির দীপালোক বা মাটিতে পতিত চক্র-আলোক বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রের মাধ্যমে পতিত সূর্য বা চন্দ্রালোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 'আলোক, আলোক' জপ করতে করতে ধ্যান করা যায়। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবী কৃৎস্ন' বৎ।

১০। আকাশ কৃৎস্ন

পূর্ববৎ আড়াই হাত দূরে বসে এক বিঘত চার আঙুল বিশিষ্ট এক খণ্ড মাদুর বা চামড়া বা দেওয়ালের ছিদ্রপথের উপর মন নিবদ্ধ করে মনে মনে 'আকাশ, আকাশ' জপ করতে হবে। অন্যান্য কিছু 'পৃথিবী কৃৎস্ন' বৎ।[১]

(১) প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বুদ্ধের যোগনীতি, পৃঃ ৩৫-৪৯; সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৬।

সুকোমল চৌধুরী

কসী-ভরদ্বাজ (সং কৃষি-ভরদ্বাজ)

তিনি ছিলেন ভারদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণ, থাকতেন দক্ষিণাগিরির একনালাতে। কৃষিই তাঁর জীবিকা ছিল বলে তাঁর ঐ নাম। একবার ধান্যরোপণের শুভ মুহূর্তে বুদ্ধ ঘুরতে ঘুরতে কৃষি-ভরদ্বাজের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন ভরদ্বাজ উৎসবে যোগদানকারী বিশাল জনগণের নিকট খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। বুদ্ধকে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভরদ্বাজ বললেন—'খেটে খাও, আমার মত লাঙ্গল চাষ কর, ক্ষেতে বীজ বপন কর।' বুদ্ধ বললেন যে তিনিও একজন কৃষক এবং তিনি কিভাবে কৃষিকাজ করেন তা বর্ণনা করলেন। শুনে, ভরদ্বাজ মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে পায়সায় দান করলেন। বুদ্ধ ঐ দান নিতে অস্বীকার করে বললেন যে তিনি তাঁর উপদেশের বিনিময়ে কোন ভাতা গ্রহণ করেন না। বুদ্ধের নির্দেশে ভরদ্বাজ ঐ ভিক্ষাপাত্রের পায়সান্ন নদীতে নিক্ষেপ করলেন। কারণ তথাগতকে প্রদত্ত ভিক্ষান্ন অন্য কেহ হজম করতে পারবে না। পায়সান্ন নদীতে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল টগবগ করে ফুটে উঠল এবং জল থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভরদ্বাজ বিস্মিত হয়ে বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে প্রার্থনা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে ভরদ্বাজ দীক্ষিত হয়ে বুদ্ধের সঙ্ঘে স্থান পেলেন এবং অচিরেই অর্হত্ত্ব লাভ করলেন।

সুকোমল চৌধুরী

কসী-ভরদ্বাজ সুত্ত (সং কৃষি ভরদ্বাজসূত্র)

ব্রাহ্মণ কৃষি ভরদ্বাজের কথা এই সুত্তেই পাওয়া যায়। এই ঘটনা সুত্তনিপাতের উরগবর্গের চতুর্থ সূত্রে এবং সংযুত্তনিকায়ের প্রথম খণ্ডে 'কসি সুত্তে' পাওয়া যায়। বুদ্ধের কৃষিকাজ কিভাবে হয় তা এই সুত্তে বর্ণিত হয়েছে। শ্রদ্ধা হচ্ছে তাঁর বীজ, প্রজ্ঞা হচ্ছে লাঙ্গল, স্মৃতি হচ্ছে লাঙ্গলের ফলা এবং বেত্রদণ্ড, বীর্য হচ্ছে বলীবর্দ্দ। বুদ্ধের কৃষিজাত ফসল হচ্ছে নির্বাণ বা দুঃখমুক্তিরূপ অমৃত।

সুকোমল চৌধুরী

কস্মীর (সং কাশ্মীর)

বর্তমান কাশ্মীর (উত্তর ভারত)। পালি সাহিত্যে গন্ধার রাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের নাম যুক্ত দেখা যায়। সম্ভবতঃ কাশ্মীর গন্ধার রাজ্যের একটি ভাগ ছিল। অশোকের সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির শেষে কাশ্মীর-গন্ধার অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য মজ্ঝন্তিক স্থবিরকে পাঠান হয়েছিল। মজ্ঝন্তিক নাগরাজ অরবাড়কে শান্ত করে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত করেন। নাগরাজ অরবাড় ছিলেন কাশ্মীর-গন্ধার অঞ্চলের অধিবাসীদের ত্রাসস্বরূপ। যক্ষ পণ্ডক, তদীয় পত্নী হারিতা এবং তাদের পাঁচশত পুত্র স্রোতাপন্ন হন। মজ্ঝন্তিক স্থবির "আসীবিসূপম" সুত্ত দেশনা করেন। ইহার ফলে আশী হাজার ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। এমন একদিন ছিল যখন কাশ্মীরে বৌদ্ধভিক্ষুর সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। শ্রীলংকায় অনুরাধপুরে যখন মহাথূপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, তখন স্থবির উত্তিয়ের নেতৃত্বে বিরাশি হাজার ভিক্ষু কাশ্মীর থেকে অনুরাধপুরে গিয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন ভারতে আসেন তখন সম্ভবতঃ কাশ্মীর স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এবং রাজা ছিলেন নাগের পূজারী এবং রানী ছিলেন বুদ্ধভক্ত। নিকটস্থ একটি স্তূপে বুদ্ধের দন্তধাতু সংরক্ষিত আছে বলে কিংবদন্তী আছে। পরে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন এই দন্তধাতু তাঁর রাজ্যে নিয়ে আসেন।

গ্রীকরাজ মিলিন্দের রাজধানী সাগল নগরী (বর্তমান শিয়ালকোট—পাকিস্তানে অবস্থিত) কাশ্মীর থেকে দ্বাদশ যোজন দূরে অবস্থিত।[১]

১। মহাবংস, ১২শ, ৩, ৯; ২৯তম, ৩৭;
দীপবংস, ৮ম, ৪; মিলিন্দ, পৃঃ ৮২-৮৩;

সুকোমল চৌধুরী

কস্‌সপ বুদ্ধ (সং কাশ্যপ বুদ্ধ)

কাশ্যপ বুদ্ধ বা কাশ্যপ দশবল চতুর্বিংশতিতম বুদ্ধ এবং এই ভদ্রকল্পের তৃতীয় বুদ্ধ, পালি দীঘনিকায়ে বর্ণিত সপ্ত বুদ্ধের মধ্যে একজন। বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে (অর্থাৎ বর্তমান সারনাথে) জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ব্রহ্মদত্ত এবং মাতার নাম ধনবতী। তিনি কাশ্যপগোত্রীয় ছিলেন। দুই হাজার বছর তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেছিলেন। তিনটি ঋতুর উপযোগী তাঁর তিনটি প্রাসাদ ছিল। তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন সুনন্দা যিনি পুত্র বিজিতসেনের জন্ম দিয়েছিলেন। গৃহত্যাগ করে তিনি মাত্র সাত দিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। বোধিলাভের পূর্বে তাঁর সহধর্মিনী তাঁকে পায়সান্ন দান করেছিলেন। সোম নামক জনৈক যবপালক তাঁর ধ্যানাসনের জন্য কিছু তৃণ দিয়েছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল অশ্বত্থ বৃক্ষ। যাঁরা তাঁর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিলেন এরকম কোটিসংখ্যক ভিক্ষুর নিকট তিনি ঋষিপত্তনে সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর ভিক্ষুশিষ্যগণের মধ্যে তিষ্য এবং ভারদ্বাজ ছিলেন প্রধান এবং ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অনুলা এবং উরুবেলা। তাঁর নিত্যসহায় ছিলেন সর্বমিত্র। তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুমঙ্গল এবং ঘটিকার, বিজিতসেনা এবং ভদ্রা। বিংশতিসহস্র বয়ঃকালে তিনি কাশীর সেতব্যা অঞ্চলে সেতব্য উদ্যানে দেহরক্ষা করেন।

কাশ্যপ বুদ্ধের নিকট যাঁরা অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন গবেষী এবং তাঁর পাঁচ শত সহচর।

ভগবান কাশ্যপের ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য মহাকপ্পিন সহস্র কক্ষ বিশিষ্ট একটি পরিবেণ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে বর্তমান গৌতম বুদ্ধ ছিলেন জ্যোতিপাল নামক ব্রাহ্মণমাণব। তিনি ঘটিকার ভিক্ষুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই ঘটিকারই মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করলে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁকে কাশ্যপ বুদ্ধের সময়কার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন।

কাশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাণসীর রাজা ছিলেন কৃকী।

সংস্কৃত দিব্যাবদানেও কাশ্যপ বুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সুকোমল চৌধুরী

কস্‌সপ থের

'গন্ধবংস' অনুসারে ইনি অনাগতবংস, মোহবিচ্ছেদনী, বিমতিচ্ছেদনী এবং বুদ্ধবংসের গ্রন্থকার। তবে এই 'বুদ্ধবংস' এবং খুদ্দকনিকায়ের 'বুদ্ধবংস' এক নয়। 'সাসনবংসদীপ' থেকে জানা যায় যে, চোল জনপদবাসী জনৈক কাশ্যপ বিমতিবিনোদনী রচনা করেছিলেন। পালি সাসনবংসের মতে বিমতিবিনোদনী হচ্ছে একটি বিনয়টীকা এবং গ্রন্থকার দমিল দেশের অধিবাসী।

সুকোমল চৌধুরী

কস্‌সপমন্দিয়জাতক (জাতক নং ৩১২)

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কোন গণ্ডগ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। তিনি মাতার শরীরকৃত্য সম্পাদনের দেড় মাস পরে গৃহস্থিত সমস্ত ধন দান করে নিঃশেষ করলেন এবং পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে চলে গেলেন। তাঁরা বল্কল পরিধান করতেন এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ও ফলমূলাদি আহার করে জীবন ধারণ করতেন। বর্ষাকালে তাঁরা লোকালয়ে চলে আসতেন। আবার বর্ষাশেষে হিমালয়ে চলে যেতেন। একবার তাঁরা বর্ষার শেষে হিমালয়ে ফিরছিলেন। বোধিসত্ত্ব পিতাকে বললেন: 'আপনি ভাইকে নিয়ে আস্তে আস্তে আসুন। আমি আগে গিয়ে কুটীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করি।'

পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা চলেছেন। পিতা বয়োবৃদ্ধ বলে তাড়াতাড়ি চলতে পারেন না। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র বলপূর্বক পিতাকে দ্রুত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। এতে পিতা ক্রুদ্ধ হন এবং ছেলেকে গালমন্দ করেন। এতে উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। আশ্রমে ফিরতেও যথেষ্ট বিলম্ব হয়। যা হোক তাঁরা আশ্রমে ফিরলে বোধিসত্ত্ব পিতার সেবাশুশ্রূষা করলেন এবং বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করাতে পিতাপুত্র পরস্পরকে দোষারোপ করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পিতাকে বললেন—'ছোট ছেলেরা মাটির পাত্রের মত, মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে যায় এবং একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া দেওয়া যায় না। তারা কোন উদ্ধত ব্যবহার করলে বয়োবৃদ্ধদের উচিত তা সহ্য করা।' বোধিসত্ত্বের উপদেশ শুনবার পর থেকে বৃদ্ধ পিতা ক্ষমাশীল হলেন।

শ্রাবস্তীর জনৈক সম্ভ্রান্ত যুবককে অবলম্বন করে এই জাতকের অবতারণা। ঐ যুবক বিষয়ভোগের অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে বুঝতে পেরে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং একাগ্রচিত্তে কর্মস্থান ভাবনা করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। কিয়ৎকাল পরে এই ব্যক্তির মাতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি তাঁর পিতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করালেন এবং তিন জনেই জেতবন বিহারে বাস করতে লাগলেন। তিনজনেই চীবরপ্রাপ্তির আশায় একদিন একটি গ্রামে গমন করলেন। ফিরে আসার সময় অনুরূপ ঘটনা ঘটে যা অতীতেও ঘটেছিল। যুবকের অনুরোধে বুদ্ধ অতীতের জাতক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

সুকোমল চৌধুরী

কস্‌সপসীহনাদ সুত্ত (সং কাশ্যপসিংহনাদ সূত্র)

পালি দীঘনিকায়ের অষ্টম সূত্র। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা শরীরকে নষ্ট করা বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে অচেলক কাশ্যপের কথোপকথন এখানে আছে। বুদ্ধের সময়ে আজীবকরা যে তপশ্চরণ করতেন তাও বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধের মতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের যোগ ও তপশ্চর্যা অপেক্ষা অর্হৎগণের শীলসম্পদা, চিত্তসম্পদা, প্রজ্ঞাসম্পদা, অনাস্রব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করা অনেক কঠিন। তিনি আরও বলেছেন যে আত্মনিগ্রহের দ্বারা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। আত্মনিগ্রহ ও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন মানুষের মনকে বিকৃত করে দেয়, অসুস্থ করে দেয়।

বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অচেলক কাশ্যপ বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

সুকোমল চৌধুরী

কাক

ইনি রাজা চণ্ড-প্রদ্যোতের দাস ছিলেন। অমনুষ্য (যক্ষ বা রাক্ষস) পিতার ঔরসে তাঁর জন্ম তাঁর গায়ে এত শক্তি ছিল যে তিনি দিনের বেলায় ষাট যোজন পথ যেতে পারতেন। যখন প্রদ্যোত জানতে পারলেন যে চিকিৎসক জীবক তাঁকে ঔষধ পান করিয়ে প্রাণভয়ে রাজার 'ভদ্রবতিকা' হাতীর পিঠে চড়ে দ্রুত পালিয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্রুতগামী কাককে পাঠালেন জীবককে ধরে আনতে এবং বলে দিলেন যেন জীবক-প্রদত্ত কোন কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে। কাক কৌশাম্বী পৌঁছে জীবককে পেলেন। জীবক তো ব্যাপার বুঝতে পেরেছেন। তিনি চাইলেন যাতে কাক দেরী করে রাজার কাছে ফিরে যান। তিনি কাককে কিছু খেতে অনুরোধ করলেন যেহেতু কাক পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। কাক তো জীবকের হাতে কিছুই খাবেন না। তখন জীবক তাঁকে অর্ধ-আমলকী খেতে দিলেন। কাক ভাবলেন—এই সামান্য আমলকী খেলে আর কিই বা ক্ষতি হবে। তিনি আমলকী খেলেন। কিন্তু জীবক তাঁকে আমলকী দেওয়ার সময় নোখের কোণায় লুকোনো একটা ওষুধ দিয়েছিলেন। কাক তো ঐ আমলকী খেয়ে পায়খানা করতে করতে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে গেলেন। জীবক বললেন যে তিনি চেয়েছেন যাতে কাক অতি বিলম্বে রাজার নিকট ফিরতে পারেন। জীবক রাজার ভদ্রবাতিকা হাতীকে কাকের হাতে দিয়ে নিজে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।[১]

১। বিনয়পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭-২৭৮;

ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৯৬।

সুকোমল চৌধুরী।

কাক-জাতক[১] (জাতক নং ১৪০)

বোধিসত্ত্ব একবার কাক হয়ে জন্মেছিলেন। তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। একদিন রাজার পুরোহিত নগরের বাইরে গিয়ে স্নান করে গায়ে গন্ধবিলেপন, মালা ধারণ, উৎকৃষ্ট ক্ষৌমবসন পরিধান করে নগরে প্রবেশ করলেন। তখন নগরদ্বার

তোরণে দুইটি কাক বসেছিল। একটি কাক পুরোহিতের মাথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করল। পুরোহিত সমস্ত কাকজাতির উপর রেগে গেলেন।

এই সময় এক দাসী গোলার ধান বের করে রৌদ্রে শুকোতে দিয়ে, পাহাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ তার ঘুম এসে গেল। এই সুযোগে এক দীর্ঘলোম ছাগ এসে ধান খেতে লাগল। দাসী জেগে উঠলে ছাগ পালিয়ে যায়। দাসী ঘুমিয়ে পড়লে ছাগ এসে ধান খায়। এভাবে তিনবার ধান খেলে দাসী রেগে গিয়ে একটা উল্কা জ্বালিয়ে ছাগের লেজে ধরিয়ে দিল। ছাগ লাফাতে লাফাতে একটা হাতীশালার নিকটে খড়ের গাদায় গড়াগড়ি দিল। এতে খড়ের গাদায় আগুন ধরে গেল। আগুনে হাতীশালা পুড়ে গেল। অনেক হাতী পুড়ে গেল। বৈদ্যরা এসে হাতীদের সুস্থ করতে পারলেন না। রাজাকে জানানো হল। রাজা ঐ পুরোহিতকে ডাকলেন। পুরোহিত বললেন—'মহারাজ, কাকের চর্বি জোগাড় করুন।' রাজার আদেশে বহু কাক মারা হ'ল, কিন্তু চর্বি পাওয়া গেল না।

বোধিসত্ত্ব (কাক) তখন আশি হাজার কাকপরিবৃত হয়ে মহাশ্মশানে বাস করতেন। তিনি ঐ ঘটনা শুনে পুরোহিতের মতলব বুঝতে পারলেন এবং রাজার কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, কাকের কোনদিন চর্বি হয় না। কাকের বংশ ধ্বংস করার জন্য পুরোহিত ঐ বিধান দিয়েছেন।'

রাজা বোধিসত্ত্ব কাকের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যের সকল প্রাণীকে অভয় দিলেন এবং নিত্যই কাকদের সেবার জন্য প্রচুর দানের ব্যবস্থা করলেন।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধ উক্ত জাতককাহিনী বর্ণনা করেছেন তা 'ভদ্দসাল জাতকে' আছে। তখনকার রাজা ছিলেন বর্তমানের আনন্দ এবং বুদ্ধ ছিলেন বোধিসত্ত্ব কাকরাজ।

সুকোমল চৌধুরী

কাক জাতক[২] (জাতক নং ১৪৬)

এক সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে সমুদ্র দেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। একবার এক কাক তার পত্নী সহ খাবারের খোঁজে সমুদ্রতীরে গেল। সে সময় কিছু লোক ক্ষীর, পায়স, মাছ, মাংস ও সুরা প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্রতীরে নাগপূজা করে চলে গেল। কাকদ্বয় প্রচুর খাদ্যভোজ্য দেখে যথেচ্ছ খেল এবং সুরাও পান করল। তারা মদমত্ত হয়ে গেল এবং সমুদ্রতীরে এসে স্নান করতে লাগল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে কাক-পত্নীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্রতলে একটা মাছ কাকটিকে খেয়ে ফেলল। পুরুষ কাক পত্নীর জন্য বিলাপ করে কাঁদতে লাগল। এই কান্না শুনে সমস্ত কাক সমুদ্রতীরে এসে 'কা কা' করতে লাগল। তারা ঠিক করল সমুদ্রকে জলশূন্য করে দেবে। যা ভাবা তাই কাজ। কিন্তু সকলে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেল। সমুদ্রের জল যা ছিল তাই রয়ে গেল। বহু কাক মূর্খতার জন্য মারা যাবে ভেবে বোধিসত্ত্ব সমুদ্রদেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করে তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। দেখে সব কাক পালিয়ে গেল। এতে বহু কাকের জীবনরক্ষা হল। নচেৎ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে সকলেই জলমগ্ন হত।

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে অনেক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই জাতককাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

সুকোমল চৌধুরী

কাক জাতক[১] (জাতক নং ৩৯৫)

বোধিসত্ত্ব একবার কবুতর হয়ে জন্মেছিলেন। বারাণসীর জনৈক ব্যবসায়ীর রান্নাঘরে একটি ঝুড়িতে বাস করতেন। এক কাকও তাঁর বিশ্বাসভাজন হয়ে সেখানে থাকত। কিন্তু কাকটি ছিল লোভী এবং চুরি করে খাদ্যদ্রব্য খেয়ে নিত। একদিন পাচক তাকে ধরে পালকগুলি ছিঁড়ে গায়ে ঝাল বাটনা মাখিয়ে দিল। তারপর একটা কড়ি ছেঁদা করে তার গলায় বেঁধে দিল। তারপর ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল।

বোধিসত্ত্ব কাকের এই অবস্থা দেখে অন্যত্র চলে গেলেন। কাকটি সেখানেই প্রাণত্যাগ করল।

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে একজন লোভী ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে এই জাতক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন।

এই জাতকের সঙ্গে কপোতজাতক এবং লোল জাতকের অনেকাংশে মিল দেখা যায়।

সুকোমল চৌধুরী

কাকবণ্ণ তিস্স

শ্রীলঙ্কার রোহণ বংশোদ্ভূত একজন রাজা। তিনি প্রসিদ্ধ রাজা দেবানংপিয় তিস্সের ভ্রাতা। মহানাগের প্রপৌত্র। তাঁর পিতার নাম গোঠাভয়। মহাগামে তাঁর রাজধানী ছিল। কল্যাণীর রাজা তিস্সের কন্যা দেবী (বা বিহারদেবী) ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। তাঁর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাঁদের দুই সন্তান হচ্ছেন দুট্‌ঠগামণি অভয় এবং সদ্ধাতিসস্‌। কাকবণ্ণ তিস্স খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যে চৌষট্টি বছরের রাজত্বে চৌষট্টিটি বৌদ্ধবিহার তৈরী করিয়েছিলেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে তিস্সমহারাম, চিত্তলপব্বতবিহার এবং মহানুগ্গল চৈত্য। মৃত্যুর পর তাঁকে তিস্সমহারামেই দাহ করা হয়।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাকবলিয়, কাকবল্লিয়

রাজা বিম্বিসারের পাঁচ জন মহাধনবান শ্রেষ্ঠীর মধ্যে একজন। অপর চার জন ছিলেন — জোতিয়, জটিল, মেন্ডক এবং পুন্নক[১]। তিনি প্রথম জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। একদিন তাঁকে অনুগৃহীত করার জন্য স্থবির মহাকাশ্যপ সাত দিন সমাধিতে থেকে পরের দিন কাকবলিয়ের দরজায় উপস্থিত হলেন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে। তাঁর স্ত্রী স্বামীর জন্য প্রস্তুত লবণ বিহীন যাগু স্থবির মহাকাশ্যপের ভিক্ষাপাত্রে প্রদান করলেন। স্থবির ঐ যাগু নিয়ে গিয়ে বুদ্ধের হাতে দিলেন। বুদ্ধ সংকল্প করলেন যাতে ঐ যাগুর দ্বারা বিশাল ভিক্ষুসংঘের সকল ভিক্ষুরই আহারকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে। এই পুণ্যের ফলে কাকবলিয় সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠীপদে বৃত হন।[২] দান করে ইহজন্মেই যে তার বিরাট ফল পাওয়া যায় কাকবলিয়ের স্ত্রীর দানই তাঁর প্রমাণ। সামান্য দানের দ্বারাও মহাফল পাওয়া গেছে কারণ ঐ দান চতুষ্কোটি পরিশুদ্ধ — (ধর্ম উপায়ে দানীয় বস্তুর সংগ্রহ, মহৎচেতনা, গুণবান গ্রহীতা এবং শীলবান দাতা)।[৩]

১। ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম, পৃঃ ৩৮৫
সুমঙ্গলবিলাসিনী ১ম, পৃঃ ২২০
২। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২য়, পৃঃ ৪০৩
৩। অত্থসালিনী পৃঃ ১৬১-১৬২

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাকাতী জাতক (কাকবতী) জাতক নং ৩২৭

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীর রাজা হয়েছিলেন। তাঁর প্রধানা ভার্যার নাম ছিল কাকাতী। সুপর্ণরাজ মানুষের ছদ্মবেশে এসে রাজার সঙ্গে পাশা খেলতেন। কাকাতীর প্রেমে আসক্ত হয়ে সুপর্ণরাজ রাজার অগোচরে তাঁকে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে সহবাস করতে লাগলেন, এদিকে রাজা রাণীকে দেখতে না পেয়ে গন্ধর্ব নটকুবেরকে পাঠালেন রাণীর খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে নটকুবের একদিন সুপর্ণরাজকে এক সরোবরের তীরে দেখতে পেল। তারপর সুপর্ণরাজের পালকের উপর বসে সুপর্ণভবনে গমন করল। সেখানে সে কাকাতীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করে আবার সুপর্ণরাজের পালকের উপর বসে নরলোকে ফিরে এল।

একদিন রাজা যখন সুপর্ণরাজের সঙ্গে পাশা খেলছিলেন তখন নটকুবের গানের মাধ্যমে জানাল কাকাতীর সঙ্গে তাঁর আমোদ-প্রমোদের কথা, সমস্ত ঘটনার কথা বুঝতে পেরে সুপর্ণরাজ কাকাতীকে রাজার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন এবং আর কোনদিন বারাণসীতে আসেন নি।

শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই জাতককথা বলেছিলেন। জাতকের সারমর্ম হচ্ছে এই যে রমণীজাতি অরক্ষণীয়া। সুপর্ণরাজ কাকাতীকে মহাসমুদ্রের মধ্যে শাল্মলীদ্রুমস্থ দেবভবনে রেখেও রক্ষা করতে পারেন নি।

বি. দ্র. ঃ কাকাতী জাতকের সঙ্গে সুস্সোন্দী জাতকের (জাতক নং ৩৬০) বহু সাদৃশ্য আছে। কুণালজাতকের (জাতক নং ৫৩৬) সঙ্গেও মিল আছে।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাঞ্চীপুর

দক্ষিণ ভারতের করমণ্ডল উপত্যকায় অবস্থিত একটি নগরী যা পল্লবদের রাজধানী ছিল। কাঞ্চীপুর দক্ষিণ ভারতের সাতটি প্রধান নগরীর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান নাম কাঞ্চীবরম। অতীতে বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ভারতে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ এখানে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) রাজনৈতিক উপদ্রবের কারণে তিনশত ভিক্ষু কাঞ্চীপুরে চলে এসেছিলেন। কাঞ্চীপুর প্রসিদ্ধ পালি অর্থকথাকার ধর্মপালের জন্মস্থান। অভিধম্মত্থসংগহের রচয়িতা অনুরুদ্ধও কাঞ্চীপুরের লোক বলে প্রসিদ্ধি আছে।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাতিয়ান থের

কাতিয়ান থের ছিলেন শ্রাবস্তীর কোসিয় গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণের সন্তান। মাতৃকুলের দিকে তাঁকে কাতিয়ান বলা হোত। যখন তাঁর বন্ধু সামঞ্‌ঞকানি ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করেন, তিনিও তাঁকে অনুসরণ করেন এবং ধ্যানে আত্মনিয়োগ করেন। খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি ঘুমোতেন। একরাত্রে তিনি চংক্রমণ করতে করতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চত্বরে পড়ে গেলেন। বুদ্ধ দেখতে পেয়ে তাঁকে উঠালেন এবং বললেন যেন তিনি তাঁর প্রয়াস চালিয়ে যান এবং সাফল্য আসবেই। এভাবে বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে কাতিয়ান অল্পদিনের মধ্যেই অর্হৎ হয়ে গেলেন। বুদ্ধের এই উপদেশ থেরগাথায় প্রদত্ত হয়েছে[১]। থেরগাথা অট্‌ঠকথা থেকে জানা যায় যে কাতিয়ান প্রথম জীবনে পরিব্রাজক ছিলেন।

১। থেরগাথা, শ্লোক ৪১১-৪১৬

২। থেরগাথা অট্‌ঠকথা ১ম পৃ: ৯৯-১০০

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাম জাতক (জাতক নং ৪৬৭)

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের দুই পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা না হয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে চলে যান। প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা তাঁকে চিনতে পারলেন এবং রাজার বিনিময়ে তাঁকে রাজকর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি রাজার অর্থাৎ অনুজের অনুমতি নিয়ে রাজকর নিতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁর লোভ বেড়ে গেল এবং ছোট ভাইয়ের কাছে রাজ্য দাবী করলেন। ছোট ভাই তাঁর কাছে সানন্দে রাজ্য সঁপে দিয়ে প্রব্রজিত হলেন। কিন্তু বড় ভাইয়ের লোভ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। দেবরাজ শক্র তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্য যুবকের ছদ্মবেশে এসে বললেন যে তিনি তাঁকে তিনটি নগরী পাইয়ে দিতে পারেন। রাজা রাজী হলেন। কিন্তু তারপর শক্র অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লোভ সংবরণ না করতে পেরে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোধিসত্ত্ব তক্ষশীলা থেকে ফিরে এসে বললেন যে তিনি রাজার চিকিৎসা করতে পারবেন। কামনা বাসনা যে নিতান্তই তুচ্ছ এবং কামনার যে শেষ নেই একথা রাজাকে বুঝিয়ে তিনি তাঁকে সুস্থ করলেন। এরপর থেকে তিনি ধর্মপথে রাজত্ব করেছিলেন।

জনৈক ব্রাহ্মণকে 'কামসুত্ত' দেশনা করার সময় বুদ্ধ এই জাতক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কামনীত জাতকও দেশিত হয়েছিল।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামসুত্ত

সুত্তনিপাতের অট্‌ঠকবগ্গের ইহা প্রথম সূত্র। জনৈক ব্রাহ্মণ অচিরবতী নদীর তীরে গাছ কেটে কেটে শষ্য ক্ষেত্র তৈরী করছিলেন। এসময় বুদ্ধ তাঁকে কিছু ধর্মদেশনা করেছিলেন। পরবর্তীকালেও তিনি ব্রাহ্মণকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা বশতঃ ব্রাহ্মণ স্থির করলেন যে যেদিন ফসল কেটে ঘরে তোলা হবে সেদিন তিনি

বুদ্ধকে খাওয়াবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ফসল কাটার আগের দিন প্রবল বর্ষায় তাঁর সমস্ত ফসল ভেসে গেল। বুদ্ধ জানতেন যে এরূপ হবে। পরের দিন তিনি ব্রাহ্মণের কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। এই সময়েই বুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট কামসুত্ত দেশনা করেছিলেন। দেশনাবসানে ব্রাহ্মণ স্রোতাপন্ন হয়ে গেলেন। কামনীত জাতকে তাঁকে কামনীত ব্রাহ্মণ বলা হয়েছে।[১]

১। সুত্তনিপাত, শ্লোক ৭৬৬-৭৭১

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামতণ্হা (সং কামতৃষ্ণা)

কাম্যবস্তুকে লাভ করার যে তৃষ্ণা, কাম্যব্যক্তিকে লাভ করার যে তৃষ্ণা তাই কামতৃষ্ণা। মানুষ মনোমুগ্ধকর, সুখপ্রদ এবং আনন্দজনক অবস্থা প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হয়। এটাই কামতৃষ্ণা। মানুষ মনের মত বস্তু বা বিষয় প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী হয়—এটাই কামতৃষ্ণা। মানুষ মনোমত ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করতে লালায়িত হয়—এটাই কামতৃষ্ণা। ভগবান বুদ্ধ তিন প্রকার তৃষ্ণার কথা বলেছেন যা মানুষের দুঃখের মূলীভূত কারণ। কামতৃষ্ণা এগুলির মধ্যে অন্যতম।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামনীত জাতক (জাতক নং ২২৮)

কামজাতক শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। কামনীত জাতক এবং কামজাতকের বিষয়বস্তু মূলতঃ একই তফাৎ হচ্ছে এই কামজাতকে বড় ভাই রাজ্য ছেড়ে প্রত্যন্তগ্রামে চলে গিয়েছিলেন, ছোটভাই রাজা হয়েছিলেন। আর কামনীত জাতকে বড় ভাই রাজা হয়েছিলেন।

আর যে তিনটি রাজ্য দেবরাজ শক্র রাজাকে পাইয়ে দেবে বলেছিলেন সেই তিনটির নাম কামজাতকে নেই কিন্তু কামনীত জাতকে আছে। সেগুলি হল—উত্তর পাঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কেকক। আর কামনীত জাতকে বোধিসত্ত্ব নিজেই শক্র যিনি রাজাকে রোগমুক্ত করেন। কামজাতকে বোধিসত্ত্ব এবং শক্র দুজন পৃথক ব্যক্তি।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামবিলাপ জাতক (জাতক নং ২৯৭)

শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে এই জাতককথা বর্ণনা করেছিলেন। ঐ ভিক্ষু পূর্বপত্নীর বিরহে মুহ্যমান। বুদ্ধ বললেন যে ঐ রমণী অনর্থকারিণী। একজন্মে ঐ রমণীর জন্যই তাকে শূলে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই জন্মে সে আবার তাকে পাবার জন্যই উৎকণ্ঠিত।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আকাশ দেবতা হয়েছিলেন। একবার বারাণসীতে কার্তিক উৎসব উপলক্ষ্যে মহাসমারোহ হয়েছিল। সমগ্র অধিবাসী আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়েছিল। এক দুঃস্থ ব্যক্তির মাত্র দু খানা কাপড় ছিল। সে ঐ দু খানা কাপড় সুন্দরভাবে ধুইয়ে ইস্তিরি করে আনল। কিন্তু তাঁর ভার্যা ঐ কাপড়

পড়বে না। তার ইচ্ছা কুসুমফুলে (Safflower) রং করে একখানা কাপড় অন্তর্বাস এবং একখানা বর্হিবাস করে পড়বে। তার স্বামী বললো যে তারা গরীব কুসুমফুল কোথায় পাবে? কুসুমফুল আছে কেবল রাজোদ্যানে যে উদ্যান সবসময় বলবান প্রহরী দ্বারা পরিবৃত থাকে।

কিন্তু পত্নী কিছুতেই মানবে না। অগত্যা স্বামী রাতের অন্ধকারে রাজোদ্যানে গেল কুসুমফুল আনতে। কিন্তু প্রহরীদের হাতে সে ধরা পড়ে গেল। রাজবিচারে তাকে শূলে চড়ান হল। শূলের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে করতেও সে স্ত্রীর জন্য বিলাপ করতে করতে মৃত্যুবরণ করল।

বিঃ দ্রঃ এই জাতকের অতীত ঘটনা পুপ্ফরত্তজাতক (জাতক নং ১৪৭ সদৃশ)।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামাবচর চিত্ত

চিত্ত চারিপ্রকার—কামাবচর, রূপাবচার, অরূপাবচার এবং লোকোত্তর। কামলোক বিষয়ক চিত্তকেই কামাবচর (=কামচর) চিত্ত বলা হয়। অধোভাগে অবীচি নরক হতে সুরু করে উর্দ্ধভাগে পরনির্মিতবশবর্তী স্বর্গ পর্যন্ত স্থানকে কামলোক বলে।[১] স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—সমস্তই কামলোক সংক্রান্ত। রূপ শব্দালঙ্কার অবলম্বনে উৎপন্ন কামতৃষ্ণাসংশ্লিষ্ট চিত্তই কামাবচর চিত্ত। কামাবচর চিত্তের সংখ্যা চুয়ান্ন (৫৪)। কামাবচর চিত্তগুলি সহেতুক ও অহেতুক—দুই পর্যায়ভুক্ত। সে সমস্ত চিত্তোৎপত্তির মূলে লোভ, দ্বেষ, মোহ অকুশলপক্ষে এবং অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ কুশলপক্ষে হেতু হয়, তাদের বলা হয় সহেতুক চিত্ত। যে সমস্ত চিত্তোৎপত্তিতে লোভ দ্বেষাদি বা অলোভ অদ্বেষাদি কোনও কুশল বা অকুশল হেতু অবিদ্যমান, সেইগুলি অহেতুক চিত্ত নামে কথিত হয়। অকুশলপক্ষে লোভমূলক চিত্ত সংখ্যায় আটটি, দ্বেষমূলক চিত্ত সংখ্যায় দুইটি এবং মোহমূলক চিত্ত সংখ্যায় দুইটি। কুশলপক্ষে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ-মূলক চিত্ত সংখ্যায় চব্বিশটি (৮ কামাবচর কুশল, ৮ কামাবচর বিপাক এবং ৮ কামাবচর ক্রিয়াচিত্ত)। অহেতুক চিত্ত সংখ্যায় আঠারটি (৭ অকুশল বিপাক অহেতুক চিত্ত, ৮ কুশল বিপাক অহেতুক চিত্ত এবং ৩টি অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত)। সর্বসাকুল্যে কামাবচর চিত্তের সংখ্যা চুয়ান্ন (অকুশল ১২ + শোভন চিত্ত ২৪ + অহেতুক চিত্ত ১৮)

১। কামলোক — ১১ প্রকার লোকীয় সচেতন জীবস্তর, যথা, নরক, অসুর, প্রেত, পশু বা তির্যকভূমি, মনুষ্যভূমি ও ছয় প্রকার দেবভূমি (চতুমহারাজিক দেব, তাবতিংস দেব, যামদেব, তুসিতদেব, নিম্মানরতি দেব এবং পরনিম্মিতবসবত্তী দেব)

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কামেসু মিচ্ছাচার (সং কামেষু মিথ্যাচার)

কামবিষয়ে মিথ্যাচার, নীতিবহির্ভূত কামাচার, ব্যভিচার, পরস্ত্রীগমন, নাবালিকার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও নারীর সহিত পাশবিক আচরণ করা, একান্ত

আপন রক্তসম্পর্ক যুক্ত কোনও নারীর সহিত ব্যভিচার করা, এমনকি পশুর সহিত কামাচার করা—সমস্তই ইহার অন্তর্গত, ভগবান বুদ্ধ যে পঞ্চশীলের বিধান দিয়েছেন তার মধ্যে কামেসু-মিচ্ছাচার তৃতীয় শীলের অন্তর্গত।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কাম্বোডিয়া

কম্বোজ (কম্বুজ) বা কাম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি বৌদ্ধরাষ্ট্র। এটি থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং পরবর্তীকালের কোচিন চায়নার একটি অংশবিশেষ। অন্যদিকে মেকং নদীর উপত্যকাঞ্চলে পশ্চিমদিকে কাম্পোত নামক স্থানের তিনটি প্রদেশ ও স্যাভয় রিং এবং থোবং খুমুম নামক স্থান পূর্বে অবস্থিত। মেকং নদীর শাখাপ্রশাখাসহ বিস্তর জলাভূমি, খাল সারা রাজ্য জুড়ে রয়েছে। এস্থানে পূর্বে খেমরিজের রাজত্ব ছিল। ভারতের মুণ্ডাজাতির সঙ্গে খেমারদের সাদৃশ্য ছিল বলে ধরা হয়, অন্যদিকে মালয় ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষার দিক দিয়ে এখানকার ভাষার সঙ্গে নিম্নব্রহ্মের মন ও তেলংদের ভাষার এবং আসামের খাসিয়াদের ভাষার মিল আছে। (স্যার চার্লস এলিয়ট সাহেবের গ্রন্থ 'হিন্দুইজম্ এ্যান্ড বুদ্ধিজম্', ৩য় খণ্ড পৃঃ ১০০) স্থানটি স্রোক কামপুচিয়া বা স্রোক্ খেমার (Khmer) নামেও পরিচিত। কম্বুজ নামটির উৎপত্তিস্থল হিসেবে মালয় উপদ্বীপকে ধরা হয়, পুনরায় দেশীয় ঐতিহ্যানুসারে এটির ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল বলে ধরা হয় এবং ভারতের কম্বু স্বয়ম্ভুব এবং মেরা বা পেরার (শিব যাকে স্ত্রী হিসেবে কম্বুকে দিয়েছিলেন) বংশধর বলে কম্বুজের বাসিন্দাদের বলা হয়ে থাকে। (দ্রঃ চংক্রন এর বাক্‌সে লিপি, জারনাল এশিয়াটিক, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯০৯ পৃঃ ৪৬৮-৬৯, ৪৯৭)

উপাখ্যান অনুযায়ী কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ায় ফুনান নামে হিন্দুরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে মেকং নদীর নিম্ন উপত্যকায়। তৃতীয় শতাব্দীর চীনা বিবরণগুলিতে ফুনানের রাজবংশের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কথিত আছে, কৌণ্ডিণ্য নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ থেকে কম্বুজে এসে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে কোন কোন স্থানে বলা আছে যে কৌণ্ডিণ্য মালয় উপদ্বীপ বা মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকেই এস্থানে এসেছিলেন। ফুনানের স্থানীয় অধিবাসীরা অর্ধসভ্য ছিলেন এবং কৌণ্ডিণ্যই সর্বপ্রথম সেখানে সভ্যতার আলো দেখান। এ প্রসঙ্গে ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে মহীশূরের একটি লেখতে (সম্ভবত: দ্বিতীয় শতাব্দীর) কৌণ্ডিণ্য গোত্রের ব্রাহ্মণদিগের উল্লেখ রয়েছে। যাই হোক, কৌণ্ডিণ্যর পরবর্তী ফুনান রাজবংশের দুজন রাজা যথা, কৌণ্ডিণ্য জয়বর্মণ (৪৭৮-৫১৪ অব্দ) ও রুদ্রবর্মণ (৫১৪-৫৩৯ অব্দ) বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐতিহাসিক হল বর্ণনা করেছেন যে ৪৮৪ অব্দে কৌণ্ডিণ্য জয়বর্মণ এক চীনা শাসকের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করবার উদ্দেশ্যে নাগসেন নামক এক ভিক্ষুর নেতৃত্বে চীনদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। চীনা লিয়াং বর্ষপঞ্জীতে উল্লেখ আছে যে ৫০৩ অব্দে কৌণ্ডিণ্য চীনা সম্রাট ইউ-তির কাছে একটি প্রবালের বুদ্ধমূর্তি ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। চীনা সম্রাট ইউ-তি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়। ফুনান থেকে সংঘপাল ও মন্ত্রসেন নামে দুজন বৌদ্ধভিক্ষু

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনা রাজদরবারে অবস্থান করে দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে চীনা বৌদ্ধগ্রন্থগুলির অনুবাদ করেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাটি কম্বোডিয়ার বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করছে বলা যায়।

পরবর্তী কাম্বোডিয়ার রাজা রুদ্রবর্মণের সময়কালেও চীনা সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। চীনা বর্ষপঞ্জীগুলিতে বর্ণিত রয়েছে যে রুদ্রবর্মণ একটি চন্দনকাঠের নির্মিত বুদ্ধমূর্তি চীনা সম্রাটের কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। পুনরায়, ৫৩৯ অব্দে বুদ্ধের একটি কেশধাতুও চীনা সম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। দক্ষিণ কাম্বোডিয়ার বত্তিপ্রদেশে 'তা প্রোন' নামের স্থানে প্রাপ্ত একখানি সংস্কৃত লেখর উল্লেখ করা যায় যাতে রাজা জয়বর্মণ ও রুদ্রবর্মণ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। উক্ত লেখটিতে সর্বাগ্রে বুদ্ধকে আহ্বান করা হয়েছে এবং পরবর্তী পংক্তিতে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বর্ণনা আছে। এছাড়া, দক্ষিণ কম্বোডিয়ার 'প্রেই বৌ' প্রদেশে টৌল প্রে বা প্রথাটেও একখানি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিটির তলদেশে একখানি পালি লেখ আছে যথা—'যে ধম্মা হেতুপ্পভবা' .... ইত্যাদি যেটি বিনয়পিটক থেকে উদ্ধৃত। পালি লেখটি সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে কাম্বোডিয়ার ফুনানে হীনযান বা রক্ষণশীল বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল।

গুপ্তযুগের শিল্পকলার নিদর্শনও ফুনানে পাওয়া গেছে। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে ফুনানের (পো-নাম) অধিবাসীগণ প্রথমে হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনা করতেন কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম সেখানে প্রসারলাভ করলে জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সেখানকার একজন অত্যাচারী রাজা বৌদ্ধগণকে উৎপীড়ন করে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। ইৎসিং-এর ভ্রমণকালে তিনি সেইসময় সেখানকার বৌদ্ধসংঘে কোন ভিক্ষু দেখেন নি। বস্তুতঃ সপ্তম শতাব্দীতে যখন চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং এসেছিলেন সেখানে বৌদ্ধধর্মের উৎখাত ঘটে শৈবধর্মই প্রাধান্য লাভ করে।

পুনরায় নবম শতাব্দীতে যশোবর্মণ কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের নিমিত্ত 'সৌগতাশ্রম' তৈরী করে দিয়ে এবং বিহারে বসবাসকারীদের যথার্থ পথনির্দেশনার জন্য কতকগুলি বিস্তৃত নিয়মের প্রচলন করেন। (ড: অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বুদ্ধিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া এ্যান্ড এব্রড পৃ: ২০৮-৯) এরপর পঞ্চম জয়বর্মণের রাজত্বকালে (৯৬৮-১০০১ অব্দ) কাম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রসারতা লাভ করে। কেবলমাত্র রাজাই নয় কীর্তিপণ্ডিত নামে রাজার এক মন্ত্রী বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এতে ধর্মের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়। রাজা স্বয়ং বৌদ্ধ ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং কীর্তিপণ্ডিত তাঁর সময়েই বিদেশ থেকে বহু বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থ কাম্বোডিয়ায় নিয়ে আসেন। একাদশ শতাব্দীতে প্রথম সূর্যবর্মণ কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সূর্যবর্মণ একনিষ্ঠ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। কাম্বোডিয়ার একটা লিপিতে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে 'নির্বাণপাদ' নাম সহযোগে। তিনি স্থবিরবাদ ও মহাযান-উভয় সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ও যশোবর্মণের প্রতিষ্ঠিত সৌগতাশ্রমেও বহুপ্রকার দানধ্যান করতেন। তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতা কাম্বোডিয়ার ধর্মীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

পরবর্তীরাজা সপ্তম জয়বর্মণ (১১৮১-১২১৮ অব্দ)-এর রাজত্বকাল কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে। তিনি একনিষ্ঠ বৌদ্ধরাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও প্রসারতার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সময়কালের লিপিগুলি থেকে জানা যায় যে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ মহাযানধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুক্ত হস্তে দান করতেন। তাঁকে কাম্বোডিয়ার সুবিখ্যাত দুখানি স্থাপত্য 'আংকর থোম' ও 'বেয়ণের' প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে।

কাম্বোডিয়ায় ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত ছিল। পরে সেখানে শৈবধর্ম ও মহাযানের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কাম্বোডিয়ায় শ্যামদেশের ধর্মীয় প্রভাবে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ সম্প্রদায় সুদৃঢ় স্থান গ্রহণ করেছে যেটি দুটি শাখায় বিভক্ত যথা—মহানিকায় ও ধম্মযুক্তিক। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মহানিকায়' অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও বহুল প্রচারিত এবং দুটির মধ্যে কেবলমাত্র পালি ভাষা উচ্চারণের ও ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিনয়নিয়মের পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উভয় শাখাই শ্যামদেশীয় 'মংগলত্থদীপনী'-ও শ্যামদেশীয় অন্যান্য পালি গ্রন্থগুলিকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেন।

[দ্রষ্টব্য : ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে) বিরচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' পৃঃ ৩৮৭-৯০; স্যার চালর্স ইলিয়টের 'হিন্দুইজম্ এ্যান্ড বুদ্ধিজম্', ৩য় খণ্ড পৃঃ ১০০]

মণিকুন্তলা হালদার (দে)

কায়গতা সতি সুত্ত

পালি মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত সূত্রসংখ্যা ১১৯। ভগবান বুদ্ধ জেতবনে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। কায়কে নিয়ে যে স্মৃতিভাবনা তাই কায়গতা সতি। স্মৃতিসহকারে শ্বাসগ্রহণ, নিঃশ্বাসত্যাগ করতে হবে। চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মলমূত্রত্যাগে, গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে, জাগরণে, শয়নে, ভাষণে এমন কি নীরব থাকলেও স্মৃতি জাগ্রত রাখতে হবে।[১]

(অবশিষ্টের জন্য পূর্বে প্রকাশিত 'আনাপান স্মৃতি সূত্র'[২] দ্রষ্টব্য)।

১। মজ্ঝিমনিকায় সুত্ত সংখ্যা ১১৯।

২। ঐ সুত্ত সংখ্যা ১১৮।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কায়বিচ্ছিন্দ জাতক—কায়নিব্বিন্দ জাতক (জাতক নং ২৯৩)

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীর জনৈক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হন। বৈদ্যরা তাঁকে সুস্থ করতে পারলেন না। পরিবারের সকলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সঙ্কল্প করেন যে আরোগ্যলাভ করলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবেন। তিনি একদিন সুস্থ হয়ে হিমালয়ে গিয়ে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি লাভ করলেন। তিনি তন্ন তন্ন করে দেহের অশুচিভাব

উপলব্ধি করলেন এবং দেহ যে নিয়তঃ আতুর তা বুঝতে পারলেন। দেহের উপর তাঁর বিরাগ জন্মাল। এবং তিনি ব্রহ্মবিহার চতুষ্টয় (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মলোক পরায়ণ হলেন।

শ্রাবস্তীর জনৈক ব্যক্তি সম্বন্ধে বুদ্ধ এই জাতককথা বর্ণনা করেছিলেন। ঐ ব্যক্তিরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি তখন ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেন এবং বিপশ্যনা বর্ধিত করে অর্হত্বলাভ করলেন।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কারণ্ডব্যূহ (অবলোকিতেশ্বর গুণকারণ্ডব্যূহ)

মহাযান সূত্র সমূহের ভিতর কারণ্ডব্যূহ অতি পবিত্র গ্রন্থ। ইহা নেপালে পূজিত নয়টি বৈপুল্যসূত্রের অন্যতম। এতে বোধিসত্ত্বের গুণমহিমা কীর্তিতহয়েছে। গ্রন্থটি গদ্য-পদ্য দুইভাগে বিভক্ত। পূর্বেকার ভাগটি গদ্যে রচিত এবং পরবর্তী ভাগটি পদ্যে রচিত। এতে বলা হয়েছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ম্ভূ বা আদিনাথ নামক বুদ্ধ বা আদিবুদ্ধ প্রকট হয়েছিলেন এবং তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাঁর থেকেই অবলোকিতেশ্বরের সৃষ্টি এবং অবলোকিতেশ্বর তাঁর শরীর থেকে সমস্ত দেবতাদের সৃষ্টি করেছেন। ভাষা ও শৈলীর দিক বিচার করলে বলা যেতে পারে যে কারণ্ডব্যূহের পরবর্তী ভাগ পরবর্তী কালের পুরাণ সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে বৌদ্ধরা ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকর্তারূপে আদিবুদ্ধের কল্পনা করতে শুরু করেছেন। অবলোকিতেশ্বরও তখন বৌদ্ধদের মনে যথেষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। তিনি সেই সময় শ্রীলঙ্কা থেকে চীনে ফিরে যাবার সময় জাহাজে প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হন। তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য অবলোকিতশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এর থেকে মনে হয় যে কারণ্ডব্যূহের পদ্যসংস্করণ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের আগেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু এটা সম্ভব নাও হতে পারে কারণ কাঞ্জুরে যে তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায় (৬১৬ খৃঃ) তা গদ্যসংস্করণেরই অনুবাদ এবং তাতে আদিবুদ্ধের উল্লেখ নেই।

কারণ্ডব্যূহের উভয় সংস্করণেই অবলোকিতেশ্বর নামের যাথার্থ্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ অবলোকিতেশ্বরের (অবলোকিত + ঈশ্বর) অনন্ত করুণাবশে সকল প্রাণিগণকে অবলোকন করেন। তাঁর লক্ষ্য জগতের সকল সত্ত্বগণকে দুঃখমুক্ত করা, দুঃখী সত্ত্বগণকে সাহায্য করা। তিনি নরকে গিয়ে নারকীয় সত্ত্বগণকে নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেন। তিনি নরকে প্রবেশ করা মাত্রই নরক শান্ত, স্নিগ্ধ পদ্মসরোবরের মত শীতল হয়ে যায়। এভাবে তিনি প্রেতলোকে গিয়ে, দানবলোকে গিয়ে তাদের মুক্ত করেন।

কারণ্ডব্যূহে অবলোকিতেশ্বরের যে বিরাট রূপ প্রদর্শিত হয়েছে গীতার বিরাট পুরুষের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। তাঁর চক্ষু হতে চন্দ্র-সূর্য, ভ্রূ হতে মহেশ্বর, বাহু হতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, হৃদয় হতে নারায়ণ, অন্ত্যদন্ত হতে সরস্বতী, মুখ হতে মরুত, পদ হতে পৃথিবী এবং উদর হতে বরুণ উৎপন্ন হয়েছেন। এছাড়াও গ্রন্থে মন্ত্র তন্ত্রের প্রভাবের কথাও বলা হয়েছে। "ও মণি পদ্মে হুঁ" এই ষড়াক্ষরীর মন্ত্র আজও সকল তিব্বতীদের মুখে মুখে শোনা যায়, যার মহিমা অপার।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কারণ্ডিয় জাতক (জাতক নং ৩৫৬)

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীতে কারন্তিয় নামক ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। তক্ষশীলার জগদ্বিখ্যাত এক আচার্যের তিনি প্রধান শিষ্যরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সেই আচার্য যোগ্য অযোগ্য নির্বিশেষে যাচক-অযাচক নির্বিশেষে সকলকে শীলপালনের শিক্ষা দিতেন। বোধিসত্ত্ব বলতেন কেবল যোগ্য প্রার্থীকে শীল প্রদান করা উচিত। কিন্তু আচার্য তা মানতেন না।

একদিন কোন গ্রামের লোক ব্রাহ্মণবাচনের জন্য আচার্যকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আচার্য কারন্তিয়কে ডেকে বললেন—'বৎস আমি যাব না, তুমি এই পাঁচশত শিষ্যদের নিয়ে যাও, আশীর্বাদান্তে আমার দানীয় অংশ নিয়ে এস।'

বোধিসত্ত্ব পথিমধ্যে এক কন্দরে প্রকাণ্ড শিলা নিয়ে বারে বারে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সতীর্থরা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কোনও উত্তর দিলেন না। শিষ্যরা ফিরে গিয়ে আচার্যকে সমস্ত ঘটনা বললেন। আচার্য বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে, তিনি সাগরবেষ্টিত পৃথিবীকে সমতল করবেন। আচার্য বললেন—'তা কি করে সম্ভব?' বোধিসত্ত্ব বললেন যদি আচার্য জগতের সমস্ত লোককে শীলবান করতে পারবেন মনে করেন তাহলে তিনি কেন সমস্ত পৃথিবীকে সমতল করতে পারবেন না।

আচার্য সব বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্বের জ্ঞানের প্রশংসা করলেন।

বি. দ্র.—শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে ধর্মসেনাপতি শারিপুত্র স্থবিরকে উদ্দেশ্য করে এই জাতককাহিনী বলেছিলেন। স্থবিরও নাকি, ব্যাধ, ধীবর প্রভৃতি দুঃশীল লোকদেরও শীল পালনের নির্দেশ দিতেন।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালচক্রযান

বৌদ্ধ তন্ত্রমার্গীয় বজ্রযানের আর একটি সাধনমার্গ হচ্ছে কালচক্রযান। কালচক্র শূন্যতা ও করুণার প্রতীক। এই কালচক্রের উৎপত্তিও নেই ক্ষয়ও নেই। অনাদি কাল থেকে কালচক্র ঘুরে চলেছে। এর কোনও বিরাম নেই, শেষও নেই। ইহা অনাদি ও অনন্ত। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতে মিশেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর উদ্ভব এই কালচক্রে।

কাল তিনটি—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত। বুদ্ধের ত্রিকায় অর্থাৎ সম্ভোগকায়, নির্মাণকায় ও ধর্মকায় এই তিন কালের মধ্যেই নিহিত। তন্ত্রযানীদের মতে এই কালচক্রই সর্বজ্ঞ, মহাশূন্য এবং আদিবুদ্ধ। সকল বুদ্ধের জন্ম এই কালচক্রেই। তিব্বতী ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, লামা মতবাদের উৎপত্তি হয় এই কালচক্রযান থেকে। বর্তমানে তিব্বতীদের মধ্যেই তিব্বতী ধর্মগুরু দালাই লামা বছরে একবার সমারোহ সহকারে কালচক্রের পূজা করে থাকেন।

কালচক্রযানীরা মনে করেন যে, যোগসাধনের দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরস্থ পঞ্চবায়ুকে আয়ত্তে আনতে পারলে কালকে জয় করা যায়। এ সম্প্রদায়ের যোগ-সাধনায় তিথি, নক্ষত্র, যোগকরণ, রাশি প্রভৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

সুচন্দ্রের লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা বা বিমলপ্রভাটীকা প্রভৃতিতে কালচক্রযানের দার্শনিক মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা রামপালের সমসাময়িক পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্ত কালচক্র মতবাদের উপর কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১]

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় A critical Edition of Sri Kalacakratantraraja, কলিকাতা, ১৯৮৫ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩)

ডঃ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা ১৯৮৯, পৃঃ ৮৫।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালদেবল

একজন ঋষি। বুদ্ধের পিতা রাজা শুদ্ধোদনের বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তিনি প্রায়শই রাজপ্রাসাদে আসতেন এবং বুদ্ধের জননী মায়াদেবী তাঁর কাছে ধর্মোপদেশ নিতেন। অধিক কিছু জানতে হলে 'অসিত' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালবাহুজাতক (জাতক নং ৩২৯)

অতীতে বারাণসীরাজ ধনঞ্জয়ের সময় বোধিসত্ত্ব শুকপাখীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল রাধ এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। একদা এক ব্যাধ তাঁদের দুজনকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য -পেয় দিয়ে তাদের রক্ষা করতে লাগলেন। একদিন এক বনেচর কালবাহু নামক ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এক বানর এনে রাজাকে উপহার দিল। পরে এসেছে বলে তার আদরযত্ন বেড়ে গেল; শুকপাখী দুটির আদরযত্ন কমে গেল। বোধিসত্ত্ব রাধ বুদ্ধিমান ছিলেন বলে তিনি কিছুই মনে করলেন না। কিন্তু তাঁর অনুজ প্রোষ্ঠপাদ বানরটির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হল। বোধিসত্ত্ব অনুজকে বোঝালেন যে বানর তার সহজাত স্বভাবের জন্যই একদিন বিতারিত হবে। তাই হল—কালবাহুর ভ্রুকুটি ও কর্ণাদি অঙ্গের ভঙ্গী দেখে রাজকুমারেরা ভয়ে চীৎকার করতে লাগল। রাজা তাকে দূর করে দিলেন। শুকদ্বয় পূর্ববৎ 'আদরযত্ন' পেতে লাগল।

বি. দ্র.—দেবদত্ত যখন বুদ্ধকে হত্যা করার জন্য নালাগিরি হস্তীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন বুদ্ধ এই জাতক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। সেই প্রোষ্ঠপাদ বর্তমানের আনন্দ, কালবাহু হচ্ছেন দেবদত্ত, রাধ হচ্ছেন বুদ্ধ।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালসিলা

রাজগিরের নিকটে ইসিগিলি পর্বতের পাশে এই কালশিলা (কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎশিলা) অবস্থিত। এখানেই স্থবির মোগ্গল্লানকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এখানেই গোধিক ও বক্কলি আত্মহত্যা করেছিলেন। ইহা একটি নির্জন স্থান। দূর-দূরান্ত থেকে ভিক্ষুরা রাজগিরে এলে দব্ব মল্লপুত্রকে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে বলা হোত। উদ্দেশ্য মল্লপুত্রের ঋদ্ধিশক্তিকে পরীক্ষা করা। ভগবান বুদ্ধ একবার বহু ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে এই কালশিলায় অবস্থান করেছিলেন। এখানেই বুদ্ধ আনন্দকে অবকাশ দিয়েছিলেন যাতে আনন্দ অনন্তকাল পৃথিবীতে থাকার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। কিন্তু আনন্দ

পারেন নি। অন্য এক সময়েও বুদ্ধ পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে এখানে অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়।

চূলদুঃখক্খন্ধসূত্র থেকে জানা যায় যে এই কালশিলা নির্গ্রন্থদের বাসস্থান ছিল।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালাসোক (সং কালাশোক)

কালাসোক ছিলেন শৈশুনাগ বংশের দ্বিতীয় রাজা এবং প্রতিষ্ঠাতা শিশুনাগের পুত্র। কালাসোকের রাজত্বকাল আনুমানিক ৩৯৫ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৩৪৫ খ্রীঃ পূঃ। আবার বৌদ্ধসূত্রানুসারে কালাসোক মাত্র আঠাশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের দশম বর্ষে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। তাঁর রাজত্বকালেই বজ্জিপুত্তগণ বৈশালীতে দসবত্থুনির প্রচলন করেন। এই 'দসবত্থুনি' বিনয় সম্মত কি না তাই নিয়ে থেরবাদী ভিক্ষুদের সঙ্গে বজ্জিপুত্তদের মতান্তরে রাজা কালাশোক প্রথমে বজ্জিপুত্তদের পক্ষ নিলেও পরে স্বীয় ভগ্নী নন্দার প্রভাবে থেরবাদী ভিক্ষুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই বিরোধ মীমাংসার জন্যে বৈশালীর বালুকারাম বিহারে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি আহূত হয়। কালাসোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই সংগীতিতে বজ্জিপুত্তদের আচরণ বিনয়সম্মত নয় বলে থেরবাদীগণ প্রমাণ করেন। তখন বজ্জিপুত্তগণ থেরবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক এক মহাসংগীতির আয়োজন করেন। এইভাবে কালাসোকের রাজত্বকালেই বৌদ্ধসংঘ প্রথম সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত হয়ে যায়। তিনি রাজধানী রাজগৃহ বা গিরিব্রজ থেকে পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কালাসোকের পর তাঁর দশ পুত্র প্রায় কুড়িবছর এই বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হন। 'মহাবোধিবংসে' ও 'দিব্যাবদান' নামক গ্রন্থদ্বয়ে কালাসোকের পুত্রদের যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাণের হর্ষচরিত ও গ্রীক লেখক কুইন্টাস কার্টিয়াস প্রভৃতির রচনায় কাকবর্ণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। কুইন্টাস কার্টিয়াস উল্লেখ করেছেন যে জনৈক সুদর্শন নাপিত রানীর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে মগধরাজকে হত্যা করেন। পরে নিজে রাজার পুত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে রাজক্ষমতা অধিকার করে নাবালক রাজপুত্রদের হত্যা করেন। তারপর তাঁর পুত্র মহাপদ্ম নন্দ জন্মগ্রহণ করেন। জৈন পরিশিষ্টপার্বণে মহাপদ্ম নন্দকে ক্ষৌরকারের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কালাসোকের মৃত্যু নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। কারণ পুরাণের কাকবর্ণ এবং জৈনসূত্র থেকে প্রাপ্ত নাম উদায়ি, পালি ও বৌদ্ধসাহিত্যের অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত নাম কালাসোক (কালাশোক) অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে পণ্ডিত মহল নিঃসংশয় নন।

[দ্রষ্টব্য : 1. H. C. Roychowdhury. Political History of Ancient India, Calcutta University pages 104f, 195-196ff, 204f, 205f.
2. R. C. Majumdar. (ed). The Age of Imperial Unity, Page-31. Bhâratiya Vidyabharan.]

ঐশ্বর্য বিশ্বাস

কালিগোধা

জনৈকা শাক্যরমণী। তিনি স্রোতাপন্না ছিলেন। একবার বুদ্ধ কপিলবস্তুর ন্যাগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কালিগোধার যে কথোপকথন হয়েছিল তা 'সংযুক্ত নিকায়ের' কালি সুত্তে সংগৃহীত আছে। উক্ত সুত্তে তাঁকে শুধু 'গোধা'ই বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন ভদ্দিয় স্থবিরের জননী, যে ভদ্দিয় স্থবিরকে বুদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশীয় ভিক্ষুদের মধ্যে অগ্রস্থানীয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালিঙ্গ

কালিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা) একটি রাষ্ট্র। রাজধানী ছিল দন্তপুর এবং রাজা ছিলেন সত্তভূ। অঙ্গুত্তরনিকায়ে বর্ণিত ষোড়শ জনপদের মধ্যে এর নাম নেই তবে 'নিদ্দেস' গ্রন্থে এর নাম আছে। বুদ্ধের দন্তধাতু কালিঙ্গরাজ্যে রক্ষিত হয়েছিল। কালিঙ্গ থেকে এই দন্তধাতু শ্রীলংকায় কাণ্ডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শ্রীলংকার কাণ্ডিতে এই দন্তধাতুমন্দির আছে।

অনেক জাতককাহিনীতে কালিঙ্গ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। একবার কালিঙ্গদের রাজধানী দন্তপুরে ঘোর অনাবৃষ্টি হয়। মন্ত্রীদের পরামর্শমতে রাজা কুরুদের রাজা ধনঞ্জয়ের নিকট কয়েকজন 'ব্রাহ্মণকে' পাঠান যাতে তিনি তাঁর ঋদ্ধিশালী মঙ্গলহস্তী অঞ্জনবসভকে পাঠান। অঞ্জনবসভকে আনা হল কিন্তু কোনও ফল হয় না। দন্তপুরের শীলবান প্রজাদের ধর্মপ্রভাবেই বৃষ্টিপাত হয়েছিল। অশ্মকরাজ অরুণ জনৈক কালিঙ্গরাজের সমসাময়িক ছিলেন। কালিঙ্গরাজ অশ্মকরাজ অরুণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজিত হন এবং যৌতুকস্বরূপ তাঁর চার জন কন্যাকে রাজার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হন[১]। আর একজন কালিঙ্গরাজ অন্য দুজন রাজার সঙ্গে (রাজা অটঠক এবং রাজা ভীমরত্ত) ঋষি শরভঙ্গের নিকট গিয়েছিলেন কুম্ভবতী নগরে কালিঙ্গের একজন প্রদেশরাজ দণ্ডকী কেন তপ্তভস্মবর্ষণে রাজ্যসহ বিনষ্ট হয়েছিলেন তা জানতে। দণ্ডকীর পাপের কথা ঋষি শরভঙ্গের মুখে শুনে তিনজনই ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। আর একজন কালিঙ্গরাজ নাড়িকীর এক তপস্বীকে অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করার ফলে নরকগামী হয়েছিলেন। দেবগণের রোষে তাঁর রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল এবং কালিঙ্গারণ্যে পর্যবসিত হয়েছিল। কুম্ভকার জাতকে (জাতক নং ৪০৮) করণ্ডু নামে একজন কালিঙ্গরাজের নাম পাওয়া যায়।

বহু প্রাচীন কাল থেকে কালিঙ্গদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন সিংহলবংশের (শ্রীলংকা) প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সিংহের পিতামহী সুসীমা ছিলেন কালিঙ্গ রাজকুমারী যার সঙ্গে বঙ্গের এক রাজার বিয়ে হয়েছিল।

শ্রীলংকার সঙ্গে কালিঙ্গদেশের বন্ধুত্বপূর্ণসম্পর্ক বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। শ্রীলংকার রাজা দ্বিতীয় অগ্গবোধির রাজত্বকালে (খৃঃ ৬০১-৬১১) কালিঙ্গরাজ তাঁর মহিষী ও অমাত্যের সঙ্গে শ্রীলংকায় গিয়ে সন্ন্যাসজীবন যাপনের মনস্থ করে জ্যোতিপাল স্থবিরের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা অগ্গবোধি ও তাঁর মহিষী তাঁদের যথেষ্ট সম্মান এবং সেবা সৎকার করেছিলেন। শ্রীলংকার রাজা ৪র্থ মহিন্দ কালিঙ্গ রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। রাজা প্রথম বিজয়বাহুও কালিঙ্গ রাজকন্যা

তিলকসুন্দরীকে বিয়ে করেছিলেন। শ্রীলংকার রাজবংশ এবং কালিঙ্গ রাজবংশের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বহুকাল বর্তমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কালিঙ্গরাজবংশের জনৈক বংশধর শ্রীলংকা এবং শ্রীলংকার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন।

অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে অশোক কালিঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। কালিঙ্গযুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয় হওয়ায় অশোকের জীবনে পরিবর্তন আসে। এরপর তিনি আর কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হন নি। তিনি যে তাঁর কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পবিত্র বোধিবৃক্ষের চারা সহ শ্রীলংকায় পাঠিয়েছিলেন সেই শুভেচ্ছা মিশনে কালিঙ্গের আটটি পরিবারও যোগ দিয়েছিল।

অশোকের ছোট ভাই তিষ্যকুমার ভিক্ষু হয়েছিলেন, তাঁর ভিক্ষুনাম ছিল একবিহারিয়। তিনি তাঁর গুরু ধর্মরক্ষিত স্থবিরের সঙ্গে কালিঙ্গদেশে অবসরজীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে অশোক ভোজকগিরি বিহার তৈরী করে দিয়েছিলেন।

বেস্সন্তর জাতক (জাতক নং ৫৪৭) থেকে জানা যায় যে জুজুকের বাসস্থান ব্রাহ্মণগ্রাম দুন্নিবিট্‌ঠ কালিঙ্গে অবস্থিত।

১। চুল্লকালিঙ্গজাতক। (নং ৩০১)

উৎস নির্দেশ :

দীঘ, ২য়, ২৩৫; মহাবস্তু ৩য়, ২০৮; অঙ্গুত্তর ১ম, ২১৩; বুদ্ধবংস ২৮ অধ্যায় ও চুলবংস ৩৭ অধ্যায় ৯২, দাঠাধাতুবংস পৃঃ ১০৮; ধম্মপদট্‌ঠকথা ৪র্থ, ৮৮; মজ্ঝিম ১ম, ৩৭৮, পপঞ্চসূদনী ২য় ৬০২, মহাবংস ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১; দীপবংস, ৯ ম ২ চুলবংস ৪২ তম ৪৪; ঐ ৮০ তম, ৫৮; মুখার্জী, অশোক, পৃঃ ১৬, ৩৭, ২১৪, সমন্তপাসাদিকা ১ম পৃঃ ৯৬; থেরগাথা অট্‌ঠকথা ১ম, ৫০৬।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালিঙ্গবোধি জাতক (জাতক নং ৪৭৯)

দন্তপুরের কালিঙ্গরাজের দুই পুত্র ছিল—মহাকলিঙ্গ ও চুল্লকলিঙ্গ। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে চুল্লকালিঙ্গ ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাঁর পুত্র হবেন চক্রবর্তীরাজা। এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে মহাকলিঙ্গ রাজা হয়েই অনুজকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। চুল্লকলিঙ্গ পালিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। এদিকে মদ্ররাজ মহিষী ও কন্যাসহ পালিয়ে হিমালয়ে চলে এসেছিলেন। চুল্লকলিঙ্গের আশ্রমের পাশেই ছিল মদ্ররাজের আশ্রম। ভবিষ্যদ্‌বক্তারা বলেছিলেন যে, রাজা মদ্রের কন্যার যে পুত্র হবে সে চক্রবর্তীরাজা হবে। তাই জম্বুদ্বীপের বহু রাজা তাঁর পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। অনেক শত্রুতার সম্মুখীন হবেন ভেবে রাজা মদ্র কারও হাতে মেয়েকে না দিয়ে হিমালয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। একদিন মদ্রের কন্যা একটি আমের মঞ্জরী নদীর জলে নিক্ষেপ করে। চুল্লকলিঙ্গ সেটা পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে মদ্রকন্যার সাক্ষাৎ পান। মদ্ররাজ চুল্লকলিঙ্গের পরিচয় জানতে পেরে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। যথাসময়ে তাঁদের এক পুত্র সন্তান লাভ হয়। তাঁর নাম রাখা হয় কলিঙ্গ। এদিকে দন্তপুরের রাজা মহাকলিঙ্গের মৃত্যু হয়।

সংবাদ পেয়ে চুল্লকলিঙ্গ ছেলেকে দন্তপুরে পাঠান। রাজকুমারের পরিচয় জানতে পেরে দন্তপুরের সকলে তাঁকেই রাজা করেন। তাঁর পুরোহিত ব্রাহ্মণ কলিঙ্গ-ভরদ্বাজ তাঁকে রাজচক্রবর্তীর কর্তব্যাদি শেখাতে লাগলেন।। তাঁর রাজ্যাভিষেকের পনের দিনের মাথায় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার থেকে প্রমাণিত হয় তিনি রাজচক্রবর্তী হবেন। একদিন কলিঙ্গ রাজচক্রবর্তী ষটত্রিংশদ্ যোজনব্যাপী অনুচরপরিবৃত হয়ে সর্বশ্বেত হস্তীতে অরোহণ করে মহাড়ম্বরে মাতাপিতার দর্শনে যাচ্ছিলেন শূন্যমার্গে। যে স্থান বুদ্ধগণের জয়পালঙ্ক এবং পৃথিবীর নাভিস্বরূপ হস্তিদ্বয় সে মহাবোধি বেদিকার উপর দিয়ে যেতে পারল না। রাজা তাকে চালিত করার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না।

রাজার সঙ্গে তাঁর পুরোহিতও সঙ্গে ছিলেন। তিনি ভূভাগ অবলোকন করে ভাবলেন—'অহো! এই স্থানে বুদ্ধগণ সর্বক্লেশ বিধ্বস্ত করেছেন। এর উপর দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রও যেতে পারেন না। তিনি রাজাকে সব বলাতে রাজা অভিভূত হলেন এবং সেই বোধিবৃক্ষমূলে সাতদিন ধরে পূজা করলেন।

মহাবোধিবংসেও কালিঙ্গবোধিজাতকের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

বি. দ্র.—স্থবির আনন্দ যে মহাবোধির পূজানুষ্ঠান করেছিলেন তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই জাতককথা বর্ণনা করেছিলেন।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালী (কুরুর ঘরিকা)

তাঁকে কুরুকঘরিকাও বলা হয়। জনশ্রুতি থেকে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনকারী গৃহী উপাসিকাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠস্থানীয়া। তিনি ছিলেন সোণকুটিকন্নের জননী এবং তাঁর স্বামী অবন্তীর কুরুরঘরের অধিবাসী। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি রাজগৃহে পিত্রালয়ে এসেছিলেন। একদিন পিতৃগৃহের সিংহপঞ্জরে দাঁড়িয়ে তিনি শীতলবায়ু সেবন করছিলেন। তখন সাতাগির এবং হেমবত বুদ্ধের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে বাক্যালাপ করছিলেন তা তাঁর কর্ণগোচর হয়। শুনেই তিনি পুত্রের প্রতি প্রসন্না হন। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেন। ঠিক সেইদিনেই তিনি তাঁর পুত্র সোণের জন্ম দেন। তারপর পতিগৃহে ফিরে এসে তিনি স্থবির মহাকচ্চায়নের সান্নিধ্যে আসেন। সোণ যখন মহাকচ্চায়নের নিকট দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং একদিন বুদ্ধদর্শনে যান তখন কালী একটি মূল্যবান কম্বল পুত্রকে দিয়ে বলেছিলেন—"আমার নাম করে বুদ্ধের শয়নকক্ষে এটি বিছিয়ে দিও।" সোণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে বুদ্ধনির্দেশে ধর্মদেশনা করেন। বুদ্ধ এই ধর্মদেশনা শুনে সোণকে অনেক সাধুবাদ দিয়েছিলেন। কালী সব শুনে পুত্রকে বললেন তাঁকেও যেন তিনি অনুরূপভাবে ধর্মদেশনা করেন। কালী স্রোতাপন্না নারীগণের মধ্যে প্রধানা ছিলেন। তিনি ভিক্ষুণী কাতিয়াণীর নিত্যসহায়ী ও অকৃত্রিম বান্ধবী ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে স্থবির মহাকচ্চায়নের যে কথোপকথন হয় তা কালীসুত্তে[১] গ্রথিত হয়েছে।

১। কালীসুত্ত, অঙ্গুত্তরনিকায় ৫ম, পৃঃ ৪৬।

জয়ন্তী চ্যাটার্জী

কালুদায়ী থেরো (কালুদায়ি স্থবির)

কালুদায়ি স্থবির পদুমুত্তর ভগবানের সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। একদা তিনি ভগবানের ধর্মদেশনা শুনছিলেন, এমন সময় ভগবান এক ভিক্ষুকে কুলপ্রসাদকদিগের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করলেন, দেখে তিনিও সেই পদ লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন থেকে তিনি দেব নরলোকে বহু পুণ্য সঞ্চয় করে বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ দিবসে কপিলাবস্তুতে অমাত্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের জন্মদিনেই ভূমিষ্ঠ হন। তখন তাঁকে একখানা শ্বেতবস্ত্রে শয়ন করিয়ে বোধিসত্ত্বের নিকটে নিয়ে গিয়েছিল। বোধিসত্ত্বের সহজাত বোধিবৃক্ষ, রাহুলমাতা, চারি নিধিকুম্ভ, আরোহণীয় হস্তী, কণ্ঠক অশ্ব, ছন্নসারথী ও কালুদায়ি অমাত্য এই সাতটিও ছিল। কালদায়ির জন্ম গ্রহণে সমস্ত নগরবাসী উন্নতমনা হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হল—উদায়ি। শরীরের বর্ণ ঈষৎ কাল বলে কালুদায়ি নামে পরিচিত। তিনি বোধিসত্ত্বের বাল্যসখা ছিলেন। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ক্রীড়ারত হয়ে শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে লোকনাথ মহাভিনিষ্ক্রমণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন এই সংবাদ পেয়ে বুদ্ধকে আনার জন্য সহস্র পুরুষসহ জনৈক অমাত্যকে পাঠিয়েছিলেন। সেই অমাত্য বুদ্ধের ধর্মদেশনার সময় তথায় উপস্থিত হন। ধর্ম শুনে সপরিবার অর্হত্ব ফল লাভ করেন। সকলে বুদ্ধের নিকট ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করেন। অর্হত্ত্বফল লাভ করে রাজার প্রেরিত সংবাদ দশবলবুদ্ধকে আর বলেন নি। পর পর রাজা নয় জন অমাত্য সহিত নয় হাজার লোক পাঠিয়েছিলেন সকলেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। কেহই রাজার সংবাদ বুদ্ধকে বলেন নি। তখন রাজা - এই উদায়ি দশবলের সমবয়স্ক, বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী, তাঁকেই পাঠাবার মনস্থ করলেন। তিনি বললেন—যদি তিনি প্রব্রজ্যা লাভ করতে পারেন তাহলে ভগবানকে নিয়ে আসবেন। উদায়ি যথারীতি বেণুবনে গিয়ে সপরিষদ বুদ্ধের ধর্মশ্রবণে অর্হত্ব ফল লাভ করলেন ও ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করলেন এবং চিন্তা করলেন যে বসন্ত সমাগমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্দ্ধিত হলে তখনই ভগবানকে কপিলাবস্তুনগরে নিয়ে যাওয়া হবে।

অপদান অনুসারে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে কালুদায়ি হংসবতীর এক মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। ভিস জাতকে, কালুদায়িকে সঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol-1, P. 589-590

শশধর বড়ুয়া, থেরগাথা, পৃষ্ঠা ৩৩১-৩৩৪

বেলা ভট্টাচার্য

কাসাব জাতক (কাষ জাতক, ২২১)

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্ত সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছিলেন। একসময় ধর্মসেনাপতি পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বেণুবনে বাস করছিলেন। দেবদত্ত তখন পুঃস্থ অনুচরসহ গয়াশিরে থাকতেন। সেই সময় রাজগৃহবাসীগণ চাঁদার মাধ্যমে সাধুগণকে দান করার মনস্থ করেছিলেন। তখন এক বণিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি

নগরবাসীগণকে একটি কাষায়বস্ত্র দিয়ে বললেন ঐ কাষায় বস্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থে সাধুগণকে যেন দান করা হয়। কিন্তু চাঁদার পরিমাণ যথেষ্ট হওয়ার ফলে কাষায় বস্ত্রটির বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়নি। তখন নগরবাসীগণ চিন্তা করল কাহাকে সেই বস্ত্রটি দেওয়া যেতে পারে। কিছু সংখ্যক লোক বলে সেটি সারিপুত্রকে দেওয়া হোক অন্যেরা বলে সেটি দেবদত্তকে দেওয়া হোক। যেহেতু দেবদত্ত নগরীতে স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন সেহেতু মতাধিক্য কারণে কাষায় বস্ত্রটি দেবদত্তকেই প্রদান করা হল। দেবদত্ত তাহা পরিধান করতে শুরু করলেন। এরপর ত্রিশজন ভিক্ষু শাস্তার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানালেন দেবদত্ত অর্হৎ না হওয়া সত্ত্বেও কাষায় বস্ত্র পরিধান করে অন্যায় করেছেন। শাস্তা তাদের বললেন, শুধু এ জন্মেই নয় পূর্ব জন্মেও দেবদত্ত এমনটি করেছেন। অনন্তর তিনি তাদের সেই অতীত কাহিনী বললেন।

অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হস্তিবংশে জন্ম নিয়েছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি অশীতি সহস্র হস্তীর যূথপতি হয়েছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি দেখলেন দন্তকারেরা বহুবিধ বস্তু নির্মাণে রত। সে তাহাদের জিজ্ঞাসা করল হস্তীদন্ত নিয়ে আসলে তাহারা তা কিনবে কি না। তাহারা সম্মতি জানাল এরপর সেই ব্যক্তি কাষায় বস্ত্র পরিধান করে হস্তীদের যাত্রাপথে অপেক্ষমান রইল। এরপর থেকে সে নিয়মিত হস্তী সংহার করে এবং তাদের দন্ত বিক্রয় করে অর্থোৎপাদন করত। সচরাচর হস্তীযূথের পশ্চাতে থাকা হস্তীটিকে মারত। কিছুদিন পর হস্তীসকল বোধিসত্ত্বকে বলে নিয়মতভাবে হস্তীর সংখ্যা কমে আসছে। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন এক ব্যক্তি প্রত্যেক বুদ্ধের বেশে প্রতিদিন হস্তীযূথের গমন পথে প্রতীক্ষা করে থাকে। তিনি নিজে হস্তীযূথের পশ্চাতে থাকলেন এবং যখন ঐ ব্যক্তি তাহাকে আঘাত হানিবার উদ্যোগ করল তখন গুপ্তচিন্তা করে তাকে বধ করতে গিয়ে ভাবলেন ঐ ব্যক্তির পরিহিত কাষায় বস্ত্রের সম্মান রক্ষা করা কর্তব্য। তিনি তাকে বললেন ঐ বস্ত্র পরিধান করা তার পক্ষে অন্যায়। বোধিসত্ত্ব তাকে তিরস্কার করে সাবধান করে দিলেন ওভাবে যেন সে আর কোনদিন না আসে। এরপর সে ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

সমাধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই হস্তিহন্তা পুরুষ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।

দ্রষ্টব্য : জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫, DPPN, Malalasebera, Vol-I, p-591

বেলা ভট্টাচার্য

কাসী (কাশী)

বৌদ্ধ পুস্তকাবলীতে ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে কাশী একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। অথর্ব বেদের মধ্যে কাশীর অধিবাসীদের উল্লেখ আছে। পুরাণে কাশীর নাম উল্লিখিত আছে। অর্থশাস্ত্রে, হরিবংশে এবং জৈন সাহিত্যে এই কাশীর উল্লেখ আছে। কাশীর রাজধানী বারাণসী। কাশী খুব সমৃদ্ধশালী ও উন্নতশীল শহর ছিল। জাতকে উল্লিখিত আছে যে কাশী তিনশত লীগ বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের উত্তরে কোশল। পূর্বদিকে মগধ বৃজি এবং বৃদ্ধি এবং বংশ (বৎস) দক্ষিণে ভগবান বুদ্ধের আগে থেকেই কাশী একটি

শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের সময় কাশী তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল। শুধুমাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নয়, কাশী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হতো।

[দ্রষ্টব্য : B. Bhattacharya, Facets of Early Buddhism : A Study of Fundamental Principles, P. 39
B. N. Choudhury, Buddhist Centres in Ancient India, P. 64-65.]

বেলা ভট্টাচার্য

কিম্পক্ক জাতক (কিংপক্ক জাতক, ৮৫)

সেই সময় বোধিসত্ত্ব একটি মরূযাত্রিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একটি বনভূমি অতিক্রম করার সময় তিনি আদেশ দেন তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ যেন কোনও ফল আহার না করে। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী একটি বিশেষ জাতের গাছের ফল (কিমপক্ক) যার সঙ্গে আম গাছের সাদৃশ্য ছিল, সেগুলি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সব রকমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মারা যায়। ঘটনাটি একটি ভিক্ষুকের কাছে বিবৃত করা হয় যে বস্তুটির সৌন্দর্য্যের ফলে কামাতুর হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের কামভাব কিমপক্ক ফলের মত। ভক্ষণের সময়ে মিষ্ট ও আকর্ষণীয় কিন্তু যার অন্তিম ফল মৃত্যু।

G. P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, Page-605
জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, প্রথম খণ্ড

বেলা ভট্টাচার্য

কিম্বিল থের, কিমমিল থের (কিম্বিল স্থবির)

কিম্বিল স্থবির পূর্ব্ব বুদ্ধগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জাত হন। তিনি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাপিত চৈত্যে শাল পুষ্পমালা মণ্ডলাকারে দিয়ে পূজো করেন। সেই পূণ্য প্রভাবে তাঁর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম হয়। গৌতম বুদ্ধের সময় কপিলাবস্তু নগরে শাক্য রাজকুলে উৎপন্ন হন। তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগে মত্ত হলেন। ভগবান বুদ্ধ তার জ্ঞান পরিপক্ক হয়েছে দেখে সংবেগ উৎপাদনার্থ অনুপ্রিয় বন হতে ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। ক্রমশঃ দেখলেন যে, একজন রমনী কিভাবে জরা, জীর্ণ, রোগে শীর্ণ হয়ে কিভাবে পরিবর্তিত হয়। দেহের অসারতা দর্শনে অনিত্য ভাবনায় মনোনিবেশ করলেন। শাস্তা তখন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। তিনি ধর্ম্মশ্রবণান্তে প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করলেন।

G. P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, Page 605.

বেলা ভট্টাচার্য

কিম্বিলথের (কিম্বিল স্থবির)

আয়ুষ্মান নন্দিয় ভিক্ষুর সঙ্গে একত্রে বাস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করে নিম্নোক্ত গাথা ব্যক্ত করেছেন।

পাচীনবংসদায়ম্হি সাক্যপুত্তা সহায়কা,
পহায়ানপ্পকে ভোগে উঞ্ছপত্তাগতে রতা।
আরদ্ধবিরিয়া পহিতত্তা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা,
রমন্তি ধম্মরতিয়া হিত্বান লোকিয়ং রতিন্তি।
কিম্বিলো থেরো।

প্রাচীন বংশদায় নামে স্থানে অনুরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যপুত্রগণ বহুধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই আরব্ধবীর্যপরায়ণ, নির্বাণ প্রবণ চিত্ত, নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী ভিক্ষুগণ লৌকিয়রূপাদি নিমিত্ত ত্যাগ করে লোকোত্তর ধর্ম্মরতিতে অভিরমিত হচ্ছেন।

[দ্রষ্টব্য : থেরগাথা, শশধর বড়ুয়া, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭]

বেলা ভট্টাচার্য

কিলমথানুযোগ

কিলমথ শব্দের উৎপত্তি ক্লম থেকে। এই শব্দের অর্থ ক্লান্ত, অবসন্ন, বিষণ্ণ (কৃচ্ছসাধনের ফলে) এবং অনুযোগের অর্থ হল প্রশ্ন, আসক্ত হয়ে অথবা উৎসর্গ করা, প্রয়োগ করা, অনুশীলন করা, লক্ষ্য।

কিলমথানুযোগ শব্দটি বিনয়পিটকের মহাবগ্গে এবং সংযুক্ত নিকায়ের ধম্মচক্কপবত্তন সুত্তে পাওয়া যায়।

'ধম্মচক্কপবত্তন' বুদ্ধের সর্বপ্রথম প্রচারিত ধর্মদেশনা। তিনি এই সুত্তটি বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের (অঞ্‌ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ, ভদ্দিয়, বপ্প, অসসজি, মহানাম) উদ্দেশ্যে প্রচার করেন এবং এই সুত্তটির মূল বক্তব্য হল—দুই প্রকার অন্ত কখনো ভিক্ষুদের পালন করা উচিৎ নয়। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথমটি হল—কাম-সুখল্লিকানুযোগ' অর্থাৎ কামের দ্বারা উদ্ভূত সুখের থেকে বিরত থাকা এবং দ্বিতীয়টি হল 'কিলমথানুযোগ' অর্থাৎ কৃচ্ছসাধনের থেকে বিরত থাকা কারণ চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন কেবল শরীর ও মনকে ক্লান্তই করে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে না। বুদ্ধের মতে, মধ্যম পন্থাই (মজ্ঝিম পটিপদা) হল শ্রেষ্ঠ পথ। চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন বা চূড়ান্ত ভোগের দ্বারা নয় সর্বোচ্চ লক্ষ্য বা নির্ব্বাণের জন্যে মধ্যমপন্থাই শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতে মধ্যম পন্থায় চলার জন্যে চারটি আর্যসত্য পালন করতে হবে (চত্তারি অরিয়সচ্চানি—দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় (নিরোধগামিনীপটিপদা)। আবার এই শেষোক্ত অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির রাস্তাস্বরূপ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলতে হবে। তবেই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হবে এবং নির্ব্বান প্রাপ্তি ঘটবে।

দ্রষ্টব্য :— i) সংযুত্তনিকায়, ii) বিনয়পিটক, iii) Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera Vol. I. iv) Pali-English Dictionary, Rhys Davids and William Stede. v) A Dictionary of the Pali Language, Robert C. Childers.

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

কিসসংকিচ্ছ

কিস অর্থাৎ কৃশ। সম্ কিচ্ছ (কৃচ্ছ) হলো সংকিচ্ছু অর্থাৎ কৃচ্ছসাধনের দ্বারা যিনি কৃশ।

কিসসংকিচ্ছ বুদ্ধ, নন্দ বচ্ছ এবং মক্খলি গোসালের সমসাময়িক একজন নগ্ন আজীবক। মজ্ঝিম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও মজ্ঝিম নিকায় অট্ঠকথায় এই আজীবকের উল্লেখ পাওয়া যায়। আজীবকদের তিন প্রকার মতবাদের মধ্যে একটিতে তিনি আলোকপাত করেন।

বুদ্ধঘোষের মতে, কিস হলো তাঁর নিজস্ব নাম এবং সংকিচ্ছ তাঁর গোত্র।

দ্রষ্টব্য : i) Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol. I.
ii) Dictionary of the Pali Language, Robert C. Childers.

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

কিসা গোতমী (কৃশা গৌতমী)

কৃশা গৌতমী পালিসাহিত্যে এক মর্মস্পর্শী জীবন চরিতরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। শ্রাবস্তী নগরে এক দরিদ্র পরিবারে কৃশা গৌতমী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম গৌতমী কিন্তু তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত কৃশ (কিস), সে কারণে লোকে তাঁকে কৃশা গৌতমী বলতো। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে ও শ্রাবস্তীতেই এক ধনী বণিকপুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী গৃহে কৃশা গৌতমী বিবাহিতা জীবনের প্রথম দিকে অনাদৃতা ছিলেন, কিন্তু পুত্র হওয়ার পর পতির সংসারে সমাদৃতা হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: শিশু বয়সেই তাঁর পুত্র সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র শিশুর অকাল মৃত্যুতে তিনি প্রায় উন্মাদের মত হয়ে সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করে দ্বারে দ্বারে তাঁর সন্তানের জন্য ঔষধ প্রার্থনা করতে লাগলেন। কৃশা গৌতমীর নিদারুণ করুণ অবস্থা দেখে এক দয়ালু ব্যক্তি তাঁকে ভগবান বুদ্ধের নিকট যেতে পরামর্শ দিলেন। ভগবান বুদ্ধের নিকট কৃশা গৌতমী উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি কৃশা গৌতমীকে এমন একটি গৃহ থেকে একটি সর্ষপবীজ আনতে বললেন যে গৃহে কোন দিন কোন মৃত্যু ঘটে নি। তাহলেই তিনি তাঁকে তাঁর পুত্রের জন্য ঔষধ দেবেন। কৃশা গৌতমী দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু হায় কোথাও মৃত্যুহীন বাড়ী নেই। সকলেই মৃতব্যক্তিদের জন্য হাহাকার করতে লাগলো। তখন কৃশা গৌতমী বুঝতে পারলেন যে, মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে মুক্তি নেই। মৃত্যুই হল ধ্রুব সত্য। মৃত্যু কোন নগর, বংশ বিশেষের ধর্ম নয়। এটি সার্বজনীন সুতরাং সর্ববস্তু অনিত্য (সব্বং অনিচ্চং)।

তারপর কৃশা গৌতমীর মানসিক পরিবর্তন হল এবং ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁকে জানতে চাইলেন, কৃশাগৌতমী মৃত্যু হয় নি যে গৃহে, সেখান হতে সর্ষপবীজ সংগ্রহ করতে পেরেছেন কি না। কৃশা গৌতমী জানালেন সর্ষপবীজের আর প্রয়োজন নেই। তিনি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণ করে কৃশা গৌতমী স্রোতাপন্ন হলেন এবং সংঘ জীবনে প্রবেশের জন্য ভগবান কর্তৃক অনুমতি লাভ করলেন। ক্রমশঃ কৃশা গৌতমী অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন।

একদা জেতবনে অনুষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ সম্মিলনে ভিক্ষুণীদের শ্রেণী বিভাগ কালে অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারিণী (পংসুকুল ধরং)। তিনি পঁচাত্তরজন প্রধানা ভিক্ষুণীর অন্যতম ছিলেন। ভিক্ষুণীদের মধ্যে কৃশা গৌতমীকে ভগবান বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছিলেন।

G.P. Malalasekera, DPPN, Vol I, p. 610. ভিক্ষু শীল ভদ্র, থেরীগাথা, পৃষ্ঠা, ১০১

বেলা ভট্টাচার্য

কিংসীল সুত্ত

এই সুত্তটি সুত্তনিপাতের অন্তর্গত চুল্লবগ্গের নবম সুত্ত এবং সারিপুত্তের প্রশ্নের মধ্য থেকেই এর প্রথম শব্দ কিংসীলর উদ্ভব।

কিং (কিম্) শব্দের অর্থ কি এবং সীল শব্দের অর্থ প্রকৃতি, স্বভাব, শীলের পরিচর্যা, নৈতিকতা, অতএব কিংসীল শব্দের অর্থ শীলের পরিচর্যা কি বা নৈতিকতা কি।

কোন একসময়ে সারিপুত্ত তাঁর পিতার বন্ধু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। পুত্রটি সারিপুত্তের তত্ত্বাবধানে সঙ্ঘে যোগ দেন। সারিপুত্ত চেয়েছিলেন যে তিনি তাকে বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত ধর্মোপদেশ শ্রবণ করাবেন, তাই তিনি তাকে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত করলে বুদ্ধ তাকে এই ধর্ম দেশনা করেন—

যে ব্যক্তির লক্ষ্য নিবার্ণ প্রাপ্তি তার ঈর্ষা পরায়ণ, একগুঁয়ে অথবা উদাসীন হওয়া উচিৎ নয়। অপরপক্ষে অপ্রমত্ত ব্যক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মসংযম, পবিত্রতা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে এবং ধর্মই তার একমেতবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ প্রথম ও শেষ লক্ষ্য হয়।

[দ্রষ্টব্য : i) সুত্তনিপাত
ii) Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera Vol. I.
iii) Pali-English Dictionary, Rhys Davids and Stede.
iv) A Dictionary of the Pali language, Robert C. Childers.

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

কিংসুকোপম জাতক (কিংশুকোপম জাতক, ২৪৮)

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কিংশুকোপমসূত্র প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন।

একদা চারজন ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়ে নিজের নিজের কর্মস্থান (ধ্যানের বিষয়) প্রার্থনা করলেন। শাস্তা নিজ নিজ কর্মস্থান নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। ভিক্ষুরা সেটি গ্রহণ করে নিজ নিজ রাত্রি যাপনের ও দিবা যাপনের স্থানে চলে গেলেন।

এদের মধ্যে একজন ষড়বিধ স্পর্শায়তন। (বৌদ্ধদর্শনে ছয়টি কর্মেন্দ্রিয় - চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় বা ত্বক এবং মন এবং ছয়টি জ্ঞানের বিষয়—এই বারটি আয়তন আছে। স্পর্শায়তনের ছয়টি অঙ্গ—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণস্পর্শ, জিহ্বাস্পর্শ, কায়স্পর্শ ও মনঃস্পর্শ।) একজন পঞ্চস্কন্ধ। (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

লোকের যখন মৃত্যু হয় তখন স্কন্ধগুলিরও বিনাশ হয়, কিন্তু কর্মফলে তৎক্ষণাৎ আবার নতুন স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। সকল প্রাণী এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। স্কন্ধবিহীন কোন আত্মা নেই।) একজন মহাভূতচতুষ্টয় (পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু)। আর একজন অষ্টাদশ ধাতু (চক্ষু, রূপ, চক্ষুর্বিজ্ঞান; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র বিজ্ঞান; ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণবিজ্ঞান; জিহ্বা, রস, জিহ্বা বিজ্ঞান; কায়, স্পৃষ্টব্য, কায়বিজ্ঞান; মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান)। এই চারজন ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং তারপর শাস্তার নিকট গিয়ে স্ব স্ব গুণ বর্ণনা করলেন তাদের মধ্যে একজন বললেন, যে ভগবান সমস্ত কর্মেরই চরমফল নির্ব্বান। শাস্তা তখন কিংশুক বৃক্ষের কাহিনী উল্লেখ করে সেই অতীত কথা বলতে লাগলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের চারটি পুত্র ছিল। তারা একদিন কিংশুক বৃক্ষ দেখবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সারথি তাদের চারজনকে একসঙ্গে না নিয়ে গিয়ে আলাদা করে এক একজনকে নিয়ে গিয়েছিল। সারথি প্রথমে জ্যেষ্ঠ্য রাজকুমারকে পত্রহীন কিংশুক বৃক্ষের কোরকদগম অবস্থায় দেখিয়েছিলেন। তারপর একে একে সে একজনকে নবপত্রোদ্গম-কালে, একজনকে পুষ্পিতকালে এবং একজনকে ফলিতকালে কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়েছিলেন।

অনন্তর একদিন ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্র উপবেশন করে, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করলে জ্যেষ্ঠ্যপুত্র বললেন, কিংশুক বৃক্ষ অবিকল দগ্ধ স্থানুর ন্যায়, দ্বিতীয় কুমার বললেন কিংশুক বৃক্ষ ঠিক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়। তৃতীয় কুমার বললেন, কিংশুক বৃক্ষ, মংস পেশীর ন্যায় এবং চতুর্থ কুমার বললেন, এটা ঠিক শিরীষ বৃক্ষের ন্যায়। এরূপে প্রত্যেকেই অপরের বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়ে, তাঁরা পিতার নিকট গিয়ে, কিংশুক বৃক্ষ কীরূপ তা জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁর পুত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁরা কিংশুক বৃক্ষ কীরূপ সেই সম্পর্কে কে কি বলেছে। তাঁরা যে যা বলেছে তা রাজার নিকট নিবেদন করলো। তখন রাজা বললেন, তারা কিংশুক দেখেছে ঠিকই কিন্তু কোন সময় কেমন দেখায় তা তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞাসা করেনি। ফলে কিংশুক বৃক্ষের বর্ণনা সত্য হয়েছে কিন্তু তাহা আংশিকে সত্য সম্পূর্ণ সত্য নয়।

শাস্তা এইরূপে ভিক্ষু-চতুষ্টয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করে বললেন, যেমন রাজকুমারগণ তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞাসা না করায় কিংশুক সম্বন্ধে সন্দিহাণ হয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বহুরূপের গল্প, অন্ধচতুষ্টয়ের হস্তিরূপ বর্ণনা, দুইজন যোদ্ধার একটা চর্মের বর্ম নিয়ে বিবাদ ইত্যাদি আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম খণ্ডের মারুত জাতক ও (১৭) তুলনীয়।

দ্রষ্টব্য : জাতক, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৬-১৬৮

বেলা ভট্টাচার্য

কুক্কুট জাতক (কুক্কুট জাতক, ৩৮৩)

শাস্তা যখন জেতবনে ছিলেন তখন জনৈক ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেন তাহার উৎকণ্ঠার কারণ কি? উত্তরে ভিক্ষুটি জানান এক আভরণময়ী মহিলাকে দেখে তার মনে কামভাব জেগে উঠেছে। শাস্তা তখন তাকে বলেন রমনীকুল মাজারীবৎ। তারা পুরুষকে বঞ্চনা ও প্রলোভনের মাধ্যমে প্রথমে নিজবশে এনে পরিশেষে তার বিনাশের কারণ হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি কিছু অতীত কথা বলেন।

প্রচীনকালে বারাণসী নৃপতি ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কুক্কুট যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। নিকটে একটি বিড়ালী বাস করত। সে বোধিসত্ত্বকে বাদ দিয়ে অন্যান্য কুক্কুটগণকে ভক্ষণ করত। বোধিসত্ত্ব কিন্তু বিড়ালীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ফলে বিড়ালটি ভাবল, "এই কুক্কুটটি অতি ধূর্ত। কিন্তু আমার শঠতার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। আমি তার স্ত্রী হব একথা শুনলে সে প্রলোভনে পড়বে, আমার বশে আসবে ও আমি তাকে খেয়ে নিতে পারব।" এই ভেবে সে বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে তার রূপের প্রশংসা করতে শুরু করল।

তার প্রশংসা বাক্য শুনে বোধিসত্ত্বের মনে হল ঐ বিড়ালী আমার আত্মীয় স্বজনকে খেয়ে ফেলেছে, এখন আমায় হত্যা করতে চায়। ওকে বিতাড়িত করতে হবে। বোধিসত্ত্ব তাকে বললেন, সে চতুষ্পদ প্রাণী ও বোধিসত্ত্ব দ্বিপদ। এমন অবস্থায় বিবাহ হতে পারে না। বিড়ালী দেখল বোধিসত্ত্ব খুবই বুদ্ধিমান। তবু সে আবার চেষ্টা করল, বোধিসত্ত্বকে বিবাহে সম্মত করাতে। এরপর বোধিসত্ত্ব তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তার উদ্দেশ্য অতি নীচ। সে ইতিমধ্যে বহু কুক্কুটকে ভক্ষণ করেছে এবার বোধিসত্ত্বকেও ভক্ষণ করতে চায়। একথা শুনে সে স্থান ত্যাগ করল।

শাস্তা এরপর তিনটি গাথা বলেন যেগুলির মর্ম হল চতুরা রমণী পুরুষকে প্রলোভিত করে এবং পুরুষ যদি বুদ্ধি করে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা না করে তাহলে অচীরে তাকে অনুতাপে বিদ্ধ হতে হবে। সুতরাং বুদ্ধি করে রমণীর গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা পুরুষের কর্তব্য। না পারলে ঐ কুক্কুটগুলির মত অবস্থা তারও হবে।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই কুক্কুটরাজা।

দ্রষ্টব্য ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩

বেলা ভট্টাচার্য

কুক্কু জাতক (কুক্কু জাতক, ৩৯৬)

শাস্তা যখন জেতবনে ছিলেন তখন রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন।

অতীতে বারাণসী রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁর অমাত্য ছিলেন। রাজা অন্যায় পথে চলছিলেন ও প্রজাদের নিপীড়ন করে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন। রাজাকে সদুপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব একটি উপযুক্ত উপমা খুঁজছিলেন।

একসময় রাজার বাসগৃহটি অসম্পূর্ণ ছিল। ছাদটি তখনও নির্মিত হয় নি। শুধু গোপানসীগুলি (ছাদের এড়ো কাঠ) রাখা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি ঠিকভাবে আবদ্ধ করা হয় নি। ঐ গোপানসীর উপর একটি চূড়া রাখা হয়েছিল। একদিন রাজা গৃহে প্রবেশ করে চূড়াটির দিকে তাকান। পাছে সেগুলি তাঁর উপর পড়ে যায় এই ভয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলেন চূড়ো ও গোপানসীগুলি কিসের উপর অবস্থান করছে। তিনি বোধিসত্ত্বকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। বোধিসত্ত্ব দেখলেন রাজাকে উপদেশ দেওয়ার একটি সুযোগ এসেছে। তিনি বললেন বক্রাকারে ঐ গোপানসীগুলি চূড়াটিকে ধারণ করে আছে এবং সেজন্য চূড়াটি নীচে পড়বে না। এই প্রসঙ্গে তিনি

রাজাকে বললেন অকৃত্রিম মিত্র ও শুদ্ধাচারী অমাত্যদের দ্বারা রাজা যদি পরিবেষ্টিত থাকেন এবং বুদ্ধিমান হন তাহলে চূড়াটি যেমন নিশ্চিতভাবে গোপানসীগুলির উপর অবস্থান করছে সেইভাবে রাজাও সুরক্ষিত থাকবেন। রাজা তখন চিন্তা করলেন চূড়াটি না থাকলে গোপানসীগুলি দৃঢ়ভাবে থাকবে না এবং গোপানসীগুলি চূড়াটিকে ঠিকভাবে ধারণ করে রেখেছে।

গোপানসীগুলি ভেঙ্গে গেলে চূড়াটিও আর থাকবে না। একইভাবে রাজা যদি নিজে অন্যায় করেন তাহলে মিত্র, অমাত্য, প্রজা, সেনা প্রভৃতিকে একতাবদ্ধ করে রাখতে পারেন না। তারা সব দুর্বল হয়ে পড়ে ও রাজাকে সম্যকভাবে রক্ষা করতে পারে না। ফলে রাজা তাঁর প্রভুত্ব ও সম্পদ হারান। একথা মনে রেখে রাজার উচিত ন্যায় পথে চলা। এই সময় কয়েকজন রাজাকে একটি বাতাবিলেবু উপহার দিল। রাজা ওটি বোধিসত্ত্বকে খাওয়ার জন্য দিলেন। বোধিসত্ত্ব বললেন যে সব ব্যক্তি বাতাবিলেবুকে খাওয়ার উপযোগী করতে পারে না ও লেবুর ত্বকটিকে অপসারিত করে না, তারা লেবুটি তিক্ত করে ফেলে এবং তা ভক্ষণের অনুপোযুক্ত হয়। একইভাবে রাজা যদি পীড়নের মাধ্যমে প্রজা ও সুধীজনের কাছে অর্থাদি গ্রহণ না করেন তাহলে সকলে রাজাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে ও রাজার ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

এরপর দুজনে একটি সরোবরের কাছে এলেন। সেখানে একটি পদ্মফুল দেখে রাজা বললেন জলে অবস্থান করেও পদ্মটি সিক্ত নয়। বোধিসত্ত্ব বললেন রাজাদের ও একইভাবে থাকা বিধেয়।

উপসংহারে তিনি রাজাকে বললেন শতদল জলে কি সুন্দরভাবে অসলিল অবস্থায় বিরাজ করে। রাজাও যদি রাজ্যরূপ সরোবরে শুদ্ধচিত্ত, অমল ও অনাবিল হয়ে থাকেন তবে তিনিও শতদলের মত অম্লান হয়ে বিরাজ করবেন।

রাজা এই উপদেশ শ্রবণ করে দানাদি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রজাপালনে রত হলেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৮২-১৮৪

G. P. Malalasekera, DPPN, P. 612.

বেলা ভট্টাচার্য

কুক্কুরবতিক সুত্ত

কুক্কুরবতিক শব্দের অর্থ কুকুরের ব্রত। তবে কুক্কুর হিমবার নিকট একটি প্রস্তর-খণ্ডকেও বলা হয়। এইখানে কোন এক সময়ে বিপস্সি বুদ্ধ ভ্রমণ করেছিলেন এবং এটি পুপফথূপিয়ের পূর্বজন্মের বাসস্থান।

এই সুত্তটি সুত্তপিটকের মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত। বুদ্ধ হলিদ্দাবসন নামে কোলিয়নগরে, গোব্রতিক নগ্ন কোলিয়পুত্র পুন্ন এবং কুক্কুরবতিক অচেল সেনিয়কে দেশনা করেছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে, পুনঃজন্ম স্বরূপ তারা প্রায়শ্চিত্ত করবেন নতুবা গবাদি পশু বা কুকুর হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি চতুঃকর্মের ব্যাখ্যা করেন—

১) কুকর্মের ফল খারাপ হয়।

২) সুকর্মের ফল ভালো হয়।

৩) কু ও সু উভয়ের মিশ্রিত কাজের ফল মিশ্রিত হয়।

৪) কু ও সু নয় এমন কাজের ফলও এদের দ্বারা প্রভাবতি হয় না।

এই সকল সদুপদেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুন্ন ও সেনিয় বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে সেনিয় অরহত্ত্ব লাভ করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ

i) মজ্‌ঝিম নিকায়

ii) G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I.

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

কুটিবিহারী থেরো (কুটিবিহারী স্থবির)

পদুমুত্তর ভগবান যখন আকাশ পথে গমন করছিলেন, তখন কুটিবিহারী স্থবির শীতল জল প্রদানের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধদিকে জল নিক্ষেপ করেছিলেন। ভগবান তখন তাঁর অভিপ্রায় বুঝে আকাশ থেকেই জল গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ জল গ্রহণ করলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করতেন। একদা সন্ধ্যার সময় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলে এক ক্ষেত্রপালের শূন্য তৃণ কুটীরে প্রবেশ করে তৃণের উপর বসেছিলেন। সেখানে ভাবনা করে অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরে ক্ষেত্রপাল খুব আনন্দ লাভ করেছিলেন কারণ তার কুটীর নির্মাণ সার্থক হয়েছিল কারণ আর্য তার কুটীরে স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ G.P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, P-620.
শশধর বড়ুয়া, থেরগাথা, পৃষ্ঠা-৭২]

বেলা ভট্টাচার্য

কুণাল

অশোকাবদানে অশোকের বহু মহিষীর উল্লেখ আছে। অসন্ধিমিত্রা ছিলেন প্রধানা মহিষী। মহাবংশে লিখিত আছে যে, উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থানকালে অশোক দেবী নাম্নী এক শ্রেষ্ঠীকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অশোকের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে অসন্ধিমিত্রার মৃত্যু হয়। এর চার বৎসর পরে অশোক তিষ্যরক্ষিতার পাণিগ্রহণ করেন। সপ্তম স্তম্ভ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে, তিবরের মাতা কারুবাকি অন্য এক মহিষী ছিলেন। অশোকের পুত্রকন্যার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। অশোকাবদানে অশোকের কুণাল নামক এক পুত্রের উল্লেখ আছে। তিষ্যরক্ষিতা চপলা ও অসংযত চরিত্রা ছিলেন। সপত্নীপুত্র পরম রূপবান কুণালকে দেখে তিষ্যরক্ষিতার চিত্ত বিকল হয়। গোপনে কুণালকে একদিন তিষ্যরক্ষিতা তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। ধার্ম্মিক রাজপুত্র বিমাতার কথা শুনে মর্মাহত ও ভীত হলেন। তিষ্যরক্ষিতা ক্রোধ ও হিংসার বশবর্ত্তিনী হয়ে কুণালের সর্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হলেন।

তিষ্য রক্ষিতা ষড়যন্ত্র করে কুণালকে তক্ষশিলার শাসনকর্তারূপে পাঠালেন এবং

কুণালের চক্ষু উৎপাটন করে তাঁকে ও তাঁর পত্নীকে এক গিরিসানুদেশে পরিত্যাগ করবে। তাঁদের যেন অনাহারে মৃত্যু হয়। তিষ্যরক্ষিতা রাজার নামের মোহরাঙ্কিত করে ঐ লিপি তক্ষশিলায় প্রেরণ করেছিলেন। মন্ত্রিগণ এই লিপি পাঠ করে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হলেন। পিতৃভক্ত কুণাল ঘাতককে ডেকে চক্ষু উৎপাটন করে পরে তাঁর পত্নী কাঞ্চনমালার হাত ধরে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন। কুণাল দারিদ্র দুঃখ সহ্য করতে পারছিল না। পরে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে কুণাল সুমধুর বংশীধ্বনিতে বিষাদপূর্ণ গীতি গাইতে লাগলেন। পরে অন্ধকুণাল রাজসমীপে উপনীত হলেন। মহারাজ অশোক তাঁকে স্বীয় পুত্র বলে জানতে পেরে শোকে অভিভূত হলেন। রাজা পুত্রের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিষ্যরক্ষিতাকেই এই সকলের মূল বলে বুঝতে পারলেন। অশোক তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করতে আদেশ দিলেন এবং যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। এক অর্হতের কৃপায় কুণাল দৃষ্টিশক্তি পুনরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কুণালের পুত্রের নাম সম্প্রতি (সম্পাদি)। ইনি জৈন ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বেলা ভট্টাচার্য

কুণাল জাতক (কুণাল জাতক, ৫৩৬)

শাস্তা কুণালহ্রদে অবস্থিতিকালে পঞ্চশত অসন্তোষ পীড়িত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন।

শাক্য ও কোলিকগণ কপিলবস্তু নগরের এবং কোলিক নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তিনী রোহিণী নদীতে একটিমাত্র বাঁধ দিয়ে উভয় তীরে শস্যোৎপাদন করতো। একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ক্ষেতের শস্য শুকাতে আরম্ভ করলো, তখন উভয় নগরের অধিবাসীদিগের কৃষাণেরাই সমবেত হয়েছিল। কোলিকবাসী এবং কপিলবস্তুবাসীদের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে কলহ উপস্থিত হয়েছিল। পরে এটি যুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল। সকলে যুদ্ধ সজ্জা করে সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ করবে, এরূপ স্থির করেছিল। এমন সময় শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেদিন প্রত্যূষকালে, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে— এই চিন্তা করে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখতে পেলেন যে, শাক্য ও কোলিকেরা যুদ্ধার্থ যাত্রা করছে। অনন্তর তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গিয়ে তিনটি জাতক শুনাবেন। তাহলেই এই বিবাদের অবসান হবে। তারপর একতার মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্য দুটি জাতক শুনিয়ে আত্মদণ্ডসূত্র দেশন করবেন। তা শুনে উভয় নগরের অধিবাসীরাই তাঁর নিকট সার্দ্ধদ্বিশত করে কুমার আনয়ণ করবে। তখন শাস্তা ঐ কুমারদের প্রব্রজ্যা দান করবেন এবং তখন মহাজনসমাগম হবে।

এই সিদ্ধান্ত করে শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষাচর্য্যা করতে শুরু করলেন। সায়াহ্নসময়ে প্রত্যাগমনকালে পাত্রচীবর গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধকুটীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তিনি উভয়সেনার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে আকাশে পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করলেন। তিনি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে দেহ হতে ষড়বর্ণ রশ্মি নিঃসারণ করলেন। শাস্তাকে দেখে তারা উভয়েই অস্ত্র ত্যাগ করলো, যুদ্ধ বর্জন করলো।

শাস্তা সমস্ত জেনেও তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাদের আগমণের উদ্দেশ্য কি? তারা সংগ্রাম করার উদ্দেশে সমবেত হয়েছে। তখন শাস্তা বললেন, জলের মূল্য কি? পৃথিবীর মূল্য কি? ক্ষত্রিয় জীবনের মূল্য কি? প্রত্যুত্তরে জানালেন—ক্ষত্রিয় জীবনের মূল্যের ইয়ত্তা নেই। অকিঞ্চিৎকর জলের জন্য অমূল্য ক্ষত্রিয় জীবনের বিনাশ করা উচিত নয়।প্রকৃতপক্ষে কলহের মধ্যে কোন সুখ নাই। এই বলে শাস্তা তাদেরকে স্পন্দনজাতক (৪৭৫) শুনালেন। এরপর শাস্তা আবার বললেন, মহারাজগণ, পরের অনুকরণ করে বলা উচিত নয়। শাস্তা পরিশেষে আত্মদণ্ডসূত্র দেশনা করলেন। এইরূপে শাক্য ও কোলিকগণ শাস্তার নিকট সার্দ্ধদ্বিশত ক্ষত্রিয় যুবক এনে দিল। শাস্তা তাদের প্রব্রজ্যা দিয়ে বৃহৎ বনে গমন করলেন এবং চিন্তা করলেন যে কুণালের ধর্মদেশনাই এদের পক্ষে হিতকর।

অনন্তর শাস্তা পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করলেন এবং সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

কথিত আছে যে, কোন রমনীয় বনভূমিতে কুণালনামক এক পক্ষী বাস করতেন। সেখানে পর্ব্বতসমূহ সর্ব্ববিধ ঔষধি দ্বারা মণ্ডিত থাকতো, সেখানে তরুলতা নানাবিধ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ছিল, সেখানে গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমরী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী বিচরণ করতো। সেখানে বিড়াল গজযূথ বাস করতো। বনের ভূতল সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি শত শত ধাতুদ্বারা রঞ্জিত ছিল।

নানা বর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত ছিল বলে কুণালের দেহ অতি উজ্জ্বল দেখাত। সার্দ্ধত্রিসহস্র পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে কুণালের পরিচর্য্যা করতো। দীর্ঘপথ অতিক্রম করবার জন্য কুণাল যাতে ক্লান্ত ও অবসন্ন না হন, এজন্য দুটি পক্ষীকন্যা একখণ্ড কাষ্ঠের দুপ্রান্ত মুখে ধরে তাঁকে ওটির উপর বসিয়ে উড়ে যেত। পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁর অধোদেশ দিয়ে উড়তো, কারণ তারা মনে করতো কুণাল যদি আসনচ্যুত হয়ে পড়ে যান, তবে তারা পক্ষবিস্তার করে তাঁকে ধরবে। পাছে কুণাল আতপে কষ্ট পান, এজন্য পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁর উপর দিয়ে উড়তো। শীতাতপ, তৃণরজঃ শিশিরাদি কুণালকে কোন কষ্ট দিতে না পারে, এইজন্য তাঁর দক্ষিণ ও বাম, প্রতিপার্শ্বে আরও পঞ্চশত পক্ষিকন্যা থাকতো। পাছে গোপালক, অন্যপশুপালক প্রভৃতি কেহ কাষ্ঠখণ্ড ইত্যাদি দ্বারা কুণালকে প্রহার করে অথবা কোন বলবান্ পক্ষীর সঙ্গে কুণালের সংঘর্ষ ঘটে, এই আশঙ্কায় পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁর পুরোভাগে যেত। কুণাল আসনে বসে যাতে উৎকণ্ঠিত না হন, সেজন্য পঞ্চশত পক্ষিকন্যা তাঁর পশ্চাতে থেকে তাঁর চিত্তবিনোদন করতো। কুণালের ক্ষুধার নিমিত্ত বৃক্ষ হতে বিবিধ ফল আহরণ করে আনতো। এইভাবে প্রতিদিন ঐ পক্ষিকন্যাগণের এরকম সেবা পেয়েও কুণাল তাদের দুর্ব্বাক্য বলতেন।

এরূপে অতীত আহরণ করে শাস্তা পুনর্ব্বার বলতে লাগলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি তির্য্যগ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেও স্ত্রীজাতির অকৃতজ্ঞতা, বহুমায়াবিতা, অনাচারিতা ও দুঃশীলতা জানিতে পারিয়া ছিলাম। আমি তখনও তাহাদের বশে যাই নাই, তাহাদের কেই নিজের বশে আনিয়াছিলাম।" শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পুরাকালে পূর্ণমুখ নামে এক কোকিল আমার সখা ছিল।" অনন্তর ঐ সকল ভিক্ষুর প্রার্থনায় তিনি পূর্ব্ববৎ বলতে লাগলেন ঃ

হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে এক অতি রমনীয় প্রদেশে পূর্ণমুখ নামক এক পুংস্কোকিল বাস করতো। সার্দ্ধত্রিশত পক্ষিকন্যা পত্নীরূপে তার পরিচর্যা করতো। ঠিক কুণালের মত পূর্ণমুখকেও পক্ষিকন্যাগণ খুব সেবা যত্ন করতো। পূর্ণমুখ এজন্য পক্ষিকন্যাগণকে খুব প্রসংশা করতো। একদিন পূর্ণমুখ কুণালের বাসস্থানের নিকট উপস্থিত হলে, কুণালের পরিচারিকাগণ দুর হতে তাকে দেখতে পেল এবং কুণালের বিরূদ্ধে অভিযোগ করলো যে, কুণাল অতি নিষ্ঠুর ও পরুষভাষী। সেজন্য পূর্ণমুখকে বললো—পূর্ণমুখ যদি কুণালকে বলে তাহলে হয়তো কুণাল মিষ্টিভাষী হবে। পূর্ণমুখ চেষ্টা করবে, এই উত্তর দিল। পূর্ণমুখ যথারীতি কুণালকে মিষ্টকথা বলার জন্য অনুরোধ জানাল কিন্তু কুণাল পূর্ণমুখকে খুব তিরস্কার করলো।

এরূপে ভৎসিত হয়ে পূর্ণমুখ সেখান হতে প্রতিগমন করলো এবং অল্পদিন পরে তার কঠিন পীড়া হল ও মৃতপ্রায় হল। পরিচারিকাগণ পূর্ণমুখকে একাকী ফেলে কুণালের কাছে গিয়েছিল। কুণাল তা দেখে তাদের তিরস্কার করেছিল এবং কুণাল নিজে পূর্ণমুখের নিকট গিয়ে তাকে সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছিল। যখন পূর্ণমুখ সুস্থ হয়েছিল তখন পক্ষিকন্যারা ফিরে এসেছিল এবং পূর্ণমুখের সঙ্গে বাস করতে চেয়েছিল। পূর্ণমুখ আর তাদের সঙ্গে থাকতে চায় নি কারণ তার দারুণ বিপদের সময় তারা পূর্ণমুখকে ফেলে চলে গিয়েছিল।

শকুনরাজ কুণাল পূর্ণমুখকে নিয়ে হিমালয়ের মনঃশিলাসনে আসীন হয়ে বুদ্ধলীলায় ধর্ম্মদেশনা করেছিলেন এবং বহু জনসমাগম হয়েছিল। কুণাল জাতিস্মর ছিলেন, স্ত্রীজাতির দোষসম্বন্ধে তিনি অতীতকালে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পূর্ণমুখকে কায়সাক্ষী করে তা বলতে লাগলেন। দ্বিপিতৃকা ও পঞ্চভর্ত্তৃকা কৃষ্ণা ষষ্ঠ পুরুষে আসক্তা হয়েছিল। ষষ্ঠ পুরুষ আবার কবন্ধ সদৃশ একটা পঙ্গু। একটি প্রচলিত গাথা আছে—

অর্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির
সহদেব এই পঞ্চ পতি যে নারীর,
সেই কি না, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,
পাপাচার করে কুব্জমনের সনে।

কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত সেনাবলে বলীয়ান হয়ে কোশলরাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং কোশলরাজের প্রাণসংহার পূর্ব্বক তাঁর সসত্ত্বা অগ্রমহিষীকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে নিজের অগ্রমহিষী করেছিলেন। এই রমনী যথাকালে একটি কন্যা প্রসব করেন। কাশীরাজের কোন ঔরস পুত্র বা কন্যা ছিল না। নবজাত এই কন্যার নাম কৃষ্ণা। কৃষ্ণা ইচ্ছামত পতি বরণ করবে বলে রাজা স্বয়ংবর ঘোষণা করলেন। সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে বহুলোক রাজাঙ্গণে সমেবেত হয়েছিল। কৃষ্ণা পাণ্ডুরাজবংশীয় অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির ও সহদেব—এই পঞ্চরাজপুত্রদের বরণ করেছিল। কৃষ্ণা তাঁদের সঙ্গে এক সপ্তভূমিক প্রাসাদে বাস করতে লাগলো এবং নিজের কামাতিশয় বশতঃ সকলেরই মন হরণ করেছিল।

কৃষ্ণার পরিচারকদের মধ্যে একটা কুব্জ ছিল। তার উপর আবার পঙ্গুও। কৃষ্ণা কামাতিশয়ে পাঁচ জন রাজপুত্রের মন হরণ করেও তৃপ্তিলাভ করলো না, রাজপুত্রেরা যখন বাহিরে যেতেন, তখন সেই অবসরে কামপরবশ হয়ে ঐ কুব্জের সঙ্গেই পাপাচার করতো।

তখন শকুনরাজ কুণাল ছিলেন অর্জ্জুন কুমার; কাজেই কুণাল নিজে এই ঘটনা দেখেছিলেন বলে পূর্ণমুখকে বলেছিলেন।

এইরকম এক শ্রমণী এক মণিকারের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল। বৈনতয়ের ভার্য্যা কাকবতী-নাম্নী এক দেবী সমুদ্রমধ্যে বাস করেও নটকুবেরের সঙ্গে পাপকর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। সুকেশী-কুরঙ্গবী এড়কমারের প্রণয়াসক্তা হয়েও ষড়ঙ্গকুমার ও ধনান্তে বাসিকের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল। ব্রহ্মদত্তের মাতা কোশলরাজকে পরিহার করে পঞ্চালচণ্ডের সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল। সেজন্য কুণাল রমণীদের বিশ্বাস করেন না। নানাপ্রকারে নিজের ধর্মদেশনা পটুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কুণাল বললেন, চারটি বস্তু কার্যকালে অনর্থকারক। এজন্য এদের পরকুলে রাখা অকর্ত্তব্য। বস্তু চারটি এই — বলীবর্দ্দ, ধেনু, যান, ভার্য্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই চারটি বস্তুর সম্বন্ধে নিজের গৃহ সুরক্ষিত রাখবেন। তিনি আরও বললেন, নারীরা চল্লিশটা উপায়ে স্বামীর নিকটে থেকেও পুরুষান্তরকে প্রলুব্ধ করে। এরূপ মহিলা চরিত্রে বহু ব্যভিচার দেখা যায়।

মহাসত্ত্ব এরূপে মহানির্ব্বাণামৃত প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে ধর্ম্মদেশনা সমাপন করেছিলেন। হিমালয়স্থ কিন্নর, মহোরগাদি এবং আকাশস্থ দেবতাগণ সাধুবাদ দিতে লাগলেন। অতঃপর গৃধ্ররাজ আনন্দ, দেবব্রাহ্মণ নারদ ও কোকিলরাজ পূর্ণমুখ স্ব স্ব অনুচরগণসহ যথাস্থানে চলে গেলেন।

এরূপে ধর্মদেশনা করে শাস্তা জাতকের সমাধান করলেন ঃ

তখন কুণাল আমি ছিনু; পূর্ণমুখ
উদায়ী; আনন্দ গৃধ্রগণ অধিপতি
তপস্বী নারদরূপে সারিপুত্র তদা
ছিলেন এ ধরাধামে বুঝি এইরূপ
করিবে সমবধান এই জাতকের।

এখানে স্ত্রী জাতির দোষ ধরা হয়েছে। কাহিনীর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। শুধু দোষই ধরা হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য ঃ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৫খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫৯-২৮৮
G. P. Malalasekera, DPPN, Vol- I, P- 622-623]

বেলা ভট্টাচার্য

কুণ্ডককুচ্ছিসিন্ধব জাতক (কুণ্ডক কুক্ষি-সৈন্ধব জাতক, ২৫৪)

শাস্তা জেতবনে থাকাকালীন সারিপুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। এক বর্ষার দিনে সারিপুত্র ভিক্ষাগ্রহণ মানসে বাইরে যান। তিনি শ্রাবস্তীতে গেলে সেখানকার অধিবাসীগণ বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্ঘকে উপহারদান করতে প্রবৃত্ত হন। ঠিক করা হয় যে ব্যক্তি যতক্ষণ ভিক্ষুকে দান করবেন তাকে ধর্মঘোষক ততজন ভিক্ষু দেবেন। একটি দুঃস্থা বৃদ্ধা একজন ভিক্ষুর জন্য খাদ্য নিয়ে গেলে তাকে বলা হয় সমস্ত ভিক্ষুই দান গ্রহণ করেছে। তবে বিহারে গিয়ে সারিপুত্রকে ভিক্ষা দান করতে পারে। বৃদ্ধা সেই অনুসারে সারিপুত্রকে যথাযথ স্থান প্রদর্শন করে তাঁকে আসনে বসালেন। বৃদ্ধার গৃহে উপনীত হয়ে সারিপুত্র ভিক্ষাগ্রহণ করেছেন। এই সারটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এমন কি রাজা

প্রসেনজিৎ ও সারটি পেলেন। তখন সকলে প্রভূত অর্থ ঐ বৃদ্ধাকে দান করলেন। বৃদ্ধার দেওয়া যাগু গ্রহণান্তে সারিপুত্র তাকে স্রোতাপত্তি ফল প্রদান করলেন। সকলে তাঁর এই বদান্যতার প্রশংসা করলেন। শাস্তা একথা শ্রবণান্তে জানালেন সারিপুত্র পূর্ব্বজন্মেও বৃদ্ধার আশ্রয় হয়েছিলেন ও তার প্রদত্ত খাদ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন তারপর তিনি সেই অতীত কাহিনী বিবৃত করলেন।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব উত্তরাপথে এক বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় পঞ্চশত অশ্ববণিক বারাণসীতে গিয়ে অশ্ব বিক্রয় করত। একদিন জনৈক অশ্ববণিক পঞ্চশত অশ্বসহ বারাণসী যাচ্ছিল। পথে, একটি নিগম গ্রাম (যে স্থলে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য হাট বসে) পড়ে। সেখানে জনৈক প্রাক্তন বিত্তশালী শ্রেষ্ঠীর বাসভবনটিতে অন্তিম বংশধররূপে এক বৃদ্ধা বাস করত। অশ্ববণিক ঐ বৃদ্ধার গৃহটি ভাড়া হিসাবে নিল। সেদিনই তাহার অশ্বদিগের মধ্যে একটি অশ্বিনী একটি শাবক প্রসব করে। বণিক গৃহত্যাগ করার পূর্বে বৃদ্ধাটি তাকে নবজাত অশ্বশাবকটি বিক্রি করার জন্য অনুরোধ করে ও বলে ভাড়ার দেয় অর্থ থেকে শাবকটির বিক্রয়মূল্য নিয়ে নিতে। এরপর বৃদ্ধাটি ভাত, কুঁড়া ও অন্যপশুদের উচ্ছিষ্ট ঘাস প্রভৃতি শাবকটিকে খেতে দেয় এবং পরম যত্নে তাকে লালন পালন করতে থাকে। কিছুদিন পর বোধিসত্ত্ব পঞ্চশতে অশ্ব নিয়ে ঐ বাড়িতে আশ্রয় নেন কিন্তু তাঁহার একটি অশ্বও সৈন্ধব অশ্বপোতকের গন্ধের দরুণ ঘরের ভিতর প্রবেশ করল না। কিছুক্ষণ পর ঐ সৈন্ধব অশ্বশাবকটি ফিরে আসে ও সেটিকে দেখে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারেন তা অতি উচ্চমানের অশ্ব। বৃদ্ধার গৃহ ছাড়বার আগে বোধিসত্ত্ব ঐ অশ্বটিকে ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমে অসম্মত হলেও অশ্বটি উত্তমখাদ্য পাবে এই আশায় বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে অশ্বটি বিক্রি করে দেন। অশ্রুমোচন করে বৃদ্ধা শাবকটিকে বিদায় জানালেন। এরপর স্বগৃহে বোধিসত্ত্ব পরীক্ষা করার জন্য অশ্বটিকে নিকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশন করে এবং শাবকটি তা আহার করতে অস্বীকার করে এবং বলে সে অতি উচ্চজাতের অশ্ব এবং সুখাদ্য আহার তাহার প্রাপ্য। অনন্তর রাজা এসে অশ্বটিকে দেখলেন এবং বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন ঘোটকটি কত দ্রুত ছুটতে পারে তা পরীক্ষা করা হবে। সৈন্ধব অশ্বটি অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটতে শুরু করে এবং তার দুরন্ত গতি প্রত্যক্ষ করে বোধিসত্ত্ব যখন নিজের হস্ত প্রসারিত করলেন তখন ঘোটকটি চার পা একত্রিত করে বোধিসত্ত্বের হস্ততলে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাজাও চমৎকৃত বোধ করলেন ও বোধিসত্ত্বকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করে অশ্বটিকে কেনেন ও পরম যত্নে শাবকটিকে প্রতিপালিত করেন। অশ্বটি সুলক্ষণযুক্ত হওয়ায় সমগ্র জম্বুদ্বীপ রাজার করায়ত্ত হয়। রাজা দানাদির মাধ্যমে পুণ্যার্জন করে, স্বর্গপ্রাপ্ত হন।

কাহিনী শেষে সত্য ব্যাখ্যা স্মরণ করে বহু ভিক্ষু স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী হলেন।

(সমবধান— সেই বৃদ্ধাই বর্ত্তমানের বৃদ্ধা, সারিপুত্র ছিলেন সৈন্ধব-পোতক, আনন্দ ছিলেন রাজা ও আমি ঐ অশ্ববনিক।)

দ্রষ্টব্য : ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৫।

G. P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, Page 624.

বেলা ভট্টাচার্য

কুণ্ডকপুব জাতক (কুণ্ডক-পূপ জাতক, ১০৯)

শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন।

বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্ঘের খাদ্যাদির জন্য শ্রাবস্তীনগরে এক এক সময়ে এক এক ব্যবস্থা হত। কখনও এক এক গৃহস্থ কোকীই ঐ ভার নিতেন, কখনও তিন চার জন গৃহস্থ, কখনও এক একটি সম্প্রদায়, কখনও কোন রাজপথ পার্শ্ববর্তী সমস্ত অধিবাসী, কখনও বা নগরবাসীরা চাঁদা তুলে ভিক্ষুদের ভোজনদানে সন্তুষ্ট করতেন। কোন এক সময়ে রাজপথপার্শ্ববর্তী লোকে সম্মিলিত হয়ে ভোজের আয়োজন করেছিলেন। তাঁরা সংকল্প করেছিলেন যে বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে প্রথমে যাগু পান করিয়ে পরে পিষ্টক দিতে হবে।

ঐ পথের পার্শ্বে এক অতি দরিদ্র ব্যক্তি বাস করতেন। সে চিন্তা করল যে তার যাগু দেওয়ার সাধ্য নেই সেজন্য সে পিষ্টক দিবে। সে তুষ হতে কিছু মিহি কুঁড়া জলে ভিজিয়ে, আকন্দের পাতা দিয়ে জড়িয়ে উত্তপ্ত ভস্মের মধ্যে রেখে পাক করলো। তারপর পিষ্টক প্রস্তুত করে সে স্থির করলো যে সে বুদ্ধকে পিষ্টক দান করবে। সে পিষ্টক হাতে নিয়ে বুদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়ালো।

যখন পিষ্টক পরিবেশনের সময় এল তখন সর্বপ্রথম কুণ্ডক পিষ্টক বুদ্ধকে দিলেন, অন্যান্য সকলেও পিষ্টক দিলেন, কিন্তু ভগবান বুদ্ধ কুণ্ডক পিষ্টক আহার করলেন। ভগবান বুদ্ধ অতিদারিদ্রের কুণ্ডক পিষ্টক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেছেন জেনে রাজ্যে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। সকলে ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করতে লাগলেন এবং ঐ দরিদ্র ব্যক্তিকে অনেক টাকা পয়সা দেওয়ার কথা বলল এবং তার সুকৃতির অংশ দান করতে বললেন। এই সমস্ত কথা সব ভগবান বুদ্ধকে জানালেন এবং ভগবান বুদ্ধ তাকে ধন গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। ক্রমশঃ এই দরিদ্র ব্যক্তি নয়কোটি সুবর্ণের অধিপতি হলেন। এদিকে ভগবান বুদ্ধ নগরবাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে জানিয়ে বিহারে ফিরে গেলেন। পরে ভিক্ষুদের ধর্মপদ প্রদর্শন করে ও উপদেশ দান করে গন্ধকুটীরে প্রবেশ করলেন। রাজা পরে ঐ দরিদ্র ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত করলেন।

ভিক্ষুগণ সমবেত হয়ে বললেন যে, শাস্তা কুণ্ডক পিষ্টক অমৃতজ্ঞানে ভোজন করলেন, দরিদ্রব্যক্তি প্রচুর বিভব লাভ করলো এবং শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত হল। শাস্তা ভিক্ষুদের আলোচনা জানতে পারলেন এবং বললেন, 'কেবল এ জন্মে নয় পূর্ব্বেও যখন ভগবান বৃক্ষদেবতা ছিলেন তখন এই ব্যক্তি কুণ্ডকপিষ্টক গ্রহণ করেছিলেন এবং এই দরিদ্রব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করেছিল। এই বলে তিনি অতীত কথা আরম্ভ করলেন ঃ

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক এরণ্ড বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করছিলেন। গ্রামবাসীরা বৃক্ষদেবতাকে পূজা দিতে লাগলো। এক দুর্গত ব্যক্তিও পূজা দেবে মনস্থ করলো। কিন্তু তার আয়োজিত কুণ্ডক পিষ্টক দেবতা গ্রহণ করবেন না। এই বলে গৃহাভিমুখে যাত্রা করবেন এমন সময় তরুস্কন্ধ হতে বোধিসত্ত্ব বললেন, "ঐশ্বর্য্য থাকলে মধুর খাদ্য দান করতে কিন্তু তুমি খুব দরিদ্র।"

এই কথা শুনে দরিদ্র ব্যক্তি গৃহে না ফিরে পূজা দিল। তার উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে সে পূজা দিল। সে অতি দরিদ্র, যাতে দুঃখ ঘুচে যায় সেই প্রার্থনা করলো। পরে রাজার নিকট শ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত হল এবং সমস্ত অভাব দূর হল।

সমবধান—তখন এই দুর্গত ব্যক্তি ছিল সেই দুর্গত ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম সেই এরণ্ডবৃক্ষ দেবতা।

[দ্রষ্টব্য : ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৪-২১৬।

G. P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, p. 624-625]

বেলা ভট্টাচার্য

কুণ্ডধান থের (কুণ্ডধান স্থবির)

কুণ্ডধান পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে বহু পুণ্য অর্জন করতে লাগলেন। একদা পদুমুত্তর বুদ্ধ সপ্তাহকাল উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ইনি মনোশিলা চূর্ণ ও কদলীফল তাঁকে দান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে এগার বার দেবকুলে রাজত্ব করেন, চব্বিশবার চক্রবর্ত্তী রাজা হন। তারপর কশ্যপ বুদ্ধের সময় ভূমিদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণকুলে এসে জন্ম গ্রহণ করল। তার নাম হল ধান মাণব। ত্রিবেদ শিক্ষা করে বৃদ্ধকালে তিনি ভিক্ষু হলেন। যেই দিন তিনি ভিক্ষু হলেন, সেই দিন হতে এক অলঙ্কৃতা রমনী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করতে লাগলো। ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করলে উপাসিকারা তাকে একবার পিণ্ড দিয়ে বলতেন, 'সহায়িকার জন্য আর একবার গ্রহণ করুন' এই বলে পরিহাস করতো। বিহারে তরুণ ভিক্ষু-শ্রমণেরা উপহাস করতেন—"ধান কোণ্ড জাত হয়েছে।" সেই উপহাস কারণে নাম হল—কুণ্ডধান স্থবির। কুণ্ডধান স্থবির ছোট শ্রমণদের সঙ্গে পরুষবাক্য ব্যবহার করতেন। ভগবান তা জানতে পেরে পূর্ব্বের কৃতকর্মের ফল তা প্রকাশ করলেন। কোশলরাজ স্থবিরের আহারের কষ্ট দেখে চার প্রত্যয়ের জন্য নিমন্ত্রণ করে, সাধনার প্রতি মনোযোগী হতে বললেন। স্থবির রাজার আশ্রয়ে উপযুক্ত ভোজন লাভ করে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হলেন।

[G. P. Malalasekera, DPPN, Vol I, Page - 625]

বেলা ভট্টাচার্য

কুতূহলসালা সুত্ত

কুতূহল শব্দের অর্থ কৌতূহল, বিস্ময় এবং সালা শব্দের অর্থ হলঘর, আশ্রয়।

সংযুত্তনিকায়ে এই সুত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বচ্ছগোত্ত নামে একজন পরিব্বাজক বুদ্ধের কাছে কিছু প্রশ্ন করেন যেমন পূরণকস্সপের মতো অন্যান্য ধর্ম প্রচারকদের পুনঃজন্ম সম্বন্ধে যে মতবাদ বুদ্ধের সেই সম্বন্ধে ভিন্ন মতবাদ কী আছে। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলেন যে, তৃষ্ণা থেকেই পুনঃজন্ম হয়।

বচ্ছগোত্তের মতে, একটি কথোপকথন থেকেই এই আলোচনার উৎপত্তি হয় এবং কিছু পরিব্রাজক কুতূহলসালাতে সম্মিলিত হয়ে এই সুত্তটি আলোচনা করেছিলেন। যদিও বুদ্ধঘোষের মতে সেই সময়ে এই নামে কোনো বিশেষ জায়গা ছিল না, তবে যেখানে এই বিষয়ে আলোচনা হত সম্ভবতঃ সেই জায়গাকেই এই নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল।

[দ্রষ্টব্য :

i) সংযুত্ত নিকায়

ii) Pali —English Dictionary, Rhys Darids and Stede

iii) Dictionary of Pali Proper Names, G. P. Malalasekera, Vol I.

iv) Concise Pali —English Dictionary, A. P. Buddhadattha Thero.]

শাশ্বতী মুৎসুদ্দী

কুদ্দাল-জাতক (কুদ্দাল জাতক, ৭০)

শাস্তা জেতবনে চিত্রহস্ত সারীপুত্র নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেছিলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র শ্রাবস্তী নগরের কোন ভদ্রবংশীয় যুবক। তিনি একদিন হলকর্ষণান্তে গৃহে প্রতিগমন করবার সময় কোন বিহারে প্রবেশ করেছিলেন এবং জনৈক স্থবিরের পাত্র হতে স্নিগ্ধ মধুর ভোজ্যপেয়ের আস্বাদ পেয়ে ভেবেছিলেন, তিনি দিবারাত্র স্বহস্তে নানা কার্য সম্পাদন করেও এরূপ মধুর খাদ্য লাভ করেন না। অতএব তিনিও শ্রমণ হবেন। এই স্থির করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক দেড় মাস কাল একাগ্রচিত্তে ধর্মচিন্তা করলেন, কিন্তু শেষে রিপুপরতন্ত্র হয়ে সংঘত্যাগ করে গেলেন। অতঃপর অন্নকষ্টে তিনি পুনর্বার প্রব্রাজক হয়ে অভিধর্ম শিক্ষা করলেন। এইভাবে ছবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং ছ বার সংসারী হলেন। সপ্তমবার সংসার ত্যাগ করবার পর অভিধর্ম কণ্ঠস্থ করলেন এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে অর্হত্ত্বে উপনীত হলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র এরূপে অর্হত্ত্ব লাভ করলে ধর্ম্মসভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল। এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় জানতে পেরে বললেন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত লঘু ও দুর্দ্দমনীয়। বিষয়বাসনা চিত্তকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে রাখে। এরূপ চিত্তের বশীকরণ অতীব প্রশংসার্হ ও বশীভূত হলে এটি পরম সুখাবহ ও কল্যাণসাধক হয়।

বিষয়ীর চিত্ত রিপু পরায়ণ,
অসার বিষয়ে রত অনুক্ষণ।
হেন চিত্ত যেই বশীভূত করে,
প্রসংশা তাহার করে সব নরে।
চিত্তের দমন সুখের কারণ
কল্যাণ তাহাতে লভে সর্ব্বজন।

চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তা বশতঃ পণ্ডিতেরাও লোভবশতঃ একখানা কুদ্দাল পর্যন্ত ফেলে দিতে পারে না। সেই সামান্য বস্তুর মায়ায় ছবার প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ পূর্বক সংসারী হয়েছিলেন। কিন্তু সপ্তমবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তাঁরা ধ্যানফল লাভ

করেছিলেন এবং লোভ দমনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বলে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন :—

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর "কুদ্দাল পণ্ডিত" নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি কুদ্দালদ্বারা একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করে সেখানে লাউ, কুমড়া, শশা ইত্যাদি উৎপাদন করতেন এবং সেই সমস্ত বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই কোদালি ছাড়া আর কিছু সম্বল ছিল না। একদিন তাঁর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তখন কোদালি খানি লুকিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভোঁতা কোদালির মায়া প্রবল, বার বার তিনি সংসারে আসলেন। তিনি ছয়বার কোদালি লুকিয়ে প্রব্রাজক হলেন এবং ছয়বারই গৃহে ফিরে এলেন।

তিনি এবার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন করে কুদ্দালটি নদীর মধ্যভাগে নিক্ষেপ করলেন। এই কুদ্দালের মায়াতেই বার বার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন। এবার তিনি 'আমি জিতিয়াছি!' 'আমি জিতিয়াছি' বলে তিনবার সিংহনাদ করলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের 'জিতিয়াছি' এই জয়ধ্বনি শুনে—তাঁকে নিকটে ডাকল এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কিসে বিজয়ী হয়েছে। বোধিসত্ত্ব রিপুজয়ী হয়েছে। তখন তাঁর লোকাতীত ক্ষমতা জন্মাল এবং আকাশে আসীন হয়ে রাজাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন —

সে জয়ে কি ফল, পশ্চাতে যাহার আছে পরাজয় ভয়?

যে জয়ের কভু নাই পরাজয় সেই সে প্রকৃত জয়।

ধর্ম্মোপদেশ শুনে রাজার মোহান্ধকার দূর হল, রাজ্যাভিলাষ দূরে গেল, প্রব্রজ্যালাভের বাসনা জন্মিল। রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে গেল এবং প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। বারাণসীবাসীরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। তিনি প্রথমে নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন, পরে অনুচরদিগকে প্রব্রজ্যা দিলেন। কুদ্দাল পণ্ডিত অবশিষ্ট সমস্ত কৃৎস্ন ধ্যান করে ব্রহ্মবিহার প্রাপ্ত হলেন এবং অনুচরদিগের জন্য যথাযোগ্য কর্মস্থান নির্দেশ করে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা সকলেই অষ্টসমাপত্তি লাভ করে ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিল রাজা, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল কুদ্দালপণ্ডিতের অনুচর এবং আমি ছিলাম কুদ্দাল পণ্ডিত।

দ্রষ্টব্য : ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৫

G. P. Malalasekera, DPPN, Vol-I, Page, 629-630

বেলা ভট্টাচার্য

কুন্তনি জাতক (কুন্টনি জাতক) —

জাতক কথার ৩৪৩ সংখ্যক জাতকটি কুন্তনি জাতক। কুন্তনি (কুন্টনি) শ্যেনজাতীয় পাখী। প্রাচীন ভারতে পত্রবাহকের কাজে লাগান হ'ত, এ ধরণের পাখীদের। ঈশান চন্দ্র ঘোষ মহাশয় কুন্তনি পক্ষীকে ক্রৌঞ্চী নামে চিহ্নিত করেছেন। জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে এক ক্রৌঞ্চীকে কৌশল-রাজ দৌত্যে নিযুক্ত করেন। ক্রৌঞ্চীটির দুটি

শাবক ছিল। কোশল রাজ এক সময় ক্রৌঞ্চীকে পত্রবাহক করে অন্যত্র পাঠালে তার অনুপস্থিতিতে রাজপ্রাসাদের কিশোরগণ হস্তপিষ্ট করে শাবককে হত্যা করে। ক্রৌঞ্চী কোশলরাজ্যে ফিরে সব অবগত হয় এবং হত্যাকারী রাজকুমারদের হত্যার দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ঐ সময়ে রাজভবনে একটি হিংস্র প্রকৃতির বাঘ ছিল। ক্রৌঞ্চী রাজপ্রাসাদের বালকসহ বাঘের কাছে গিয়ে অতি কৌশলে তাদের বাঘের পদতলে নিক্ষেপ করে। হিংস্র বাঘটি তৎক্ষাণাৎ বালকদের হত্যা করে। এরূপে ক্রৌঞ্চী তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে হিমালয়ে উড়ে গেল। প্রত্যুপন্নবস্তুর এই ঘটনা ভিক্ষুগণ আলোচনা করতে থাকলে, ভগবান বুদ্ধ অতীতকালেও ক্রৌঞ্চীর তার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ কিরূপে গ্রহণ করেছিল উক্তপ্রসঙ্গে কুন্তণী জাতকের অতীতবস্তু রূপে অবতারণা।

অতীতে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ হয়ে রাজ্য শাসন করতেন। তথা দৌত্যকার্যে তিনি এক ক্রৌঞ্চীকে নিযুক্ত করেন। প্রত্যুপন্ন ঘটনায় অবিকল অতীত বস্তু বিবৃত। তবে অতীত বস্তুর কাহিনীতে বালকদের প্রাণবধ ক'রে রাজভবনে বাস করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে ক্রৌঞ্চী রাজাকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন ক'রে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য উন্মুখ হলেন। বারাণসীর রাজা বোধিসত্ত্ব, ক্রৌঞ্চীকে সকল কথা ভুলে মিত্রভাবে রাজ প্রাসাদেই থাকার অনুরোধ করলেও উক্ত পরিস্থিতিতে বাস করা সমীচীন নয় বলে রাজাকে প্রণাম করে অবশেষে হিমালয় পর্বতাঞ্চলে উড়ে গেলেন।

কাহিনীটির সমবধান অংশে বারাণসী-রাজ যে বর্তমান কাহিনীর ভগবান বুদ্ধ এবং ক্রৌঞ্চী যে অতীত কাহিনীর ক্রৌঞ্চী ছিল তাহা বিবৃত হয়েছে।।

Fausboll, Jataka Vol III (P.T.S. Edition) London; ঈশান চন্দ্র ঘোষ জাতক ৩য় খন্ড, G.P. Malalasekara P.P.N. Vol- I

সাধনচন্দ্র সরকার

কুমার সুত্ত

অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থের সংখ্যক সুত্ত। সূত্তকথায় লিচ্ছবী বংশীয় মহানাম ক্ষত্রিয় কোন এক সময়ে মহাবনস্থ এক পাদপমূলে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে উপবিষ্ট কয়েকজন লিচ্ছবী যুবকদের দেখতে পান। লিচ্ছবীরা স্বভাবতঃ দুষ্ট প্রকৃতির ও ক্ষতিকারক বলে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁদের সহাবস্থান মহানামের প্রীতি সঞ্চার করে। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ বনে পাঁচটি ধর্ম আচরণ করলেই লিচ্ছবী কুমারদের অভ্যুদয় ও উন্নতি হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। এই পাঁচটি আচরণীয় ধর্ম হল — (১) পিতামাতাকে সেবা করা, (২) স্ত্রী ও পুত্রদের ভরণ পোষণ করা এবং সৎভাবে উপার্জিত অংশের দায়াদ করা, (৩) নিজের কাজের প্রতি অনুরক্ত ও তৎপর থাকা, (৪) পারিবারস্থ পিতৃ-পিতামহাদি-সেবিত কুলজ দেবতাগণের সম্মান প্রদর্শন এবং (৫) সজ্জন ও পুণ্যবানদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খন্ড, পি. টি. এস. সংস্করণ G.P. Malalasekera. P.P.N.I.

সাধনচন্দ্র সরকার

কুমারকস্‌সপ থের —

পালি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক বর্হিভূত গ্রন্থে বিবৃত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে 'চিত্রকথিক'-দের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপে তিনি বর্ণিত। কুমার কসসপের জীবন ইতিহাস ও তাঁর নামকরণটিও বৈচিত্র্যময়। জাতকের (১৪৮) বর্ণনানুযায়ী কুমার কসসপের মাতা ছিলেন রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠিকন্যা। তিনি কুমারী অবস্থাতেই বৌদ্ধ ভিক্ষুণী জীবন গ্রহণ করতে উৎসুকা হলেও পিতামাতার অনুমতির অভাবে বিবাহ করেন এবং বিবাহন্তে স্বামীর অনুমতি ক্রমে আপন্নসত্তা অবস্থায় ভিক্ষুণী জীবন বরণ করেন। বৌদ্ধ সংঘে কালক্রমে তার গর্ভে সন্তান ধারণের সংবাদ দেবদত্ত জেনে কুমার কসসপের মাতাকে দুষ্ট চরিত্রের নারী রূপে প্রচার করেন। বুদ্ধ এই ব্যাপারটির যাথার্থ্য জানার জন্য উপালিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। শ্রাবস্তী নগরের অন্যতমা বৌদ্ধ উপাসিকা বিশাখার সাহায্যে আনন্দ প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেন শ্রাবস্তীর রাজার সম্মুখে এবং তাঁহার নির্দোষিতা প্রমাণান্তে বুদ্ধদেব তাঁকে সংঘেই স্থান প্রদান করেন। কুমার জননী তাঁর কুমারকে প্রসব করলে রাজা কুমারের পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁর নাম 'কুমার' রাখা হল এবং এই কুমার সপ্তবর্ষে উপনীত হলে সংঘে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁর নাম কুমার হয় কারণ তিনি কুমার অবস্থাতেই সংঘে প্রবেশ করেন। ভগবান বুদ্ধ ও প্রীতিবশতঃ কুমারকে ফলাদি প্রেরণকালে কুমার কস্‌সপ নামে তাঁকে অভিহিত করেন।

কুমারকস্‌সপ এক সময় অন্ধবনে ধ্যানশীল হলে কসসপ বুদ্ধের সমকালীন সহচর জনৈক 'অনাগামী ব্রহ্মা কুমারের সম্মুখে' উপস্থিত হন এবং পনেরটি প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করেন, এই প্রশ্নগুলি উত্তর একমাত্র বুদ্ধগণের পক্ষেই প্রদান সম্ভব ছিল। পালি মজ্ঝিম নিকায়ের ধম্মিক সুত্তের পর্যালোচনা কালে কুমার কসসপ অর্হত্ত্ব লাভ করেন। এই সুত্তটি শুনে কুমার কসসপের জননীও প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করেন এবং পরিশেষে অর্হৎ হন।

অপদান গ্রন্থতে বর্ণিত যে কুমারকস্‌সপ পদ্মোত্তর বুদ্ধের কালে এক পন্ডিত ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন এক জ্ঞানী ও সুবক্তা বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখে তাঁর মত হওয়ার মানসে বহু দানধ্যান করেন। কালক্রমে কস্‌সপ বুদ্ধের বাণী অবলুপ্ত হওয়ার কালে কুমার কস্‌সপ অপর ছয়জন সহচর বন্ধুসহ সংঘে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং পর্বতশিখরে কঠোর শীলব্রত পালন করেন।

থেরগাথাতে কুমারকস্‌সপ সংকলিত গাথা উচ্চারিত হয়। এই গাথাগুলি বৌদ্ধ দর্শন চিন্তায় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁকে সুবক্তা রূপে বলা হলেও কুমার কস্‌সপ উচ্চারিত গাথা বেশি নই। মনোরথপূরণীগ্রন্থের বিবরণে তিনি পায়াসীর সঙ্গে ধর্মীয় যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে লিপিবদ্ধ। কিন্তু টীকাকার ধর্মপাল (ধম্মপাল) এই তথ্যটি যথার্থ বলে মনে করেন না। কারণ পায়াসী সুত্তটি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণান্তে উদ্দিষ্ট হয়েছিল বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। বিনয়পিটকে বর্ণিত যে তিনি তাঁর বিংশতিবর্ষে উপসম্পদা লাভ করেন যা ছিল বিনয় বিরুদ্ধ। বিংশতি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় পরই সামণেরগণ, উপসম্পদা লাভের যোগ্য হন। তাঁর ক্ষেত্রে এই সময়টি গর্ভকাল হইতে বুদ্ধের নির্দেশই নির্ণিত হয়।

অঙ্গুত্তর নিকায় ১, মধ্যম নিকায় ১, জাতক ১৪৮ সংখ্যক। মনোরথপূরণী ১, থেরগাথা, ধম্মপদট্ঠকথা ১, অপদান ২, বিনয়পিটক-১। P.P.N I

সাধনচন্দ্র সরকার

কুমাররজীব

চীনা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অন্যতম বিশিষ্ট অনুবাদক। তাঁর পিতা মধ্য এশিয়ার কুচায় ভারতবর্ষ থেকেই গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই সূত্রে মধ্য এশিয়ার কুচাই তাঁর জন্মস্থান। কুমারজীব যৌবনকালে কাশ্মীর আসেন ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য এবং প্রথমে সর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে পরে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অনেক গ্রন্থই চীনাভাষায় অনুবাদ করে লুপ্ত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির উদ্ধারে বিশেষ সাহায্য করেন।

চীনা সম্রাট খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকে কুচা নগরী আক্রমণ করেন। কুচা নগরীর আত্মসমর্পণের পর কুমারজীব বন্দী অবস্থায় চীনে প্রেরিত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও চীনাগণ তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতির জন্য তাঁকে শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি চীনা ভাষায় পঞ্চাশোর্দ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁকে চীনাগণ একটি বিশেষ বক্তৃতাগৃহ প্রদান করেন। তাঁর প্রায় ত্রিসহস্রাধিক শিষ্য ছিল বলে জানা যায়। চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলি মধ্যে বিনয়পিটক, ব্রহ্মজাল সূত্র, বজ্রচ্ছেদিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা, গণ্ডব্যূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

ইতিহাস অভিধান (ভারত) যোগনাথ মুখোপাধ্যায়; Studies in the Buddhistic Culture of India, L. M. Joshi; A History of Indian Literature Vol II

সাধনচন্দ্র সরকার

কুমার পঞ্‌হ

পালি সুত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দকপাঠের চতুর্থ অধ্যায় 'কুমারপঞ্‌হ' নামে শীর্ষিত। খুদ্দকপাঠ ও থেরগাথা অর্থকথানুযায়ী কুমারপঞ্‌হ বা কুমারপ্রশ্ন দশটি প্রশ্নসম্বলিত একটি অধ্যায়। ভগবান বুদ্ধ কেবলমাত্র সপ্তবৎসর বয়ঃকালে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত সোপাককে উপসম্পদা ব্রতের ধারণা প্রদান কালে দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বালক-অর্হৎটি এই দশটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করেন। বুদ্ধের সহিত সোপাক এই দশটি প্রশ্নের কথোপকথনই কুমারপঞ্‌হ নামে অভিহিত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত যে কজঙ্গলার ভিক্ষুণীগণ এই দশটি প্রশ্ন বিস্তারিত ভাবে জানতেন। অম্বলট্ঠিকা-রাহুলোবাদ সুত্তের টীকা গ্রন্থ পপঞ্চসূদনীতে একগুচ্ছ প্রশ্ন সপ্তবর্ষীয় রাহুলকে উপদেশচ্ছলে যে উপদেশ বুদ্ধ প্রদান করেন তাহাও কুমারপঞ্‌হ নামে পরিচিত।

খুদ্দকপাঠ (পি. টি. এস.)
খুদ্দকপাঠ অট্‌ঠকথা
থেরগাথা অট্‌ঠকথা

থেরগাথা মজ্ঝিম নিকায় ২
অঙ্গুত্তর নিকায় ৫
P.P.N I

সাধনচন্দ্র সরকার

কুম্ভজাতক

জাতকঅট্ঠকথার অর্ন্তগত ৫১২ সংখ্যক জাতক। এই জাতকটির কাহিনীতে সুরার (মাদক দ্রব্যের) উৎপত্তিও সুরার প্রভাব জনিত দোষগুলি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। জাতকের প্রত্যুপন্ন (পচ্চুপ্পন্ন) অংশে বৌদ্ধ উপাসিকা বিশাখার পাঁচশত সখীদের যে অবস্থা হয়েছিলে সেই প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে ব্যাখ্যা কালে কাহিনীটি বিবৃত করেন। প্রত্যুপন্ন কাহিনীতে জানা যায় যে শ্রাবস্তী নগরীতে এক সময় সুরোৎসব দিবস, ঘোষিত হলে বিশাখার পাঁচশত সখী সুরাপান করে আনন্দোৎসবে মত্ত হন। বিশাখা সুরাপানে বিরত থাকেন। বিশাখা ভগবান বুদ্ধকে সন্ধ্যায় মহাদান দিতে শ্রাবস্তীর জেতবনস্থ বিহারে গমন করলে তাঁর সখীরাও মত্ত অবস্থায় বিশাখার সঙ্গে বিহারে যান এবং প্রমত্ত অবস্থায় নৃত্যাদি ও অশোভন আচরণ করেন। শাস্ত্রা সখীদের সচেতন করার জন্য মহাঋষিবলে ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি করে তাঁদের মরণভয়ে ভীত করেন। জগতের নশ্বরতাভাবের অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁদের ভৎর্সনা করেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণান্তে সখীরা সকলেই স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। বিশাখা তখন শাস্ত্রাকে সুরাপান কুপ্রথার উৎস ও তা নিবারণ করার জন্য প্রার্থনা করলে অতীতবস্তুতে বিবৃত কুম্ভজাতকটি বর্ণনা করেন।

এক সময় বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শাসনকালে কাশীরাজ্যের সুর নামে জনৈক বনেচর বিক্রয়োপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য হিমালয় পর্বতে গমন করেন। সেখানে এক বিশাল বৃক্ষের কোটরে জমা বৃষ্টিজলের সঙ্গে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার মিশ্রিত হয়ে প্রাকৃতিক ক্রিয়া বিক্রিয়ায় এক সুরাসার সৃষ্ট হয়। এই সুরাসার পিপাসার্ত পক্ষী ও পশুরা পানান্তে নিদ্রাচ্ছন্ন হত। বনেচরটি পশুপাখীদের অবস্থান্তর দেখে পানীয় রসমিশ্রণটি পান করে মত্ত হয়ে মাংসাদি প্রায়ই ভক্ষণ করতে লাগলেন। ঐ বনের সন্নিকটে বরুণ নামক এক তাপস বাস করতেন। বনেচর কর্তৃক উদ্বেজিত হয়ে সেই তাপস ঐ তরল মিশ্রণ পান করে তৃপ্ত হলেন। সুর ও বরুণের নামে ঐ পানীয়ের নাম 'সুরা-বারুণী' হল।

অতঃপর বনেচর ও তাপস নগরে বাঁশের নালিতে ঐ তরল মিশ্রণ নিয়ে নগরে গেলেন। রাজা তাঁদের কাছ থেকে ঐ সুরা গ্রহণ করে পানাসক্ত হলেন। রাজা ঐ রসের উৎসস্থল হিমালয়ের এক বৃক্ষ জেনে নগরবাসী সহ সেই সুরা সংগ্রহ করলেন। ক্রমশঃ নগরবাসীরা পানাসক্ত হওয়ায় সকল কর্ম অবহেলা করে নগরটিকে কর্মশালায় রূপান্তরিত করল। অতঃপর নগরের সর্বনাশ ঘটলে শৌণ্ডিকদ্বয় শ্রাবস্তীতে পালিয়ে সেই জায়গা থেকে সাকেত নগরে প্রবেশ করল। তখন শ্রাবস্তীতে সর্বমিত্র নামক এক নৃপতি ছিলেন। তিনি ঐ সুরায় প্রভাব ও বিষময় ফল জেনে ঐ মাতাল দুটির শিরশ্চেদ করান। কিন্তু ঐ সুরা যে বিষ নহে তা অবগত হয়ে রাজা সর্বমিত্র নিজেও অবশেষে ঐ সুরাপানাসক্ত হলেন। দেবরাজ শক্র দিব্যদৃষ্টিতে শ্রাবস্তীরাজের সুরাপানের আসক্তির

কথা অবগত হয়ে জম্বুদ্বীপকে সুরাপান ফলের সর্বনাশ থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা নিলেন। তিনি তখন সুরাপূর্ণ এক কলস নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজা সর্বমিত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে সুরার দোষ প্রদর্শন পূর্বক কয়েকটি গাথা উচ্চারণ করলেন। এই গাথা গুলিতে সুরাপানের কুফল গুলি ব্যক্ত হওয়ায় রাজা সুরার অনিষ্টকারকতার কথা উপলব্ধি করলেন। তখন শক্র তাঁর নিজরূপে প্রকাশিত হয়ে রাজাকে সুরাপান থেকে নিবৃত্ত করে শীল পালনে উদ্বোধিত করে স্বর্গে প্রত্যাগমন করলেন। এতদসত্ত্বেও সেইদিন থেকে জম্বুদ্বীপে সুরাপান নিবৃত্ত করা গেল না।

ভগবান বুদ্ধ সমবধান অংশে নিজেকে শক্র এবং আনন্দকে রাজা সর্বমিত্র রূপে চিহ্নিত করলেন। আর্যশূরের জাতকমালা গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে কুম্ভজাতক সংস্কৃত ভাষায় দৃষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী

Jātaka, Ed. Fausboll, Vol-V, P.P.N. I, Ed. G.P. Malalasekera
Jātakamalā, J.S. Speyer (Translation)

সাধনচন্দ্র সরকার

কুরু

পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার গর্ভে এবং চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে পুরূরবার জন্ম। পুরূরবার বংশে পুরু, ভরত, কুরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই কুরুর বংশধরগণ কুরু বা কৌরব নামে খ্যাত হন। মহাভারতের কুরু বংশের কথা কিংবদন্তী বলা হলেও বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য আলাদা কুরুবংশের কথা ঋগবেদে উল্লেখ না থাকলেও কুরুশ্রবণ ও কৌরায়ণ শব্দ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পঞ্চালকুলের সঙ্গে কুরুকুলের নাম পাওয়া যায়। উক্ত ব্রাহ্মণে কুরু, পাঞ্চাল, রণ ও উশীনর—এই চারটি কুলকে 'মধ্যমাদিশের' অধিবাসী বলা হয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন কুরুকুলের একাংশ হিমালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে 'উত্তরকুরু' পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি কাল্পনিক অঞ্চল মাত্র। মহাভারত ও পুরাণানুযায়ী পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় কুরুবংশীয় ছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে কুরু দেশ ও বংশের উল্লেখ আছে। দীঘনিকায় নামক বৌদ্ধগ্রন্থে কুরু দেশ ও বংশের উল্লেখ আছে। দীঘনিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে কুরু বুদ্ধকালীন সময়ে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম বলে বর্ণিত। কুরু দেশের নাম হয় জনৈক ক্ষত্রিয় প্রধান রাজকুমার থেকে। দীঘনিকায় এবং মজ্ঝিম নিকায়ের অর্থকথায় আচার্য বুদ্ধঘোষ মনে করেন দেবপুত্র মান্ধাতা দেবলোক ও চর্তুমহাদ্বীপ অবলোকনের সময় জম্বুদ্বীপে অবতরণ করেন; জম্বুদ্বীপে তাঁর দলবলসহ তিনি কুরুরাষ্ট্রেই অবস্থান করেছিলেন। কুরু রাজ্য বহু নগর ও গ্রামে পরিপূর্ণ ছিল। কুরু রাজ্যের সঙ্গে পাঞ্চাল ও কেকক রাজ্যের একই সঙ্গে উল্লেখ দৃষ্ট।

জাতকের (৪৮৪) কাহিনী অনুযায়ী ইন্দপত্ত (ইন্দ্রপ্রস্থ) ছিল কুরুরাজ্যের রাজধানী। কুরুরাজগণের মধ্যে ধনঞ্জয় কৌরব্য বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের সময় কুরু রাজ্যের প্রধান ক্ষত্রিয় বীর কৌরব্য ছিলেন। মজ্ঝিম নিকায়ের রট্‌ঠপাল সুত্তে কুরুবংশের

উল্লেখ রয়েছে। কুরুবংশীয় জনসাধারণ তাঁদের প্রজ্ঞা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ কুরুগণের নিকট মহানিদান এবং মহাসতিপট্‌ঠান সুত্ত প্রচার করেন। অন্যান্য ভাষিত সুত্তগুলির মধ্যে ছিল মাগন্দিয়সুত্ত, সম্মোসসুত্ত এবং অরিয়বাস সুত্ত। প্রতিটি সুত্তই কুরুরাজ্যের কম্মাসসধম্ম নামক নিগমে উপদিষ্ট হয়।

কুরু জনপদটি সাধারণতঃ থানেশ্বরের চারপাশের জেলাগুলি নিয়ে সংগঠিত ছিল। ইন্দপত্ত ছিল এর রাজধানী যাকে বর্তমান দিল্লী বলা যায়।

গ্রন্থপুঞ্জী

ভারতকোষ; PPNI

সাধনচন্দ্র সরকার

কুরুঙ্গমিগ জাতক

জাতকট্ঠকথায় কুরঙ্গমিগজাতক নামে দুইটি জাতক রয়েছে। একটি প্রথম খণ্ডে (২১ সংখ্যক) এবং অপরটি ২য় খণ্ডে (২০৬ সংখ্যক)। এই জাতকদ্বয়ের প্রত্যুৎপন্ন অংশ থেকে জানা যায় ভগবান বুদ্ধের বর্তমান জাতিতে দেবদত্তের শত্রুতার কথা পূর্বে জন্মেও যে ছিল, উক্তপ্রসঙ্গে জাতকের অতীত বস্তুদ্বয়ের কথন। উভয়ক্ষেত্রে দেবদত্ত কর্তৃক বিরোধিতা বা শত্রুতার কথা ব্যক্ত হয়েছে যদিও কাহিনীদ্বয় ভিন্নতর।

প্রথমটির অতীতবস্তুতে বিবৃত কাহিনী হল : অতীতে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বনে বনে ফলমূল খেয়ে ঐ মৃগটি জীবনধারণ করতেন। একসময় ফলান্বেষণে সপ্তপর্ণী বৃক্ষের মূলে গমনের সময় দূর থেকে মৃগবধনিমিত্ত গাছের মাচায় উপবিষ্ট এক শিকারী ব্যাধক পদচিহ্ন দেখতে পান। তিনি সকল ব্যাপার উপলব্ধি করে সপ্তপর্ণীর বৃক্ষতলে গমন না করে বুদ্ধিবলে বৃক্ষকে সম্বোধন করে জানালেন যেহেতু ঐ বৃক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবে তার আহার্য ফল পতন হয়নি সেহেতু অন্য বৃক্ষতলে আহার্য্যের জন্য গমন করবেন এবং গূঢ়ার্থবিশিষ্ট একটি গাথা উচ্চারণ করলেন। ব্যাধ মৃগটি হাতছাড়া হতে চলেছে জেনে অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বুদ্ধিবলে বোধিসত্ত্ব কুরুঙ্গমিগ অস্ত্র-প্রহার এড়িয়ে ব্যাধের উদ্দেশে বললেন যে সে তাঁর কৃতকর্মের ফল বশতঃ অষ্ট মহানরকে তথা ষোড়শ উৎসাদনরকে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন কুরুঙ্গমিগ এবং ব্যাধটি ছিল দেবদত্ত।

দ্বিতীয় জাতক কাহিনীর অতীতবস্তু দেখা যায় যে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের শাসনকালে একটি কুরঙ্গমৃগ তাঁর বন্ধু শতপত্র নামে এক পাখী এবং এক কচ্ছপের সাহচর্যে এক সরোবরের নিকট থাকতেন। কোন এক সময়ে এক ব্যাধ বোধিসত্ত্বের পদচিহ্ন অনুসরণ করে একটি অচ্ছেদ্য চামড়ার জাল বিছিয়ে রাখে বোধিসত্ত্বকে জালবন্দী করার জন্য। রাত্রে বোধিসত্ত্ব সরোবরে জলপানার্থ গমন করলে জালবদ্ধ হন। তাঁর করুণ আর্তনাদ শুনে বৃক্ষস্থিত শতপত্র এবং সরোবরস্থ কচ্ছপটি তাঁকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তাব দেন।

তাদের পরিকল্পনানুযায়ী কচ্ছপটি তাঁর দাঁতের সাহায্যে চর্মনির্মিত পাশটি ছিন্ন করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু অতি শক্ত পাশটি ছেদন করার সময় তার দাঁতগুলি রক্তাক্ত হয়। প্রত্যুষকাল পর্যন্ত ছেদন করা সত্ত্বেও অবশেষে শেষ বন্ধন ছেদন করার সময়

ব্যাধ শস্ত্র নিয়ে মৃগটিকে বধের নিমিত্ত সামনের দরজা দিয়ে অগ্রসর হলে শতপত্র পক্ষীটি তার মুখে আঘাত করে। এতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে পরে পেছনের দরজা দিয়ে আবার ব্যাধটি মৃগবধে অগ্রসর হলে আবার শতপত্রটি মুখে থাবা বসালে ব্যাধটি অশুভ লক্ষণ মনে করে। শিকার গ্রহণে পুনরায় নিবৃত্ত হয়।

অবশেষে সূর্যোদয়ে ব্যাধটি শক্তি নিয়ে মৃগকে হত্যা করতে আসার সময় কচ্ছপটি শেষের রজ্জু-বন্ধনটি ছিন্ন করে ক্লান্তিবশতঃ চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলে। ব্যাধ সহজেই কচ্ছপটিকে থলিতে ভরে রাখল। অপরদিকে কচ্ছপকে মুক্ত করার আশায় মৃগটি ব্যাধের নিকট উপস্থিত হয়। ব্যাধ মৃগটি ধরার আশায় কচ্ছপটি থলে-তে রেখে মৃগটির পেছনে দৌড়ালে মৃগটি গতিবেগে তাকে পরাস্ত করে থলেতে রেখে দেওয়া কচ্ছপটিকে মুক্ত করল। কচ্ছপটি তৎক্ষণাৎ জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং বোধিসত্ত্ও শতপত্রকে বৃক্ষটি পরিত্যাগ করে প্রাণ বাঁচবার পরামর্শ দিলে পাখীটি তার সন্তানসন্ততি-সহ অন্যত্র আশ্রয় নিয়ে প্রাণরক্ষা করল। এইভাবে তিনজনেই ব্যাধের হাত থেকে মুক্তি পেলেন। ব্যাধ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় থলি ও কচ্ছপটিকে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত হতাশ হল। এই তিনটি প্রাণই আপন আপন কর্মফলবশতঃ গতি প্রাপ্ত হলেন।

সমবধান অংশে দেবদত্তকে ব্যাধরূপে এবং মৃগটিকে বুদ্ধদেব রূপে সনাক্ত করা হয় কাহিনীতে।

গ্রন্থপঞ্জী

Jātaka, Vol I & II, Ed. Faunsboll; PPN Vol I Ed. G.P. Malalasekera.
ঈশানচন্দ্রঘোষ। ১ম ও ২য় খণ্ড।

সাধনচন্দ্র সরকার

কুলাবক জাতক

জাতককথার ৩১ সংখ্যক জাতক। একসময় মঘ নামে গৃহপতি মচল গ্রামে বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐ গ্রামে অন্যান্য ঊনত্রিশটি পরিবারের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতেন। এই গৃহস্থ পরিবারগুলি সমাজের বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে ব্যাপৃত ছিল। গ্রাম-প্রধানের লভ্যাংশ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় রাজাকে তিনি মিথ্যার আশ্রয়ে মঘ গৃহপতির বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ক্রুদ্ধ রাজা মঘ এবং তাঁর মিত্রবর্গকে হস্তী পদপিষ্ট হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু "মৈত্রী - বল" যুক্ত মঘ এবং তাঁর বন্ধুদের হত্যা করতে অক্ষম হয়ে রাজা তাঁদের বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেন। আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুরপর তাঁরা সকলেই ত্রায়স্ত্রিংশে (তাবতিংস) স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। মঘ জন্মালেন দেবরাজ শক্র (সক্ক) রূপে। মঘের তিনজন স্ত্রী—সুধর্মা (সুধম্মা), চিত্রা (চিত্তা) এবং নন্দা ও শক্রের পরিচারিকারূপে জন্মালেন তাঁর কুশলকর্মে সহায়তা করার জন্য। সুজাতা নামে অন্য এক মহিলা তাঁদের কুশলকর্মে অংশগ্রহণ না করায় তিনি শক্রের পরিচারিকার সম্মান লাভ থেকে বঞ্চিত হলেন। সেইসময় অসুরগণ তাবতিংসে স্বর্গের একদেশ দেবতাদের সঙ্গে একত্র ভোগ করছিলেন। একসময় অসুরগণ সুরাপানে মত্ত ও আচ্ছন্ন হলে শক্র তাঁদের সুমেরু (সিনেরু) পর্বতপাদদেশে নিক্ষেপ করেন। শক্রের এই আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে অসুরগণ দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে শক্রকে রণে পরাজিত করেন। শক্র তখন তাঁর বৈজয়ন্ত রথে চড়ে সমুদ্র অতিক্রান্ত করে পলায়ন

করেন। তাঁর পলায়ন পথে এক শিম্বলিবনের সংঘে সংযোগের ফলে তাঁর রথটি বৃক্ষগুলিকে ধ্বংস হয়। শিম্বলী-বৃক্ষস্থিত গরুড় পাখীর শাবকগুলিও সাগরে পাতিত হয়। শাবকগুলির আর্তনাদ শুনে শক্র তাঁর সারথি মাতলীকে রথটি ঘুরিয়ে শাবকদের নিকট পৌঁছাতে বলেন। অসুরগণ শক্রের রথকে ফিরে আসতে দেখে অন্য এক শক্র অস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে আক্রমণার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করেছেন এই ভ্রান্ত অনুমান-বশতঃ ভয়ে পলায়ন করেন। সেইসময় দৈববলে শক্রের বৈজয়ন্ত প্রাসাদটি ভূমি থেকে উঠে আসে এবং শক্র সেখানেই পাঁচ প্রকার সৈন্যদ্বারা সুবেষ্টিত হয়ে বসবাস করতে থাকেন।

এই অতীতবস্তু কাহিনীটি প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর কোন এক ভিক্ষু জল না ছেঁকে পান করার জন্য তাঁকে উপদেশপ্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ জাতক কাহিনীটি বিবৃত করেন। সমাবধান অংশে আনন্দকে মাতলি এবং নিজেকে শক্র রূপে ভগবান্ বুদ্ধ চিহ্নিত করেন।

ধম্মপদের অর্থকথায় উল্লিখিত যে লিচ্ছবী মহালি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধদেব মঘজাতকটি বর্ণনা করেন। ধর্মপদ অর্থকথা অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব শক্রের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কাহিনীটি ভিন্নরূপের। এই কাহিনীতে সুজাতা অসুররাজ বেপচিত্তির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুজাতা স্বামী রূপে শক্রকে কামনা করায় শক্র ছদ্মবেশে অসুরগণের সভায় যান এক বৃদ্ধ অসুরের রূপ নিয়ে। সুজাতা তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করলে শক্র নিজরূপে আবির্ভূত হন এবং সুজাতাকে নিয়ে রথে চড়ে বসেন। অসুরগণ উক্ত প্রসঙ্গেই শক্রকে আক্রমণ করতে পশ্চাদ্ধাবন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

P.P.N.I. G.P. Malalasekera.
জাতক ১ম, ঈশানচন্দ্র ঘোষ
বিনয়পিটক - ১, ১৯৮, পি. টি. এস.
ধম্মপদট্ঠকথা — ৩য় খণ্ড, পি. টি. এস.

সাধনচন্দ্র সরকার

কুল্লথের

পালি থেরগাথায় বর্ণিত জনৈক স্থবির। তিনি পূর্বজীবনে শ্রাবস্তীর ভূস্বামী ছিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণান্তে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করেন। পূর্ববাসনাবশতঃ তিনি প্রায়ই কবরস্থানে গমন পূর্বক বুদ্ধদেশিত পন্থায় ধ্যানরত হতেন এবং তাঁর এই অভ্যাস স্খলন করা সম্ভব না থাকায় ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং কবরস্থানে গিয়ে তাঁর চারিদিকের শবগুলির পচনধর্মতা ও বিনশ্বরশীলতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর কুল্লথের ভগবানের উপদেশ শ্রবণান্তে প্রথম ধ্যানস্তর প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। থেরগাথাতে কুল্লথেরের এই অনুভূতিগুলি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

থেরগাথা
P.P.N.I. G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কুষাণ

যে সকল বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল তাদের মধ্যে কুষাণবংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কুষাণবংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। চীনদেশীয় ঐতিহাসিকদের রচনায় যেমন— সু-মা-কিয়েন সংকলিত সি-চি (ঐতিহাসিক দলিল), প্যান-কু রচিত ছিয়েন-হান-সু (প্রথম হানবংশের ইতিহাস), ফ্যান-ই রচিত হাউ-হান-সু (পরবর্তী হানবংশের ইতিহাস) এবং মা-তোয়ামলিন রচিত বিশ্বকোষে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) কুষাণ জাতির পরিচয় জানতে পারা যায়। তাছাড়া স্ট্রাবো, জাস্টিন, বর্দেসানিস, অম্মিয়ানুস, মার্সেলাইনুস প্রভৃতির গ্রন্থে কুষাণদের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস বর্ণিত আছে। আর্মেনীয় সাহিত্যের কয়েকটি বই, টবরীর গ্রন্থ এবং মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি ছাড়া কুষাণযুগের মুদ্রা, লেখ বা লিপি (প্রধানতঃ প্রাকৃত ও ব্যক্ট্রীয় ভাষায় রচিত), স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনও এ যুগের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। কুষাণরা ভারতবর্ষে এসেছিল পার্নিয়দের পরে। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থিয়দের বিতাড়িত করে এবং উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে।

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইউ-চি (Yue-chi) নামে এক যাযাবর জাতির বসবাস ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হিউং-নু নামে এক তুর্কী যাযাবর জাতি ইউ-চিদের উত্তর-পশ্চিম চীন থেকে বিতাড়িত করে ঐ অঞ্চল দখল করে নেন। বিতাড়িত হিউ-চি জাতি নতুন চারণভূমির সন্ধানে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে টাক্‌লামাকান মরুভূমির উত্তরের পথ ধরে চলে ইলি নদীর উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে সেখানকার উ-সুন ছুত্র-ব্দত্তঙ্ক নামে অন্য এক যাযাবর জাতিকে পরাজিত করে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেই সময় ইউ-চিদের ক্ষুদ্র একটি দল তিব্বতের দিকে চলে গিয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চলের এই দল 'ক্ষুদ্র ইউ-চি শাখা' (The little Yue-Chi) নামে পরিচিত হয়। 'বৃহৎ ইউ-চি শাখা' (The great Yue-Chi) উপযুক্ত চারণ ভূমির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে সিরদরিয়া নদীর অববাহিকা অঞ্চলের শাকজাতির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এতে শকগণ পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইউ-চি গণ কিছুকাল সিরদরিয়া (Jaxartes) অঞ্চলে শান্ততে বসবাস করলে উ-সুন জাতির মৃত দলপতির পুত্র হিউং-নু জাতির সাহায্য দিলে ইউ-চি জাতিকে আক্রমণ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরপর ইউ-চি জাতি সিরদরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করে আমুদরিয়া অঞ্চলে (Oxus Valley) আশ্রয় নেন। আমুদরিয়া অঞ্চলে বসবাসকালেই ইউ-চি জাতি তাদের যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকার্যে অংশ গ্রহণ করে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পাঁচটি পৃথক অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখাই ক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

চীনা ঐতিহাসিক ফান্‌-ই (Fan-ye)-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে কুজুল বা কুসুলক কদ্‌ফিসিস্‌ (Kadphises I) অন্য চারটি ইউ-চি শাখা দলপতিগণকে পরাজিত করে 'ওয়াং' অর্থাৎ রাজা উপাধি ধারণ করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

পরবর্তী রাজা বীম কদ্‌ফিসিস্ (২য়) ১ম কদ্‌ফিসিসের পুত্র ছিলেন এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের মৃত্যুর পর কণিষ্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কণিষ্ক কুষাণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কণিষ্ক ছিলেন কুষাণশ্রেষ্ঠ এবং ভারতের ইতিহাসে কুষাণবংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিষ্কের কার্যকলাপের দ্বারাই অর্জিত হয়েছিল। চীনদেশীয়, তিব্বতীয় এবং মোঙ্গলীয় কাহিনী কিংবদন্তীতেও কণিষ্ক শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন।

(দ্রঃ ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ এ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া'; সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; ডঃ বি, এম, মুখার্জ্জী বিরচিত 'রাইজ এ্যান্ড ফল অফ দি কুষাণ এ্যাম্পায়ার'; ডঃ বলদেব কুমারের 'আরলি কুশানস্'; ডঃ মণিকুন্তলা হালদার দে রচিত 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস'; ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরীর 'ভারতের ইতিহাসকথা' ১ম খণ্ড)

মণিকুন্তলা হালদার দে

কুসীনারা

কুশীনগর বা কুসীনারা প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধপীঠসমূহের অন্যতম। কুসীনারার অন্য নামগুলি হ'ল কুশ-নগরী, কুশীগ্রাম, কুশাবতী ও কুশীগ্রামক—চীনা ভাষায় 'কোউ-সিন্-ন-ক-লো'। এই নগরটী উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের পূর্বদিকে ৩৪ মাইল দূরে এবং দেওরিয়া জেলার এবং স্টেশনের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কাশিয়া নগরটি বলে সনাক্ত।

ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের এই নগরটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল তা তাঁর মহাপরিনির্বাণ গ্রহণের জন্য স্থানটির নির্বাচন থেকে স্পষ্ট। পালি দীঘনিকায়ের 'মহাপরিনিব্বান সুত্তে' এই নগরটির উল্লেখ রয়েছে। কুশীনগর ছিল অঙ্গুত্তরনিকায়ে উল্লিখিত 'ষোড়শমহাজনপদের' অন্যতম মল্লদের উপবর্তন বা উপশহরাঞ্চল। হিরণ্যবতীর নদীর পারে যমকশাল—বৃক্ষের মধ্যস্থলে কুশীনগরটি কেবলমাত্র মহাপরিনির্বাণ গ্রহণের আদর্শ স্থান রূপে নির্বাচিত হয়নি পরন্তু বৌদ্ধদের যে চারিটি স্থান অবশ্য দর্শনীয় কুসীনারা ছিল তাদের অন্যতম। কুসীনারায় মহাপরিনির্বাণভূমিতেই মহাপরিনির্বাণ-বিহার এবং মকুটবন্ধন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধদেব এখানেই দব্ব, বন্ধুল, মল্লিকা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যতে পরিণত করেন 'কুসীনারা সুত্ত' ও 'কিন্তিসুত্ত' এখানেই প্রচারিত হয়। মহাপরিনিব্বান সুত্তে বর্ণিত যে, বৈশালী থেকে যাত্রাপথে ভগবান বুদ্ধ 'পাবা' শহরের একটি আম্র বনে কর্মকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণান্তে গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বুদ্ধদেব নির্দেশ দেন যমকশালবৃক্ষের মধ্যস্থলে মহাপরিনির্বাণ মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়। এখানেই তিনি বুদ্ধদেবের অন্তিম বাণী প্রচার করেন। কুসীনারার মল্লগণ ভগবানের নির্দেশমতই কুসীনারায় দেহাস্থিসমূহ বিতরিত হওয়ার স্থানটিতে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভগবান্ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর মল্লগণের প্রতিপত্তি ম্লান হওয়ায় প্রায় দুই শতক ধরে কুসীনার ইতিহাসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। পরে মৌর্যসম্রাট অশোকের সময় কুসীনারা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে। চীনা পরিব্রাজকগণের বর্ণনায়ও

কুশীনগরের ইতিবৃত্ত জানা যায়। ফা-হিয়েন খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে এই স্থানটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত দেখেন। ফা-হিয়েনের সময় এই স্থানটি গুপ্তরাজাদের অধীনে ছিল। কুমারগুপ্তের সময়ে (৪১-৩-৪৫৫ খ্রীঃ) কুশীনারায় হরিবল নামক জনৈক বৌদ্ধ-উপাসক ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্বাণরত অবস্থায় শায়িত বিশাল মূর্তিটি নির্মাণ করান। খ্রীষ্টিয় সপ্তমশতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ কুশীনগরটিকে ধ্বংসস্তুপে পর্য্যবসিত অবস্থায় দেখেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে এই স্থানটি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমশতাব্দী ইত্-সিঙ্ নামক জনৈক চীনা পরিব্রাজকও কুশীনগর দর্শন করেন। তিনি তখন কুশীনগরকে অধিকতর প্রাণবন্ত দেখতে পান। সম্ভবতঃ রাজা হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতাই নগরীটির পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল। উত্তরকালে বৌদ্ধধর্মের ধীরে ধীরে প্রভাব হ্রাস হইলে এই স্থানটির সমৃদ্ধিও গৌরব বিলুপ্তপ্রায় হয়। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু নির্মাণ কার্য যে বিভিন্ন সময়ে হয় তাহা স্থানটির উৎখননের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। খননের আবিষ্কার দ্বারা স্তুপ ও মন্দিরগুলির অস্তিত্ব দৃশ্যমান হয়েছে। খ্রীষ্টিয় একাদশ বা দশক শতকে 'কলচুরি'-গণের শাসনকালে সংঘারাম-সংলগ্ন মন্দিরে একটি বৃহৎ উপবিষ্ট বুদ্ধ-মূর্তি নির্মিত হয়।

বর্তমানে কুশীনগরের মূল প্রত্নস্থল থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে 'মাথাকুআর' নামক প্রস্তরনির্মিত ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিটি নবনির্মিত মন্দিরে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কালক্রমে এই বৌদ্ধস্থানটি জঙ্গল-আবৃত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ভূমিগর্ভে প্রোথিত হয়।

বহুকাল পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কুশীনগর আবার জনসমক্ষে আবির্ভূত হয়। এক্ষেত্রে Carlleyle, Buchanan, Cunningharn, Wilson প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। Carlleyle হিউয়েনসাঙ্ বর্ণিত বৌদ্ধস্থানগুলিও কিছু লেখমালা উদ্ধার করেন। মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত স্থানও ভাস্কর্যগুলি তিনি খুঁজে বার করেন।

পরিকল্পিত ও সুপরিশীলিত পদ্ধতিতে কুসীনারার খননকার্য Archaeological Survey of India-র তত্ত্বাবধানে এবং ব্যক্তিগতভাবে Vogel ও Hirananda Shastri-পরিচালনায় ১৯০৪ ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। তাঁদের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ সংঘারামের চারপাশে গড়ে ওঠা ছোট ছোট স্তুপ ও চৈত্যরাজি আবিষ্কৃত হয়েছে। এইস্থানে আবিষ্কৃত 'মহাপরিনির্বাণ বিহার' ও 'পরিনির্বাণ চৈত্য' প্রভৃতি নগরটিকে সনাক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। এখানে আবিষ্কৃত স্তুপের মধ্যে রামভার স্তুপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়।

গ্রন্থপঞ্জী

Buddhist Momments by Devala Mitra

Ancient Geography of India, by A. Cunningham. Vihárás in Ancient India, by D. K. Barua

Bauddha Silpa O Sthāptya by S. C. Sarkar

সাধনচন্দ্র সরকার

কূটদন্ত সুত্ত

পালি দীঘনিকায়ের অর্ন্তগত অন্যতম প্রসিদ্ধ সুত্ত। আদর্শ যজ্ঞ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তার কথাই ভগবান বুদ্ধ কূটদন্ত নামক এক বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে খাণুমত নামক স্থানে মগধ জনপদে বিচরণ কালে উপদেশ দেন। খাণুমতের কূটদন্ত নামক এই ব্রাহ্মণটি মগধরাজ বিম্বিসারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য ছিলেন। এক সময় কূটদন্ত এক বিশাল যজ্ঞে আহুতি ও বলিপ্রদানের জন্য বৃষ, গোবৎস, ছাগ এবং অন্যান্য পশু সংগ্রহ করে যজ্ঞ ক্ষেত্রে যূপকাষ্ঠের নিকট আনয়ন করেন। কূটদন্ত শুনেছিলেন বুদ্ধ ত্রিবিধ যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত আছেন। তিনি তাই ভগবান বুদ্ধের নিকট যজ্ঞিয় প্রক্রিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে অবগত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করিলে ভগবান বুদ্ধ তাঁকে অতীতে রাজা মহাবিজিত যেরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন তাকেই আদর্শ বলে বিহিত করেন। রাজা মহাবিজিত তাঁর বহুশ্রুত পুরোহিতগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। রাজ পুরোহিত প্রথমে রাজা মহাবিজিতকে তাঁর রাজ্যে প্রথমে জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য দুর করতে বলতেন যার ফলে বিবিধ প্রকার দুর্নীতি চৌর্য ও অশুভ ও অকুশল কর্ম দূরীভূত হত। যজ্ঞকারী রাজা আটটি গুণে সমন্বিত হতেন। পিতৃ ও মাতৃকুলে তিনি বিশুদ্ধ থাকলেই যজ্ঞের অধিকারী হতেন। তিনি শক্তিশালী সৈন্যদল বিশিষ্ট হবেন, তাঁর হৃদয় দানশীলতায় পরিপূর্ণ থাকবে। বিভিন্ন বিদ্যা ও জ্ঞানের শাখার পারদর্শী হবেন, তিনি সত্যদ্রষ্টা ও বিষয় সমূহের পারমার্থিক বোধ সম্পন্ন হবেন। এই আটপ্রকার গুণ বিশিষ্ট রাজার পুরোহিতকেও এই সব গুণের অধিকারী হতে হবে।

এই যজ্ঞে কোন প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ ছিল। যজ্ঞে সকল শ্রমদানই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হবে। রাজা কেবল যজ্ঞফল নিজের জন্য প্রার্থনা করতেন। পরন্তু যজ্ঞফলে সকলের মঙ্গল বিধানে নিয়োজিত হবে। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে রাজা বা পুরোহিত কোনো হতাশা বা বিমর্যভাব প্রকাশ করবেন না।

মহাবিজিত এই ভাবেই আদর্শ যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন। বুদ্ধ অন্যপ্রকার যজ্ঞের কথাও উল্লেখ করেন। এই যজ্ঞ মহাবিজিত কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকেও মহত্তর। অন্যবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠেয় কর্ম ছিল অভাবগ্রস্ত দরিদ্রজনকে অকৃত্রিম দান প্রদানের জন্য বিভিন্ন দানশালা প্রতিষ্ঠা অষ্টাঙ্গিক মার্গের অর্থাৎ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধির অনুসরণ ও পালন। এইরূপ যজ্ঞকর্ম দ্বারাই অর্হত্ত্ব লাভ করা যায়।

এই সুত্ত শ্রবণান্তে রাজপুরোহিত ভগবানের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্মে ও সংঘে প্রবেশ করার প্রার্থনা করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. দীঘনিকায় ১ম, পি. টি. এস. সংস্করণ

২. P.P.N.I., G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কূটবাণিজ জাতক

কূটবাণিজ জাতক শীর্ষক জাতকট্ঠকথায় দুইটি ভিন্ন কাহিনীর জাতক বস্তু দেখা যায়। প্রথমটির সংখ্যা ৯৮ এবং দ্বিতীয়টির সংখ্যা ২১৮। দুটি কাহিনীই এক ধূর্ত বণিক সম্পর্কিত।

প্রথমটির কাহিনী নিম্নরূপ —

বোধিসত্ত্ব কোন এক সময় পণ্ডিত নামধারী হয়ে এক বণিক কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অন্য এক অসৎ প্রকৃতির অতিপণ্ডিত নামে এক বণিকের সময়ে একত্রে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পণ্যদ্রব্য বিক্রিত হওয়ার পর লভ্যাংশ ভাগ করার সময় উপস্থিত হলে অতিপণ্ডিত লভ্যাংশের অর্দ্ধেকের বেশী দাবী করেন কারণ তার অতি প্রখর বুদ্ধিমত্তার জন্যই ঐ লাভ সঞ্জাত বলে। পণ্ডিত তাহা দিতে অস্বীকৃত হলে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য অতিপণ্ডিত বৃক্ষদেবতাকে লভ্যাংশ বন্টনের সাক্ষী মানিবার প্রস্তাব প্রদান করেন। পণ্ডিত সরল বিশ্বাসে প্রস্তাব গ্রহণ করলে অতিপণ্ডিত বৃক্ষগহ্বরে তার পিতাকে মিথ্যা সাক্ষ্য ও দৈববাণী করার জন্য লুক্কায়িত রাখেন। নকল বৃক্ষদেবতারূপী অতিপণ্ডিতের পিতা তার পুত্র অর্থাৎ অতিপণ্ডিতেই লভ্যাংশের অধিক ভাগ পাবে বলে ঘোষণা করেন। পণ্ডিত, অতি পণ্ডিতের শঠতা বুঝতে পেরে বৃক্ষতলে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। ফলে বৃক্ষদেবতারূপী অতিপণ্ডিতর পিতা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় বৃক্ষ থেকে বহির্গত হলে অতিপণ্ডিতের চালাকি ধরা পড়ে। পণ্ডিত অতিপণ্ডিতের সম্পর্কের এই ভাবেই সমাপ্তি ঘটে।

প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরীর এক শঠ বণিকের প্রসঙ্গে জাতকটি বর্ণনা করেন। শ্রাবস্তীর অসৎ বণিক ছিল অতিপণ্ডিত এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন পণ্ডিত নামক বণিক। শ্রাবস্তীর বণিকটি পূর্বকাহিনীর অতিপণ্ডিতেরই মত তাঁর বন্ধু বণিককে বঞ্চনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় জাতক কাহিনীতে এক গৃহপতি অন্য এক গৃহস্বামীর নিকট পাঁচশত লাঙ্গল গচ্ছিত রেখে অন্যত্র ভ্রমণার্থে গমন করেন। ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত গৃহস্বামীটি সেই কর্ষণোপকরণাদি মূষিক ভক্ষণ করেছে ব'লে উক্ত দ্রব্য প্রত্যর্পণে অস্বীকৃত হন। প্রথম গৃহপতি সব বুঝতে পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ হন। অন্য এক সময় প্রথম গ্রামবাসী স্নান করার সময় দ্বিতীয় গৃহস্বামীটি একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে নদীতীরে গমন করেন। তিনি নদীতীরস্থ একটি পর্ণশালায় দ্বিতীয় গৃহস্বামীর পুত্রকে লুকিয়ে রেখে তাঁর গৃহে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় গৃহস্বামী তাঁর পুত্রের সন্ধান করিলে প্রথম গৃহপতি জানান যে তাঁর পুত্র চোখের সামনেই বাজপাখী কর্তৃক অপহৃত হয়েছে। উক্ত ঘটনা শ্রবণে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথম গৃহপতিকে নিয়ে দ্বিতীয় গৃহস্বামী বিচার পতির নিকট অসম্ভব ব্যাপার নিবেদন করেন এবং তাঁকে চৌর্য অপরাধে দণ্ডদানের প্রার্থনা করেন। প্রথম গৃহপতি তখন বিচারকের সম্মুখে দ্বিতীয় গৃহপতি কর্তৃক লাঙ্গল ও কর্ষণোপকরণাদি অপহরণের কথা বিবৃত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের আচরণে কথা ব্যক্ত করেন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন বিচারক। তিনি সব কিছু বুঝতে পেরে তাঁদের বিবাদ মিটিয়ে দেন।

প্রত্যুপন্নবস্তুটি প্রথম কাহিনীর অনুরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহপতি যথাক্রমে সৎ অসৎ বণিক এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন বিচারক। সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন লোক সাহিত্যে অনুরূপ কাহিনী রয়েছে। ইহার সমতুল কাহিনী হল 'জীর্ণধন কথা'।

গ্রন্থপঞ্জী

১. জাতক ১ম ও ২য়, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ২. P.P.N.I., G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কূটাগারসালা (কূটাগারশালা)

বৈশালীর মহাবনস্থ একটি সভাগৃহ বা বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণের সমাবেশকক্ষ। ভগবান বুদ্ধ বেশ কয়েকবার এই সভাকক্ষে অবস্থান করেছিলেন। বৌদ্ধজগতের ও সাহিত্যের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ভগবান বুদ্ধের চরণে এই সভা ঘরে মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সৈন্যদল পরিবৃত লিচ্ছবী প্রধান মহালী, ওট্‌ঠদ্ধ, নন্দক, সুনক্ষত্ত, ভদ্দিয়, সাল্‌হ এবং অভয়। অঙ্গুত্তরনিকায়ে তাঁদের সেনাপতি সীহ অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধদর্শনে গমন করেছিলেন। জৈনধর্মের সচ্চককে বুদ্ধদেব কূটাগারসালাতেই অনেক যুক্তিতর্কের পর বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রাণিত করেন, লিচ্ছবীগণ এই কূটাগারশালাতে ভগবান বুদ্ধকে সেবা করতেন। কোন এক সময় বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষুগণকে ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় স্পর্শের ফলাফল সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কালে মার ভূমিকম্প সৃষ্টি করে ভিক্ষুগণের মানসিক একাগ্রতা নষ্ট করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বহু জাতক কাহিনীই এই কূটাগার শালাতেই বুদ্ধ বিবৃত করেন। কূটাগারশালাতে অবস্থানকালেই আনন্দের ইচ্ছায় ভগবান মহাপ্রজাপতি সহ পাঁচশত ভিক্ষুণীর জন্য মহিলাদের বৌদ্ধসংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। কূটাগারশালাতে অবস্থান কালেই তিনি তিনমাসের মধ্যে মহাপরিনির্বাণ গ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেন। কূটাগারশালা নামকরণের একটি কিংবদন্তী সুমঙ্গলবিলাসিনীতে আচার্য বুদ্ধঘোষ লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাবনেতে ভিক্ষুদের জন্য একটি সংঘারাম নির্মিত হয়। ইহা বহুতল বিশিষ্ট ছিল। নিম্নাংশে স্তম্ভবেষ্টিত একটি সভাগৃহ বা 'হল' ছিল। ভগবান বুদ্ধের 'গন্ধকুটিটি এই স্তম্ভশ্রেণী আশ্রিত ছিল। এই সভাগৃহটি উত্তর-দক্ষিণ দিক বিস্তৃত হয়ে পূর্বমুখী ছিল। এই সভাগৃহ থেকেই সংঘারামটির নাম কূটাগারশালা হয়। কূটাগারশালার সন্নিকটে অপর একটি কক্ষ ছিল যেখানে অসুস্থ ভিক্ষুগণের সেবাশুশ্রূষা করা হত। গৌতম বুদ্ধ প্রায়ই সেই কক্ষে অসুস্থ ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ খবর নিতেন।

কূটাগারশালাতে বুদ্ধদেব অবস্থান করার সময় অনেক বৌদ্ধ ধর্মের ব্যক্তিত্বও বাস করতেন। এদের মধ্যে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, লিচ্ছবি প্রধান অভয়, পন্ডিতকুমার, সীহ, নাগিত, চাল, উপচাল, কক্কট প্রভৃতি উল্লেখ্য।

যশ কাকন্ডক পুত্র ও তাঁর অন্তিম জীবন কূটাগারশালায় অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থ দিব্যাবদান অনুযায়ী কূটাগারশালাটি মর্কটহ্রদতীরে অবস্থিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী — P.P.N.I., G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কেলাস (কৈলাশ)

কেলাস বা কৈলাশ হিমালয় পর্বতের শৈলশ্রেণী। যে পাঁচটি শৈলশ্রেণী অনোতত্ত (অনোতপ্ত) হ্রদকে বেষ্টন করেছে কৈলাশ পর্বত এদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ শৈলশ্রেণী। এর বর্ণ রজতশুভ্রকল্প এবং প্রায় সাতশ মাইল ইহার বিস্তৃতি। বক্রাকার এই শৈলমালা বায়স চঞ্চুর মত প্রতিভাত। প্রস্থে এই শৈলশ্রেণী প্রায় ২১০ মাইল। যক্ষরাজ আলবক একসময় ভগবান বুদ্ধকে ত্রাসিত করার জন্য তাঁর ডান পা-টি কৈলাস পর্বতশৃঙ্গে স্থাপন করার ফলে কৈলাসশৃঙ্গের প্রস্তরগুলি চাপে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কৈলাস পর্বতটিকে বিভিন্ন সাহিত্যে অতি শুভ্র রূপে বর্ণিত হয়েছে। মহাবস্তু গ্রন্থে কৈলাশ পর্বতকে কিন্নরগণের আবাস স্থল রূপে বিবৃত। সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যে কৈলাশ পর্বত দেবতাদের বিশেষ করে মহেশ্বর শিব ও কুবেরের বিচরণ ও বাসভূমি বলে বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

মজ্ঝিম নিকায়—২য় খন্ড, পি. টি. এস.

সারত্থপ্পকাসিনী— ১ম খন্ড, পি. টি. এস.

সুত্ত নিপাত অট্ঠকথা— ১ম খন্ড, পি. টি. এস.

জাতক — Fausboll ৫ম খন্ড, পি. টি. এস.

মহাবস্তু — ১ম আর. জি. বসাক

P.P.N.I. G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কেবট্ট (কেবড্ড) সুত্ত

পালি দীঘনিকায়ের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত সুত্ত। এই সুত্তটি নালন্দার পাবারিক আম্রবনে ভগবান দেশনা করেন। উত্তরপঞ্চাল রাজ্যের প্রধান অমাত্য ছিলেন কেবট্ট (কৈবর্ত্ত?) ভগবান বুদ্ধকে দর্শন করার পরে জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য ভগবান বুদ্ধের শিষ্য জনৈক ভিক্ষুকে তার ঋদ্ধি বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ ঋদ্ধি-প্রদর্শনকে হীন কাজ বলে নিন্দা করেন। তদপেক্ষা বিদ্যা অর্জন এবং আত্মসংযম-শীলতাকে অধিকতর শক্তিশালী রূপে ব্যাখ্যা করেন, কারণ জ্ঞানার্জন দ্বারাই অর্হত্ত্ব লাভ করা যায়। উক্ত প্রসঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত মূলক এক কাহিনী অনুসারে জনৈক ভিক্ষুর কিভাবে 'শীললব্ধ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়'? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেন যে শীলব্রততার দ্বারাই ক্রমপর্যায়ে স্বর্গ লাভ করা যায়। স্বয়ং মহা ব্রহ্মাও এইরূপ পদপ্রাপ্ত হলেও তিনিও ভিক্ষুর এই উত্তর প্রদানে অক্ষম ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুটি তখন উপলব্ধি করেন যে প্রশ্নটি করা যথাযথ হয়নি। প্রশ্নটি যথার্থ হ'ত যদি বলা হয় কোথায় ধাতু বা উপাদান গুলি বিলয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোথায় নাম ও রূপ ক্ষীণ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেন — 'অর্হতের চিত্তস্থ বিজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হলেই 'নাম' বা 'রূপ' বিনষ্ট হয়।'

গ্রন্থপঞ্জী

দীঘনিকায়—১ম খণ্ড (পি. টি. এস)

উদান, ১/১০ পি. টি. এস.

P.P.N.I., G.P. Malalasekera.

সাধনচন্দ্র সরকার

কোকালিক (কোকালিয়) সুত্ত

পালি ত্রিপিটক সাহিত্যের অন্তর্গত সুত্তনিপাতের মহাবগ্‌গের ১০ নং সুত্ত (সূত্র)। বুদ্ধ এই গাথাগুলি ভিক্ষু কোকালিক বা কোকালিয়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। কোকালিক নামের অপর ভিক্ষুর থেকে পৃথক করার জন্য তাকে চূল কোকালিকও বলা হয়। কোকালিক ভিক্ষু বুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্য অর্হৎ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁদের অসাক্ষাতে নিন্দা এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ করে পদুম নরকে উৎপন্ন হয়েছিল। নিরপরাধ ব্যক্তির নিন্দা এবং তার ভয়ঙ্কর পরিণতিই এই সূত্রের বিষয়বস্তু। সুত্তনিপাতের বাইশটি (৬৫৭-৭৮) গাথার মধ্যে শেষ দুটি গাথার ব্যাখ্যা মহা অট্ঠকথায় পাওয়া যায়নি, তাই সুত্তনিপাত টীকা অনুসারে এই দুটি মূল গাথার অংশ নয়। বুদ্ধঘোষের মতে অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে শেষ ১৪টি গাথা (৬৬৩-৭৬) মৃত্যুশয্যায় কোকালিকর উদ্দেশ্যে মৌদ্গল্যায়নের (মোগ্গলান) উপদেশ এবং অন্যদের মতে মহাব্রহ্মাই উপদেষ্টা। সংযুক্ত নিকায়ে প্রথম ৪টি গাথাকে (৬৫৭-৬০) কোকালিকর শিক্ষক টুডু-র উপদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায় অনুসারেও টুডু এই চারটি গাথা আবৃত্তি করেন এবং পরে বুদ্ধ গাথাগুলি পুনরাবৃত্তি করেন।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names by Malalasekera, Vol. I., p 675.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোটিগাম (কোটিগ্রাম)

অঙ্গরাজ্যের (বিহারের ভাগলপুর জেলা) ভদ্দিয়নগরের কাছে গঙ্গা নদী থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। ভদ্দিয়নগর থেকে বুদ্ধ এই গ্রামে গেছিলেন। কোটিগ্রামের অধিবাসী নন্দুত্তর নামক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুসংঘ সহ বুদ্ধকে ভোজনদান করেছিলেন এবং তাঁদের নদী পার হবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেছিলেন। বুদ্ধের অন্তিম ভ্রমণের সময় তিনি পাটলি গ্রামে নদী পার হয়ে কোটিগ্রামে গিয়ে সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষুদের কাছে ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ এখানে অবস্থান করছেন শুনে আম্রপালি (অম্বপালি) এবং লিচ্ছবি জনগণ বৈশালী থেকে তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন এবং আম্রপালি তাঁকে ভোজনদান করেছিলেন। বুদ্ধঘোষের মতে মহাপনাদ (ভদ্দজি স্থবিরের পূর্বজন্মের নাম)-এর প্রাসাদের স্তূপের (কোটি বা থূপিকা) কাছে নির্মিত বলে এই গ্রামের নাম কোটিগ্রাম। সংযুক্ত নিকায় অনুসারে এটি বজ্জিদের গ্রাম।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, Vol I, p. 678.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোটিসিম্বলি জাতক (কোটিশাম্মলি জাতক) - ৪১২

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কামচিন্তায় অভিভূত পাঁচশত ভিক্ষুকে পাপের নিগ্রহ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, যা আশঙ্কিত, তাকে আশঙ্কা করে চলা উচিত। যেমন বটবৃক্ষ প্রভৃতি অন্যবৃক্ষকে আশ্রয় করে তার সর্বনাশ করে, সেইরূপ পাপও মানুষকে আশ্রয় করে তার সর্বনাশ করে।" এই কথা বলে শাস্তা অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন এক জন্মে কোটি-শাম্মলি বৃক্ষে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করতেন। একদিন একটি গরুড় এক বিশাল নাগকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় নাগ একটি বট বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরল। গরুড় মহাশক্তিশালী, নাগরাজও মহাকায়। সেইজন্য বটবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হল। গরুড় দুটিকেই বহন করে নিয়ে ঐ কোটি-শাম্মলি বৃক্ষে গিয়ে বটবৃক্ষ ছুঁড়ে ফেলে নাগকে মেরে খেয়ে ফেলল। ঐ বটবৃক্ষে আশ্রয়কারী একটি পাখী তখন বটবৃক্ষ ছেড়ে ঐ শাম্মলি বৃক্ষে আশ্রয় নিল। শাম্মলি বৃক্ষের সেই দেবতা ছোট পাখিটিকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। গরুড় এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃক্ষদেবতা বললেন "ঐ পাখীটি আমার কাণ্ডে মলত্যাগ করবে, তা থেকে বটের চারা বের হবে, সেই চারা কালে সমস্ত বৃক্ষ বেষ্টন করে ফেলবে, কাজেই আমার এই বিমান নষ্ট হয়ে যাবে।" সেই কথা শুনে গরুড় পাখিটিকে ভয় দেখিয়ে উড়িয়ে দিল।

এই অতীত কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন "তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই গরুড় এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausball, Jataka with commentary, Vol III; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড।]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোণাগমন (কোনাগমন)

চব্বিশজন বুদ্ধের তালিকায় তাঁর ক্রম তেইশ এবং এই ভদ্রকল্পে দ্বিতীয় [এই কল্পে পাঁচ বুদ্ধ জন্মেছেন, যথা ককুসন্ধ, কোণাগমন, কস্‌সপ (কাশ্যপ), গোতম (গৌতম) এবং পঞ্চম ভাবী বুদ্ধের নাম মেত্তিয় (মৈত্রেয়)—Childers' Pali dictionary, P. 186]

সোভ নামক ক্ষত্রিয় রাজার রাজত্বে সোভবতী নগরে কোণাগমন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন যজ্ঞদত্ত নামক ব্রাহ্মণ এবং মায়ের নাম ছিল উত্তরা। তাঁর জন্মের সময় সমগ্র জম্বুদ্বীপে বর্ষণ হয়েছিল বলে তাঁকে কনকাগমন ('কনক' 'আগমন') নামে অভিহিত করা হত এবং 'কোণাগমন' 'কনকাগমন' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলে ধরা হয়। তিনি তিন হাজার বছর গৃহবাসী ছিলেন। তাঁর তুষিত, সন্তুষিত ও সন্তুষ্টা নামে তিনটি উত্তম প্রাসাদ ছিল। তাঁর প্রধানা স্ত্রীর নাম রুচিগত্তা এবং পুত্রের নাম সত্থবাহ। বোধিসত্ত্ব চার প্রকার নিমিত্ত দেখে (জরা ব্যাধি, মৃত্যু, সন্ন্যাস) হস্তী যানারোহণে নিষ্ক্রমণ করে ছয় মাস যাবৎ ধ্যান চর্যায় রত ছিলেন। ত্রিশ হাজার মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। উদুম্বর বৃক্ষের তলদেশে তাঁর বোধিলাভ

হয়েছিল। সুদর্শন নগরের কাছে ঋষিপতন মৃগদাবে মহাশাল বৃক্ষের তলদেশে বসে তিনি প্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। লোকনায়ক কোণাগমন বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রর্বতন করলে ত্রিশ হাজার কোটি প্রাণী প্রথমবারে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। পরপ্রবাদ খণ্ডন করবার জন্য যখন প্রাতিহার্য (miracle) দেখিয়েছিলেন, তখন বিশ হাজার কোটি প্রাণী দ্বিতীয়বার ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল। কোণাগমন বুদ্ধ দেবপরিষদে সপ্ত প্রকরণ অভিধর্ম দেশনা করতে করতে সেখানে বর্ষাযাপন করেছিলেন। তখন দশ হাজার কোটি প্রাণী তৃতীয়বার ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিল। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল সাঁইত্রিশ হাত। আয়ু ত্রিশ হাজার বছর। ভিয়োশ ও উত্তর তাঁর দুজন অগ্রশ্রাবক এবং সেবক ছিলেন স্বত্তিজ (সোত্থিজ)। অগ্রশ্রাবিকা দুজনের নাম সমুদ্রা ও উত্তরা। অগ্রদায়কদ্বয় উগ্র ও সোমদেব এবং অগ্রদায়িকাদ্বয় সীবলা ও শ্যামা। বোধিসত্ত্ব গৌতম যে জন্মে পর্বত নামে ক্ষত্রিয় রাজা রূপে মিথিলায় রাজত্ব করতেন সেই সময় বুদ্ধ কোণাগমন তাঁকে বুদ্ধ হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বুদ্ধ কোণাগমন ত্রিশ হাজার বছর বয়সে পর্বতারামে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : বুদ্ধ-বংশ; Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, p. 681]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোণ্ডঞ্ঞ (অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ)

কপিলবস্তুর অনতিদূরে দ্রোণবস্তু গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গোত্রের নামানুসারে তাঁর নাম হয় কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি ত্রিবেদ ও অন্য ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। সিদ্ধার্থ কুমারের জীবনের বিষয়ে যে আটজন ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন কোণ্ডঞ্ঞ। তিনিই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন 'ইনি বুদ্ধ হবেন।' তিনি গৃহত্যাগ করে চার সাথীসহ উরুবেলায় থাকতেন। সিদ্ধার্থ গৌতম যখন এখানে তপস্যা করছিলেন, এই পাঁচ সাথী যাঁরা পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে পরিচিত, যথা— কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিণ্য), ভদ্দিয় (ভদ্রিয়) বপ্প (বাষ্প), মহানাম ও অস্সজি (অশ্বজিৎ) সেইসময় গৌতমের সেবা করতেন। কিন্তু গৌতমকে কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে আহার গ্রহণ করতে দেখে তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করে ঋষিপতন চলে গেলেন। ভগবান বুদ্ধ এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কাছেই তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেন। এই পাঁচ জনের মধ্যে কোণ্ডঞ্ঞই প্রথম সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যেহেতু মনুষ্যদের মধ্যে তিনিই প্রথম ধর্ম উপলব্ধি করেছিলেন, বুদ্ধ তাঁকে প্রশংসা করে দুবার বলেছিলেন 'অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞ'। সেই কারণেই তিনি 'অঞ্ঞাত কোণ্ডঞ্ঞ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পাঁচ দিন পরে বুদ্ধ 'অনাত্মলক্ষণসূত্র' দেশনা করলে তিনি অর্হত্বফল লাভ করেন। ভগবান জেতবন মহাবিহারে তাঁকে জ্ঞানলাভীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে ঘোষণা করেন। লোকালয় থেকে দূরে বসবাস করার ইচ্ছায় বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে তিনি মন্দাকিনী নদীর তীরে ছদ্দন্ত বনে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি বার বছর ছিলেন। পরিনির্বাণকাল আসন্ন হলে তিনি বুদ্ধের দর্শনের জন্য এসে বুদ্ধ-দর্শনের পর পুনরায় ছদ্দন্ত বনে ফিরে গেলেন এবং সেখানেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করলেন।

[দ্রষ্টব্য : বিনয়পিটক (পি. টি. এস.) ১ম খণ্ড, পৃ. ১২-১৪; থেরগাথা, শ্লোক নং ৬৭৩-৬৮৮; Dictionary of Pali Proper Names, Vol I, P. 43.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিণ্য) বুদ্ধ

চব্বিশজন বুদ্ধের তালিকায় দ্বিতীয়। দীপঙ্কর বুদ্ধের পরে শীলগুণ পুণ্য তেজে অনন্ত তেজসম্পন্ন কোণ্ডঞ্ঞ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। এই বুদ্ধের জন্মস্থান রম্যবতী নগর, পিতা সুনন্দ নামক ক্ষত্রিয় এবং মা সুজাতা। তিনি কোণ্ডঞ্ঞ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল কোণ্ডঞ্ঞ। তিনি দশ হাজার বছর গৃহবাসী ছিলেন। রুচী, সুরুচী ও সুভ নামে তাঁর তিনটি উত্তম রমণীয় প্রাসাদ ছিল (বুদ্ধবংস অট্‌ঠকথা অনুসারে রাম, সুরামা এবং সুভ)। তাঁর প্রধানা মহিষী রুচী দেবী এবং পুত্রের নাম বিজিতসেন। তিনি চার প্রকার নিমিত্ত (জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও সন্ন্যাস) দর্শন করে রথারোহণে গৃহ থেকে অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন এবং দশ মাস বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি অমরাবতীর কাছে দেববনে প্রথম ধর্মদেশনা করেন। তাঁর অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নাম ভদ্র ও সুভদ্র এবং সেবক ছিলেন অনুরুদ্ধ। প্রধান অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন তিষ্যা ও উপতিষ্যা। শাল কল্যাণী তাঁর বোধিদ্রুম ছিল। সোণ ও উপসোণ তাঁর দুই অগ্র উপাসক এবং নন্দা ও সিরিমা অগ্র উপাসিকা। তাঁর দেহ অষ্টাশি হাত উচ্চতাসম্পন্ন। সেইসময় আবির্ভূত মানুষের লক্ষ বছর পরমায়ু ছিল। তিনিও ততদিন যাবৎ বিদ্যমান থেকে বহু প্রাণীকে দুঃখসাগর থেকে ত্রাণ করেছিলেন। এই বুদ্ধের সময় গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় বিজিতাবী নামে রাজচক্রবর্তী হয়ে চন্দ্রাবতীতে রাজত্ব করতেন। বুদ্ধ কোণ্ডঞ্ঞ চন্দ্রারামে পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। সেখানে সাত যোজন উঁচু বিচিত্র চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। শাস্তা কোণ্ডঞ্ঞ বুদ্ধের শারীরিক অস্থি ধাতুসমূহ বিকীর্ণ হয়নি। সুবর্ণ প্রতিমার মত জমাট হয়ে বিদ্যমান ছিল।' (এই তথ্য মূল পালি গ্রন্থ 'বুদ্ধবংসে' পাওয়া যায় না। অট্‌ঠকথায় এটি সন্নিবেশিত আছে।)

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali Proper Names, Vol I, p. 683.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোমায়পুত্ত জাতক (কোমায়পুত্র জাতক) - ২৯৯

শাস্তা পুব্বারামে অবস্থানকালে কয়েকজন রূঢ়স্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। তাদের দুরাচারের কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লে অন্যান্য ভিক্ষুরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচনা শুনে বললেন, "এই ভিক্ষুগণ কেবল এজন্মে নয়, পূর্বেও দুরাচারী ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল কোমায়পুত্র। তিনি কালক্রমে সংসার ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যা

গ্রহণ করে হিমালয়ে বাস করছিলেন। সেইসময় কয়েকজন দুরাচারী তপস্বীও সেখানে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করছিল। তারা ধ্যানাদি অভ্যাস না করে কেবল আহার বিহার ও আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতো। তাদের একটি বাঁদর ছিল। সে নানারকম মুখভঙ্গী ও লম্ফঝম্ফ করে তাদের মনস্তুষ্টি করত।

ঐ তপস্বীরা একসময় নুন ও আচার সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে গেলে বোধিসত্ত্ব তাদের আশ্রমে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। বাঁদরটি তাদেরকে যেমন মুখভঙ্গী প্রভৃতি দেখাতো, বোধিসত্ত্বকেও সেইরকম দেখাতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "যারা সুশিক্ষিত তপস্বীদের কাছে থাকে, তাদের সদাচারসম্পন্ন হওয়া উচিত। তাদেব আচরণ সভ্য হবে এবং তারা ধ্যানপরায়ণ হবে।" এই উপদেশ শুনে বাঁদরটি তখন থেকে শীলবান ও আচারসম্পন্ন হল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ঐ স্থান ত্যাগ করলেন। ঐ দুরাচারী তপস্বীরা আবার আশ্রমে ফিরে এলে বাঁদরটি আর পূর্বের মত অঙ্গভঙ্গী করে তাদের মনস্তুষ্টি করল না।

এই কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "সেই সময় ঐ ভিক্ষুগণ ছিল দুরাচারী তাপসের দল এবং আমি ছিলাম কোমায়পুত্র।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol. II; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড।]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোরিয়া

কোরিয়াতে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল চীন দেশ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। স্যার চার্লস ইলিয়টের মতে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্মকে চীনদেশ থেকে সুনির্দিষ্ট করে পৃথক করা যায় না। দূরপ্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ইতিহাসে কোরিয়ার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, কারণ কোরিয়া থেকেই জাপানে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পরে। চীনদেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় তিয়েনতাই সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ ঘটবার উপক্রম হয় তখন এক কোরিয়ার আচার্যের প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম সেখানে পুনরুজ্জীবন লাভ করে। ইলিয়ট সাহেবের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চীনা ত্রিপিটকের সংস্করণের একমাত্র প্রতিলিপিটি কোরিয়াতেই সুরক্ষিত ছিল যেটি পরবর্তী সময়ে জাপানে স্থানান্তরিত করা হয়।

বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় অনুপ্রবেশের সময়কালে প্রধানতঃ তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, যথা—উত্তরে কোগুর্যু (Koguryu), দক্ষিণ-পশ্চিমে পক্‌ছে (Pakche) এবং দক্ষিণ-পূর্বে সিল্লা (Silla)। চীনদেশীয় উপাদান অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম সবপ্রথম উত্তরের কোগুর্যুতে প্রসারিত হয় এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে উহা পক্‌ছে নামক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কথিত আছে, সুন্দো (Sundo) নামে এক চীনা ভিক্ষু কোগুর্যুতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং মধ্য এশিয়ার মারানন্দ নামক একজন ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় পক্‌ছেতে বিস্তারলাভ করে। এরপর পঞ্চম শতাব্দীতে কোরিয়ার সিল্লা প্রদেশে

বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভের সঙ্গে সমগ্র কোরিয়াতে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তম শতাব্দীতে সিল্লা বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়। সিল্লার নৃপতির সঙ্গে চীনা তাং (T'ang) রাজবংশের যোগাযোগের মাধ্যমে সিল্লাতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। চীন ছাড়া জাপানেও ৫৫২ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র ও বুদ্ধমূর্তি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। কথিত আছে যে জাপানের সম্রাটের সঙ্গে সর্বাগ্রে উপহার প্রেরণের মাধ্যমেই সন্ধিস্থাপন করা হয়েছিল। আরও জানা যায় যে সপ্তম শতাব্দীতে কোরিয়া থেকে বহু তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে এসেছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর ওয়াং (Wang) রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় বহু বিহার স্থাপিত হয় কোরিয়ার বিভিন্ন স্থানে। কথিত আছে, ঐ বিহারগুলি থেকে বহু পণ্ডিতচার্যদের চীনদেশে প্রেরণ করা হয়েছিল বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি অধ্যয়নের জন্য। সেই সময় দেশে আইন প্রণয়ন করা হয় যে কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্রসন্তান থাকলে একটি সন্তানকে বাধ্যতামুলকভাবে সংঘে যোগদান করবার জন্য প্রেরণ করতে হবে। এইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত কোরিয়ার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। বস্তুত: ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম তথায় প্রধান ধর্ম হিসেবে সর্বোচ্চস্থান লাভ করেছিল। সেই যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ আচার্যের নাম করা যায় যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল যথা, ই-তিয়েন (Yi-T'ien) ও পুচাও (P'u-Chao)। ই-তিয়েন চীনা ত্রিপিটকের তালিকা প্রকাশ করেন যেটি 'ই-তিয়েন-লু' নামে পরিচিত। কথিত আছে ই-তিয়েন চীনা তিয়েন-তাই শাখার ধর্মীয় মতবাদগুলি কোরিয়ায় প্রচার করেছিলেন। উপরন্তু ই-তিয়েন 'হোওয়া যেন' শাখাটির মতবাদগুলিরও প্রচারকর্তা। তাছাড়া ই-তিয়েন কোরিয়াদেশীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু রচনা প্রকাশ করেন। সেই সময় বহু পণ্ডিতাচার্য কোরিয়া থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ফাসিয়ান শাখার ইউয়ান সাও (Yyan Ts'o) এবং হোওয়ায়েন শাখার উই সিয়াং (Yi' Siang) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে মোঙ্গল সম্রাটরা তথাকার ওয়ান রাজবংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করলে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম তিব্বতীয় লামাধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পরবর্তীকালে ষোড়শ শতাব্দী থেকে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত: রী (Rhee) রাজবংশের সময়কাল থেকে চীনা মহাপুরুষ কনফুসিয়াসের অনুগামীরা তথাকার বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করবার নিমিত্তে কোরিয়ার প্রাচীন বিহারগুলি দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত দুর্গম ও দুর্ভেদ্য স্থানগুলিতে। যাই হোক্, কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্মের একসময়ে বহুল প্রচার ঘটলেও বৌদ্ধধর্ম সেখানে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি। উপরন্তু কোরিয়ার বৌদ্ধভিক্ষুগণের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁরা দেশের জনসাধারণের নৈতিকতার উন্নতি ঘটাতে পারেননি।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯১০ অব্দে জাপানের সঙ্গে কোরিয়া রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হলে তখন থেকে আবার বৌদ্ধধর্মের সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। তখন থেকেই কোরিয়ার শহরগুলিতে বহু বৌদ্ধমন্দির নির্মিত হতে থাকে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ

শুরু হয়, বিহার ও সংঘারামগুলির সংস্কার সাধন করা হয়। কোরিয়ার অভিলেখগুলির প্রতিলিপির কাজও শুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু প্রকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বৌদ্ধ সাময়িক পত্রিকা মুদ্রণের কাজও আরম্ভ হয়।

বর্তমানে কোরিয়ার বৌদ্ধধর্ম বলতে জাপানদেশীয় জেন (Zen) ধর্ম অস্তিত্বশীল যেটি প্রধানতঃ অমিতাভ বুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

[দ্রষ্টব্য : ইলিয়ট সাহেবের 'হিন্দুজিম এ্যান্ড বুদ্ধিজিম', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯; 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে) রচিত পৃঃ ৪৫৩-৫৬।]

মণিকুন্তলা হালদার দে

কোলিতগাম (কোলিতগ্রাম)

বিহারের রাজগৃহের অনতিদূরে অবস্থিত এই গ্রামটি বুদ্ধের প্রধান দুই অগ্রশ্রাবকের অন্যতম মহামৌদ্গল্যায়ন (মহামোগ্গলান)-এর জন্মস্থান। এই গ্রামটির কাছেই বুদ্ধের আর এক প্রধান অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের জন্মস্থান উপতিষ্যগ্রাম অবস্থিত।

[দ্রষ্টব্য : Dictionary of Pali proper Names, Vol I, p. 689.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোলিয়

বুদ্ধের সময়কার প্রজাতান্ত্রিক দলগুলির একটি। তাদের প্রধান বসতি ছিল দুটি— একটি রামগ্রামে এবং অপরটি দেবদহে। অট্‌ঠকথাগুলিতে (দীঘনিকায় অট্‌ঠকথা, ১ম, ২৬০; সংযুক্ত নিকায় অট্‌ঠকথা, ১ম, ৩৫৬; থেরগাথা অট্‌ঠকথা, ১ম, ৫৪৬) কোলিয়দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে তাতে জানা যায় যে রাম নামে বারাণসীর এক রাজা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে বনে চলে যান। সেখানে তিনি ফলাহারী হয়ে জীবনযাপন করে রোগমুক্ত হন এবং ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাজা ইক্ষ্বাকু-র (পালি ওক্কাক) কন্যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা প্রিয়া-র (পিয়া) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। রাম তাঁকে সুস্থ করে তুলে বিবাহ করেন এবং তাঁদের বত্রিশটি সন্তান হয়। একটি বিশাল কোলবৃক্ষকে কেটে তাঁরা সেই বনেই বসতি স্থাপন করেন বলে এই শহর কোলনগর নামে অভিহিত হয় এবং এই স্থানে ব্যাঘ্র-চলাচলের চিহ্ন (ব্যগ্ঘপথ) দৃষ্ট হওয়ায় এটিকে ব্যগ্ঘপজ্জও বলা হয়। এই রাজার বংশধরেরাই কোলিয় নামে পরিচিত হয়। কুণাল জাতকে (জাতক, ৫ম খণ্ড, ৪১৩ নং) বলা হয়েছে কোলগাছের নীচে তাদের বসতি ছিল বলে তাদেরকে কোলিয় বলা হত। কোলিয়দের বসতি শাক্যদের কাছাকাছি ছিল এবং রোহিণী নদী শাক্য ও কোলিয়দের রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল (Dictionary of Pali Proper Names, Vol I, p. 690)। এই দুই রাজ্য বুদ্ধের মা ও স্ত্রী সম্পর্কে আত্মীয়ও ছিল। শাক্য ও কোলিয় এই দুই গোষ্ঠীই জলসেচের কাজে রোহিণী নদীর জল ব্যবহার করত। একসময় শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে নদীর জল নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে বুদ্ধের মধ্যস্থতায় তার নিষ্পত্তি হয়। এই দুই দলের অনেকেই সেইসময় বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (জাতক, ৫ম,

৪১২ নং; সুমঙ্গল বিলাসিনী, ২য়, ৬৭২; ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৩য়, ২৫৪)। কোলিয়পুত্রী সুপ্পবাসা ছিলেন সংঘের অন্যতম দায়িকা। অঙ্গুত্তর নিকায়ে উল্লিখিত ককুধ— কোলিয়পুত্র বুদ্ধের প্রধান শিষ্য স্থবির মৌদ্‌গল্যায়নের ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধের মহা-পরিনির্বাণের পর তাঁর পূতাস্থির অংশ নিয়ে কোলিয়রা তার উপর চৈত্য নির্মাণ করে।

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসল (কোশল)

প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় দ্বিতীয় রাজ্য। কোশল রাজ্য ছিল বর্তমান উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যা ও তার সংলগ্ন এলাকা। সরযূ নদী কোশল রাজ্যকে উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল এই দুইভাগে বিভক্ত করেছে (B. C. Law, Geography of early Buddhism, p. 6) উত্তর কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী (সাবত্থি-সাবত্থি) এবং দক্ষিণ কোশলের রাজধানী কুশাবতী।

বুদ্ধের সময় এই স্থানের প্রভাবশালী রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ (পালি পসেনদি), তারপরে তাঁর পুত্র বিড়ুড়ভ রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় কাশী রাজ্য কোশলের অধীন ছিল, কারণ মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে মহাকোশলের কন্যা ও প্রসেনজিতের ভগ্নি কোশলদেবীর বিবাহে কাশী রাজ্যটি তাঁকে যৌতুকরূপে দেওয়া হয়েছিল (জাতক, ২য়, ২৩৭; ৪র্থ ৩৪২)। কাশী ও কোশলের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধের বিবরণ বহু জাতকে উল্লিখিত আছে। কোন কোন সময়ে এই দুই রাজ্যের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সঙ্গে প্রসেনজিতের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অজাতশত্রু বন্দী হন। কিন্তু প্রসেনজিৎ তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং তাঁর কন্যা বজিরার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে লিচ্ছবি বিজয়ের পর অজাতশত্রু কোশলের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যরাজ্য কপিলাবস্তু (কপিলবত্থু) কোশলের অধীন ছিল। বুদ্ধের জন্মস্থান কোশল বলে সুত্তনিপাতে উল্লেখ আছে (শ্লোক ৪২২-৪২৩) এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে (১ম, ২৭৬) কপিলাবস্তুকে কোশলের অন্তর্গত বলা হয়েছে। তাছাড়া মজ্ঝিম নিকায়ে (২য়, ১২৪) প্রসেনজিতের উক্তির উল্লেখ আছে "ভগবা পি কোসলকো, অহং পি কোসলকো।" বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী ছিল কোশলরাজ্যের রাজধানী। বুদ্ধ বহু সময় এখানে অবস্থান করেছিলেন। বিনয়ের অনেক নিয়ম কোশলেই গঠিত হয়েছিল। বুদ্ধের ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী লোম (উর্ণলোম) কোশলে নির্মিত চৈত্যে রক্ষিত আছে (বুদ্ধবংস, ধাতু ভাজনিয় কথা, শ্লোক ৯)

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসল দেবী

ইনি ছিলেন মহাকোশল-এর কন্যা এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্নী। ইনি মগধরাজ বিম্বিসারের দ্বিতীয় মহিষী। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তাঁকে কাশীর একটি গ্রাম দেওয়া হয়। অজাতশত্রু তাঁর পুত্র। রানীর গর্ভাবস্থায় তাঁর মনে রাজার ডান হাঁটুর রক্তপানের ইচ্ছা জাগলো এবং জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর গর্ভস্থ সন্তান পিতৃহত্যাকারী হবে—সেই কারণে তিনি গর্ভপাতের চেষ্টা করেন কিন্তু

ব্যর্থ হন। মহারাজ বিম্বিসার তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। অজাতশত্রু যখন পিতাকে বন্দী করেন তখন কোসল দেবী যতদিন পেরেছিলেন রাজাকে খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তিনিও শোকে দুঃখে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : G. P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol I., p. 698.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসলবিহারী থের (কোশলবিহারী স্থবির)

ইনি বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৈশালী থেকে রোগ-অমনুষ্য-দুর্ভিক্ষ ভয় দূর করার জন্য লিচ্ছবীদের অনুরোধে ভগবান যখন বৈশালীতে এসে ধর্মদেশনা করেন (রতন সুত্ত, সুত্তনিপাত, গাথা নং ২২২-২৩৮), সেই সময়ে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি প্রব্রজিত হন। প্রব্রজিত হয়ে তিনি কোশল রাজ্যের নিকটবর্তী অরণ্যে বাস করতে লাগলেন। একজন উপাসক তাঁকে বৃক্ষমূলে বসবাস করতে দেখে একটি কুটীর নির্মাণ করে দেন। সেখানেই তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। কোশল রাজ্যে বহুদিন ছিলেন বলে তিনি কোশলবিহারী স্থবির নামে পরিচিত।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় তিনি সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ে বসবাস করতেন। চুয়ান্ন কল্প পূর্বে তিনি সুমেখলিসম নামক রাজা ছিলেন। কোশলবিহারী স্থবির এবং অপদানে উল্লিখিত বিলালিদায়ক স্থবির অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করা হয়।

[দ্রষ্টব্য : থেরগাথা, গাথা নং ৫৯; থেরগাথা অট্‌ঠকথা ১ম, ১৩৪; অপদান, ১ম, ১৪৫; Dictionary of Pali Proper Names by G.P. Malalasekera, Vol I, p. 699.]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসম্বিয় সুত্ত (কৌশাম্বী সূত্র)

বৎস রাজ্যের রাজধানী কৌশম্বী নগরীতে ঘোষিতারামে অবস্থানকারী কয়েকজন বিবাদপরায়ণ ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। মৈত্রীপরায়ণ হওয়া এবং মৈত্রী বর্ধনের ছয়টি উপায়, যথা— কায়, বাক্য, মনে অন্যের প্রতি মৈত্রীভাব; লব্ধবস্তু একাকী ভোগ না করে সতীর্থদের সঙ্গে সমবণ্টন; শীলাচরণ গুণসম্পন্ন হয়ে অখণ্ডভাবে উন্নত জীবনযাপন করা; যে দৃষ্টি আর্য (নির্দোষ), দুঃখক্ষয়কারী ও মুক্তিদায়ী, সেই সম্যক দৃষ্টি পরায়ণ হয়ে বিচরণ করা-এইগুলিই এই সূত্রের আলোচ্য বিষয়।

[দ্রষ্টব্য : মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩২০।]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসম্বী (কৌশাম্বী)

এলাহাবাদের নিকটে যমুনাতীরস্থ প্রাচীন নগরটির বর্তমান নাম কোশম। অঙ্গুত্তর নিকায়, অট্‌ঠকথা ও আরও অনেক পালিগ্রন্থে এই নগরটির উল্লেখ আছে। কিন্তু সংযুক্ত নিকায়ে এই নগরকে 'গঙ্গায় নদীয়া তীরে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি বোধহয় ঠিক নয়।

অট্ঠকথাগুলি কৌশাম্বী নামকরণের দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। যথা নগরস্থাপনের সময় বহু কুশাম্ব গাছ কাটা হয়েছিল, অথবা কুশাম্ব ঋষির আশ্রমের কাছে নগর নির্মিত হয়েছিল বলে তা কৌশাম্বী নামে অভিহিত (উদান অট্ঠকথা, ২৪৯; সংযুক্ত নিকায় অট্ঠকথা ৩০০; মজ্ঝিম নিকায় অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৫৩৫)। পুরাণাদির মতে রাজা পরীক্ষিতের বংশধর কুশাম্বর দ্বারা নগর স্থাপিত হয়েছিল বলে এর নাম কৌশাম্বী।

প্রাচীন বৎস রাজ্যের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। বুদ্ধের সময় সেখানে রাজা পরন্তপ এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র উদয়ন (পালি উদেন) রাজত্ব করতেন। কৌশাম্বীরাজ উদয়ন প্রথমে বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করলেও পরে তিনি ও তাঁর মহিষী সামাবতী (শ্যামাবতী) পিণ্ডোল ভরদ্বাজের শিষ্যত্বে বুদ্ধের পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারও নির্মিত হয়। (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১)। কথিত আছে কৌশাম্বীর তিনজন শ্রেষ্ঠী ঘোসিত, কুক্কুট ও পাবারিক— শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বুদ্ধের অবস্থানকালে তাঁকে কৌশাম্বীতে আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের নিজ নিজ নামানুসারে তিনটি সংঘারাম নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। এইগুলির মধ্যে ঘোসিতরাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ বুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদ্বয় সারিপুত্র ও আনন্দ এখানে কয়েকবার অবস্থান করেছিলেন (দীঘনিকায়, সংযুত্ত নিকায়, সমন্তপাসাদিকা ও মহাবংস)

একসময় অতি সামান্য কারণে কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। একই আবাসে দুজন নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বিনয়ধর এবং অপরজন সূত্রবিশারদ। যিনি সূত্রবিশারদ তিনি একদিন আচমন করতে গিয়ে ঘটিতে সামান্য জল রেখে আসেন যা বিনয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। বিনয়ধর ভিক্ষু তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভুল স্বীকার করলেও সেই বিনয়ধর ভিক্ষু অন্যান্য ভিক্ষুগণকে এই বিনয়বিরুদ্ধ আচরণের বিষয় জানালেন। এইভাবে ঐ দুই ভিক্ষুর শিষ্যদের মধ্যে ভীষণ কলহ শুরু হল। স্বয়ং বুদ্ধ চেষ্টা করে বিবাদ থামাতে না পেরে অবশেষে পারিলেয়্যক বনে গিয়ে বর্ষাবাস করেন। বিনয় মহাবর্গে কৌশাম্বী-স্কন্ধে তা বর্ণিত আছে।

ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কৌশাম্বীর সমৃদ্ধি ও হীনযানী শ্রমণদের বিষয়ে এবং তার প্রায় দুশ কুড়ি বছর পরে ভারতে আগত হিউয়েন সাঙ্ (খৃ. ৬৩০-৬৪৪) কৌশাম্বীর দশটি বিহারের ভগ্নদশার উল্লেখ করেছেন। অনেকের মতে খৃ. ছয় শতকের প্রথমে হূণ প্রধান তোরমান কৌশাম্বীর বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন [এখানে পাওয়া দুটি সীলমোহরে উৎকীর্ণ 'তোরমান' ও 'হূণ রাজা'— Indian Antiquary (1954-55). The excavation of Kausambi (1957-59) by G. R. Sharma]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসিয় জাতক (কৌশিক জাতক) ২২৬

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। কোশলরাজ প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনার্থে অকালে (অর্থাৎ বর্ষাকালে, পক্ষান্তরে

দিবাভাগে) যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। যাত্রার আগে শাস্তাকে দর্শনের জন্য এসে রাজা শাস্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন "ভন্তে, আমি প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য যাত্রা করছি। সেইজন্য আপনাকে বন্দনা করতে এলাম।" শাস্তা তখন বললেন "প্রাচীনকালেও মহারাজগণ সসৈন্য অভিযান করার আগে পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অসাময়িক অভিযান থেকে বিরত হয়েছিলেন।" এই বলে শাস্তা রাজার অনুরোধে অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ অকালে যুদ্ধযাত্রা করে উদ্যানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ঐ সময় একটি পেচক (কৌশিক), ঝোপে লুকিয়ে ছিল। তা দেখে দলে দলে কাক এসে পেচককে ধরার জন্য সেইস্থান ঘিরে ফেল্‌ল। সূর্য অস্ত গেছে কিনা তা না দেখেই পেচক অকালে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কাকগুলি পেচকটিকে আক্রমণ করল। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পণ্ডিতবর, কাকগুলি ঐ পেচকটিকে আক্রমণ করল কেন? বোধিসত্ত্ব বললেন, "মহারাজ, যারা অকালে বাসস্থান থেকে বের হয়, তারা এইরকমই দুর্গতি ভোগ করে। এইজন্যই অকালে বাসস্থান থেকে বের হওয়া উচিত নয়।" কাহিনী শেষ করে শাস্তা বললেন, "তখন আনন্দ ছিল সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তার সেই পণ্ডিতামাত্য।" শাস্তার কাহিনী শুনে রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jātaka with commentary, Vol II; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসিয় জাতক (কৌশিকী জাতক) ১৩০ নং

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে শ্রাবস্তীবাসিনী এক রমণীর সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। এই দুঃশীলা পাপরতা রমণীর স্বামী ছিলেন একজন সাধু ও শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে সে অসুখের ভান করে শুয়ে থাকতো এবং অন্যান্য সময়ে আমোদ প্রমোদে রত থাকত। সেই রমণী যা খেতে চাইত ব্রাহ্মণ তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন। সেই কারণে বহুদিন শাস্তার দর্শনে যেতে পারেননি। একদিন ব্রাহ্মণ শাস্তার দর্শনে জেতবনে এলে তিনি ব্রাহ্মণকে এতদিন না দেখার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে স্ত্রীর অসুখের সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। শাস্তা এই ব্রাহ্মণীর পাপভাব জানতেন। তিনি বললেন, "ব্রাহ্মণ, রমণীদের এইরূপ রোগ উপশম না হলে কি ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়, পুরাকালে পণ্ডিতেরা তা তোমায় বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা তোমার স্মরণ নেই।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে তক্ষশিলায় সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে অধ্যাপনা করতে লাগলেন। এই ব্যক্তির স্ত্রীও দুঃশীলা ও পাপরতা ছিল। ফলতঃ প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যা বলা হল, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বোধিসত্ত্ব শিষ্যকে বললেন, "এখন থেকে তুমি স্ত্রীকে তার মনমত খাবার দিও না। গোমূত্রে ভিজানো খাদ্য নিয়ে স্ত্রীকে বলো 'এই তোমার রোগের অমোঘ ওষুধ। হয় এগুলি খাও, নয়ত তুমি প্রতিদিন যে অন্ন ধ্বংসে কর, তারজন্য কাজে প্রবৃত্ত হও।' যদি সে ওষুধ খেতে আপত্তি করে তবে তাকে তা

খেতে বাধ্য করবে। তুমি দেখবে সে তখনই উঠে গৃহকর্মে মন দেবে।" ব্রাহ্মণ আচার্যের শিক্ষামত কাজ করল। এতে ব্রাহ্মণী ভীত হল এবং বুঝতে পারল তার দুঃশীলতা ও পাপাচারের কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। তখন ব্রাহ্মণী পাপকর্ম থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ জীবনযাপন করতে লাগল।

এই কাহিনী শুনে শ্রাবস্তীবাসী সেই ব্রাহ্মণ একইভাবে শিক্ষা দিয়ে স্ত্রীকে অনাচার পরিত্যাগ করে শুদ্ধজীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। বুদ্ধ বললেন, "তখন এই দম্পতি ছিল সেই দম্পতি এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য।"

কৌশিকী-গোত্রনাম।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with commentary, Vol I; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড।]

শুভ্রা বড়ুয়া

কোসোহিত বত্থগুয়হো

ভগবান বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণের একটি। তিনি 'কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন' হন। যেহেতু তথাগত পূর্ব জন্মে, পূর্ব ভবে, পূর্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে বহুকাল পূর্বে হৃত, চির প্রবাসী জ্ঞাতি-মিত্র-সুহৃৎ সখাদেরকে পুনর্মিলিত করেছিলেন, মাতাকে পুত্রের সাথে, পুত্রকে মাতার সাথে, পিতাকে পুত্রের সাথে, পুত্রকে পিতার সাথে, ভ্রাতাকে ভ্রাতার সাথে, ভ্রাতাকে ভগ্নীর সাথে, ভগ্নীকে ভ্রাতার সাথে মিলিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে আনন্দ লাভ করেছিলেন, এই কারণে মরণান্তে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই স্থানে দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করেছিলেন—যথা, দিব্য আয়ুতে, দিব্য বর্ণে, দিব্য সুখে, দিব্য যশে, দিব্য আধিপত্যে, দিব্য রূপে, দিব্য শব্দে, দিব্য গন্ধে, দিব্য রসে ও দিব্য স্পর্শে। ঐ স্থান থেকে চ্যুত হয়ে ইহলোকে এসে এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয়।

[দ্রষ্টব্য : Lakkhaṇa Suttanta (Dīgha Nikâya, Vol III, Ed. J. E. Carpenter).]

শুভ্রা বড়ুয়া

ক্ষেমেন্দ্র

কাশ্মীরের সংস্কৃত কবিদের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতক তাঁর আবির্ভাব কাল। সর্বমোট ৪২টি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। ১৮৭১ সালে Burnell কবির 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী' পুঁথি আবিষ্কার করে তাঁকে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত করেন। Buhler বৃহৎকথামঞ্জরীর আর একটি পুঁথি গুজরাট থেকে আবিষ্কার করেন। ১৮৭২ খ্রী তিনি Journal of Asiatique-এ ক্ষেমেন্দ্রের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্রের আরো পুঁথি আবিষ্কৃত হলে Bulher তাঁকে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তীকালে লেভী, শরৎচন্দ্র দাস, পেটারসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্ষেমেন্দ্রের আবির্ভাব কাল নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ

আলোচনা করেন। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর গ্রন্থে নিজের জীবন বিষয়ক বিশেষ কোনও তথ্য পরিবেশন করেননি। তবে জানা যায় তিনি ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সে পরিবারের চিত্ত ও সম্পদের কোনও অভাব ছিল না। কবির সুযোগ্য পুত্র সোমদেব 'অবদানকল্পলতা' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর পিতা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেছেন। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর প্রথম রচনা বৃহৎকথামঞ্জরী' গ্রন্থে বলেছেন তিনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। এই গ্রন্থের রচনা কাল ১০৩৭ খ্রী। অনুমান করা হয় তার সমস্ত গ্রন্থ ১০৩৭-১০৬৬ খ্রী-এর মধ্যে রচিত হয়েছে।

'অবদানকল্পলতা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। Winternitz-এর মতে ১০৫২ খ্রী এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। 'অবদানকল্পলতা' ও ইহার তিব্বতী অনুবাদ শরৎচন্দ্র দাস ও হরিমোহন বিদ্যাভূষণকর্তৃক প্রকাশিত হয়। তিব্বতে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর আছে। গ্রন্থটি ১০৭টি আখ্যানের সমষ্টি। গ্রন্থে কবি পুত্র সোমদেব একটি ভূমিকাসহ 'জীমূতবাহন' অবদান সংযুক্ত করে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ক্ষেমেন্দ্র ৪২টি গ্রন্থের রচয়িতা হলেও তাঁর সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। কিছু প্রকাশিত হয়েছে, কিছু অপ্রকাশিত পুঁথির আকারে আছে আর কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

দেবধর ছিলেন ক্ষেমেন্দ্রের শৈশবের গুরু। চক্রপাল নামে তাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনিও কবিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ক্ষেমেন্দ্র নিজেকে 'ব্যাসদাস' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক। 'দশাবতার চরিত' গ্রন্থে বুদ্ধ হলেন ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার। ১০৬৬ খ্রী রচিত 'দশাবতার চরিত' তাঁর শেষ গ্রন্থ।

১০৭০ খ্রী কবির জীবনাবসান ঘটে।

Winternitz, History of Indian Lituature, Vol. II.

Jayanti Chattopadhyay,

Bodhisattva Avadanakalpalata–A Critical Study.

আশা দাশ

খগ্গবিসাণ সুত্ত (খড়গবিষাণ সূত্র)

খুদ্দকনিকায়ের সুত্তনিপাতের অন্তর্গত উরগ বর্গের তৃতীয় সূত্র। ৪১টি শ্লোকের মধ্যে ১১নং ছাড়া প্রত্যেকটির শেষ পংক্তি 'একো চরে খগ্গবিসানকপ্পো' (খড়গবিষাণের ন্যায় একাকী বিচরণ কর)। এই শ্লোকগুলি পচ্চেক (প্রত্যেক) বুদ্ধগণের উপদেশ বলে জ্ঞাত। প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁদেরই বলা হয় যাঁরা স্বীয় ক্ষমতা বলে নির্বাণোপযোগী জ্ঞান লাভ করেছেন, কিন্তু জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেননা। তাঁরা সর্বজ্ঞ নন এবং সম্যক সম্বুদ্ধগণের থেকে সর্বাংশে অধস্তন। কথিত আছে প্রত্যেক বুদ্ধগণের বুদ্ধত্বলাভের সম্বন্ধে আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ এই খড়গবিষাণ সূত্র দেশনা করেছিলেন যেগুলি প্রাচীন প্রত্যেক বুদ্ধগণের বিভিন্ন সময়ের উক্তি। প্রত্যেক বুদ্ধের উপদেশ সম্বলিত যে সমস্ত সূত্র ত্রিপিটক গ্রন্থে পাওয়া যায় তার মধ্যে খড়গবিষাণ সূত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্পর্কে এর চেয়ে দীর্ঘতম সূত্র আর

নেই। এই সূত্রে একক জীবনযাপনের মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে অসৎ সংসর্গ ও দুর্জনের সহবাস ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সৎ ও গুণবান বন্ধু পাওয়া গেলে তার সাহচর্য করা যায়, কিন্তু গুণবান বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়া সত্যিই কঠিন এবং সেই ক্ষেত্রে একক জীবনযাপন করাই শ্রেয়। পারিবারিক জীবন ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্য বহু বন্ধনযুক্ত ও কর্তব্যবহুল। এই কারণে গার্হস্থ্যজীবন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং উন্মুক্ত বৈরাগ্য জীবন সংসার দুঃখ অতিক্রমের উপযোগী। প্রত্যেক বুদ্ধগণ একেকসময় একেক অবস্থাতে এই উপদেশগুলি দিয়েছিলেন। এই কারণে প্রত্যেকটি শ্লোকই স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে অপরের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক সময় একটি অপরটির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, যথা ৩৭ এবং ৪৭ নং শ্লোকদুটি। বাতাসকে যেমন জালে আবদ্ধ করা যায় না, জল যেমন পদ্মপাতায় লিপ্ত হয় না, সেইরকমই জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংসার ধর্মে অনাসক্ত হয়ে গণ্ডারের মতই একাকী বিচরণ করেন।

এই সূত্রে যে সমস্ত প্রত্যেক বুদ্ধগণের শ্লোক আছে, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনী বুদ্ধঘোষের সুত্তনিপাত অট্ঠকথায় পাওয়া যায়।

[দ্রষ্টব্য : সুত্তনিপাত, শ্লোক ৩৫-৭৫; সুত্তনিপাত অট্ঠকথা, ১ম, ৪৬;
Dictionary of Pali Proper Names by G.P. Malalasekera, Vol-I P. 702]

শুভ্রা বড়ুয়া

খণ্ডদেবিয়া পুত্ত

গৌতম বুদ্ধের বিরোধী শিষ্য ও সম্পর্কে শ্যালক দেবদত্তের সঙ্গীদের মধ্যে একজন। অপর সহযোগী কোকালিক, কটমোরক তিস্স এবং সমুদ্দদত্ত-র সঙ্গে তার নাম উল্লেখ করা হয়। দেবদত্তের সংঘভেদের প্রচেষ্টায় তারা তাকে সাহায্য করেছিল। অন্যেরা দেবদত্তকে দোষারোপ করলে খণ্ডদেবিয়া পুত্ত দেবদত্তের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের প্রতিরোধ করেছিল। খুদ্দকপাঠ অট্ঠকথায় উল্লিখিত অসৎ ব্যক্তির তালিকায় দেবদত্তের উপরোক্ত তিন সহযোগী, চিঞ্চামানবিকা, দীঘবিদস্সস-র ভ্রাতার সঙ্গে খণ্ডদেবিয়াপুত্তর নামও পাওয়া যায়।

[দ্রষ্টব্য : বিনয়পিটক, ২য়, ১৯৬; ৩য় ৬৬, ১৭১, ৪র্থ, ৩৩৫;
খুদ্দকপাঠ অট্ঠকথা, ১২৬; Dictionary of Pali Proper Names by G.P. Malalasekera, Vol-I P. 705]

শুভ্রা বড়ুয়া

খদিরঙ্গার জাতক (খদিরাঙ্গার জাতক) — ৪০

অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধশাসনের হিতকল্পে প্রভূত দান দিতেন এবং বুদ্ধসহ ভিক্ষুসংঘকে প্রায়ই নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করতেন। বুদ্ধ যখনই অনাথপিণ্ডদের গৃহে যেতেন তখন তাঁর গৃহে উপরতলায় বসবাসকারী এক দেবতাকে পরিবারসহ নীচে নেমে আসতে হত। সেইজন্য সেই দেবতা অন্যদের মাধ্যমে অনাথপিণ্ডদকে তাঁর এই মহাদানশীলতা থেকে বিরত

করতে চাইতেন, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হতেন। এক সময়ে অনাথপিণ্ডদের ভাগ্যবিপর্যয়ে সমস্ত ধনসম্পত্তি নিঃশেষ হয়ে গেলে একবার দেবতা নিজেই অনাথপিণ্ডদের কাছে এসে বললেন যে তিনি যদি এখনও দান দেওয়া বন্ধ না করেন তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। এই কথা শুনে তিনি সেই দেবতাকে তাঁর গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেবতা তখন অনন্যোপায় হয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলেন। শক্র দেবতাকে এই গর্হিত কাজের জন্য তিরস্কার করলেন এবং বললেন, সেই দেবতা যদি অনাথপিণ্ডদের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করে দিতে পারে তবেই সে পুনর্বার অনাথপিণ্ডদের গৃহে আশ্রয় পাবে। সেই দেবতা তাই করলেন এবং তারপর অনাথপিণ্ডদের সামনে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনাথপিণ্ডদ তাঁকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন এবং বুদ্ধ তাঁকে উপদেশ দিলেন। দেবতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে শাস্তা ও শ্রেষ্ঠী উভয়েই তাঁকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ শাস্তার সমক্ষে নিজেই নিজের গুণকীর্তন আরম্ভ করলেন। তিনি বললেন, "ভগবান, এই দেবতা আমাকে 'বুদ্ধের সেবা কোরো না', 'দান কোরোনা' বলে কত বুঝিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই দান দেওয়া থেকে আমাকে বিরত করতে পারেননি। এটা কি আমার গুণের পরিচায়ক নয়?" শাস্তা বললেন "গৃহপতি, তুমি স্রোতাপন্ন ও আর্যশ্রাবক, তোমার শ্রদ্ধা অচলা, তোমার জ্ঞান বিশুদ্ধ। অতঃএব এই অল্পশক্তি সম্পন্ন দেবতা যে তোমাকে বিপথে নিতে পারেনি, এটা বিচিত্র নয়। কিন্তু যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেনি, যখন জ্ঞান পরিপক্ক হয়নি, সেই অতীতকালেও পণ্ডিতেরা যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অতীব বিস্ময়কর। তখন কামলোকেশ্বর মার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড দেখিয়ে বলেছিল, "সাবধান, যদি দান কর, তবে এই অগ্নিতে দগ্ধ হবে।" কিন্তু এতেও তাঁরা ভীত হননি। অনন্তর অনাথপিণ্ডদের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীতকাহিনী আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করে মাত্র ১৬ বছরে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীপদে নিয়োজিত হয়ে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করলেন। প্রভূত দানধ্যান এবং শীলপালনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে লাগলেন। একদিন এক প্রত্যেকবুদ্ধ সপ্তাহব্যাপি সমাধিভঙ্গের পরে বারাণসীবাসী সেই শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করে শ্রেষ্ঠীর গৃহের সামনে উপস্থিত হলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তে পাপিষ্ঠ মার নিতান্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সে ভাবল 'এই প্রত্যেক বুদ্ধ সপ্তাহকাল কিছুই খায়নি; আজ যদি অনাহারে থাকে তাহলে নিশ্চিত মারা যাবে। অতঃএব শ্রেষ্ঠী যাতে একে খাবার দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংকল্প করে দুরাত্মা তখনই মায়াবলে বোধিসত্ত্বের গৃহের সামনে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করল। তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন 'আজ কূটকর্মা মার আমার দানের অন্তরায় হয়েছে। কিন্তু শত সহস্র মারও আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না। অনন্তর অন্নপাত্র নিয়ে গৃহ থেকে বেরিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ধারে এসে মারকে বললেন, "তুমিই কি এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করেছো?" "হ্যাঁ, আমিই করেছি।" "কেন করলে?" "তোমর দানে বাধা দেবার জন্য এবং এই প্রত্যেকবুদ্ধের জীবননাশের জন্য।" "আমি তোমাকে দানে বাধা দিতে দেবনা, এই প্রত্যেকবুদ্ধের জীবননাশও করতে দেবনা। আজ

দেখতে হবে আমাদের মধ্যে কার প্রভাব বেশী, তোমার না আমার।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব কুণ্ডের ধারেই দাঁড়িয়ে বললেন "ভগবান প্রত্যেক বুদ্ধ, এই কুণ্ডের মধ্যে যদি পড়ে যাই তাও স্বীকার্য, কিন্তু আমি ফিরে যাব না। আমার কেবল এই প্রার্থনা, আপনার জন্য যে খাদ্য এনেছি তা গ্রহণ করুন।" এই বলে বোধিসত্ত্ব অন্নপাত্র হাতে অকুতোভয়ে সেই জ্বলন্ত আগুনে পা দিলেন, সেইমুহূর্তেই সেখান থেকে এক অপূর্ব মহাপদ্ম উঠে এল। তিনি সেই ফুটন্ত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে ভোজ্য ঢেলে দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ অন্নগ্রহণ করলে মার পরাস্ত হয়ে চলে গেল। অতঃপর তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, দানাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করতেন এবং দেহান্তে কর্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য লোকান্তরে প্রস্থান করলেন।

কথাবসানে শাস্তা বললেন, "তবেই দেখ তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে দেবতার কথায় কর্ণপাত করেনি, এটা তত আশ্চর্যের বিষয় নয়। অতীতযুগের জ্ঞানী ও ধার্মিক পুরুষদের কর্ম এর থেকে বেশী বিস্ময়কর।" তিনি আরও বললেন, "তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খদিরবণী তারা

সংস্কার স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা ধ্যানিবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধিই অমোঘসিদ্ধি কুলের প্রবর্তক। একজন পুরুষদেবতা এবং অনেকগুলি স্ত্রী দেবতা এই কুলের অর্ন্তভুক্ত। এদের কুলের নাম কর্মকুল এবং বিশ্ববজ্র এই কুলের প্রতীক চিহ্ন। এদের বর্ণ প্রায়ই সবুজ এবং এরা একটি ক্ষুদ্র অভয় মুদ্রাযুক্ত অমোঘসিদ্ধির মূর্তি মস্তক বা মুকুটের ওপর ধারণ করে।

অমোঘসিদ্ধির শক্তির নাম তারা, তারিণী বা আর্যতারা। তারার কাজ সকলকে ভবসাগর পার করে দেওয়া। এই জন্যই তারা তারিণী, ত্রাণকর্ত্রী। খদিরবনী তারা অমোঘসিদ্ধি কুলেরই এক স্ত্রীদেবতা। এই স্ত্রীদেবতার ধাতু ও প্রস্তর মূর্তি সমস্ত বৌদ্ধ দেশেই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ভারতেও এঁর প্রস্তর মূর্তি অনেক। তিব্বত ও চীনে ইনি খুবই সমাদৃত। এঁর গায়ের রঙ সবুজ, সেইজন্য ইনি শ্যামাতারা নামেও পরিচিতা। ইনি একমুখা এবং দ্বিভুজা। নানা অলঙ্কারে শোভিতা দিব্যকুমারী সদৃশা এই দেবী ডানহাতে বরদ-মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বামহাতে পদ্মফুল ধারণ করেন। তিনি কোন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোন মূর্তিতে বজ্রাসনে, আবার কোন মূর্তিতে ললিতাসনে উপবেশন করেন। এঁর সঙ্গে থাকেন আরও দুই দেবী-দক্ষিণে থাকেন হরিদ্রাবর্ণ অলঙ্কার ভূষিতা অশোককান্তা মারীচী যাঁর ডান হাতে বজ্র ও বামহাতে অশোকপত্র এবং বামে থাকেন নীলবর্ণা ভয়ঙ্কর দর্শনা কর্তরী ও কপালহস্তা একজটা।

[দ্রষ্টব্য : সাধনমালা, সম্পাদক : বিনয়তোষ ভট্টাচার্য।]

শুভ্রা বড়ুয়া

খন্তিবণ্ণ জাতক (ক্ষান্তিবর্ণন জাতক) — ২২৫ নং

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে কোশলরাজের অনুরোধে এই অতীত কাহিনী বলেছিলেন। কোশলরাজের এক কর্মকুশল অমাত্য অন্তঃপুরস্থ কোন রমণীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। সে কর্মকুশল বলেই রাজা তার এই অপরাধ সহ্য করে একদিন শাস্তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। 'অতীতে আরও অনেক রাজা এইরূপ অপমান সহ্য করেছিলেন' — এই কথা বলে বুদ্ধ সেই অতীত কাহিনী শুরু করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁর এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করেছিলেন এবং সেই অমাত্যের এক ভৃত্য আবার নিজের প্রভুর অন্তঃপুর দূষিত করেছিল। অমাত্য ভৃত্যের অপরাধ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তাকে নিয়ে রাজার কাছে এসে বললেন, "মহারাজ, এই ভৃত্য আমার সব কাজকর্ম দেখাশোনা করে, কিন্তু এ আমার ঘরের বিশুদ্ধতা নষ্ট করেছে। এর সম্বন্ধে এখন কি করা কর্তব্য?" রাজা শুনে বললেন "আমারও একজন এইরকমই সর্বগুণযুক্ত ভৃত্য আছে যে এখন এখানেই অবস্থান করছে। এইরকম গুণসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে দুর্লভ বলেই আমি ক্ষান্তির আশ্রয় নিয়েছি।" অমাত্য বুঝতে পারলেন যে রাজা তাঁকে লক্ষ্য করেই এই কথা বলেছেন। কাজেই তখন থেকে অমাত্য রাজান্তঃপুরকে আর দূষিত করতে সাহস করলেন না, তাঁর ভৃত্যও রাজার কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ পেয়েছে বুঝে দুষ্কার্য থেকে বিরত হল। তখন শাস্তা ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা।

কোশলরাজের সেই অমাত্য ও জানতে পারলেন যে রাজা শাস্তার কাছে তাঁর দুষ্কার্যের কথা প্রকাশ করেছেন। অতঃএব তখন থেকে তিনিও দুষ্টাচার থেকে বিরত হলেন।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খন্তিবাদি জাতক (ক্ষান্তিবাদি জাতক) — ৩১৩

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে এক কোপনস্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিক্ষু, তুমি জিতক্রোধ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেও ক্রুদ্ধ হও, এর কারণ কি? প্রাচীনকালে পণ্ডিতদের শরীরে সহস্রবার প্রহার করা হয়েছিল, তাঁদের হাত, পা, কান, নাক ছেদন করা হয়েছিল, তাও তাঁরা উৎপীড়কের উপর ক্রুদ্ধ হননি।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। সেইসময়ে বোধিসত্ত্ব অত্যন্ত বৈভবশালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কুণ্ডলকুমার নাম ধারণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়ে তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসার পর যখন তাঁর মা বাবার মৃত্যু হল, তিনি তাঁর বিপুল সম্পত্তি দান করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে হিমালয়ে চলে গেলেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর বারণসীতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি

রাজসেনাপতির অনুরোধে রাজোদ্যানেই বাস করতে লাগলেন। একদিন রাজা কলাবু নর্তকী সমভি ব্যাহারে রাজোদ্যানে এসে সুরাপানে মত্ত হয়ে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হলেন। তখন সেই রমণীরা রাজোদ্যানে বিচরণ করতে বেরিয়ে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বন্দনা করল। তাদের অনুরোধে বোধিসত্ত্ব তাদের ধর্মোপদেশ শোনাতে লাগলেন। রাজা জেগে উঠে নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে তাদের খুঁজতে খুঁজতে ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারি হাতে বোধিসত্ত্বের কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন্ মহাবলম্বী?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ আমি ক্ষান্তিবাদী।" "ক্ষান্তি কাকে বলে?" "লোকে গালি দিলে, প্রহার করলে, যে কোন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করলেও মনের যে অক্রুদ্ধভাব, তার নাম ক্ষান্তি।" "আচ্ছা, এখনই দেখা যাবে, তোমার ক্ষান্তি আছে কি না।" রাজাদেশে ঘাতক কাঁটার আঘাতে তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিল। রাজা তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্রমণ, এখন তুমি কোন্ বাদী?" "আমি ক্ষান্তিবাদী।" রাজা এবার ঘাতককে বোধিসত্ত্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদনের আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হলে রাজা আবার জিজ্ঞোসা করলেন "এখন তুমি কোন্ বাদী?" "মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী।" রাজা সেইস্থান ত্যাগ করে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বিদীর্ণ হল এবং অবীচি নরকের আগুনের শিখা রাজার দেহ গ্রাস করল। রাজসেনাপতি বোধিসত্ত্বকে বললেন যে রাজা ছাড়া অন্য কারও প্রতি তিনি যেন ক্রোধ না করেন। বোধিসত্ত্ব বললেন রাজার প্রতিও তাঁর কোন বিদ্বেষভাব নেই। বোধিসত্ত্ব সেইদিনই প্রাণত্যাগ করলেন। কারও কারও মতে বোধিসত্ত্ব পুনর্বার হিমালয়ে ফিরে গেছিলেন, কিন্তু তা সম্ভবপর নয় বলে মনে হয়। এই পূর্বজন্ম কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন দেবদত্ত ছিলেন বারাণসীরাজ কলাবু; সারিপুত্র ছিলেন সেই সেনাপতি এবং আমি ছিলাম সেই ক্ষান্তিবাদী তাপস।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খন্ধক (স্কন্ধক)

পালি ত্রিপিটকের প্রথম বিভাগ বিনয় পিটক। 'বিনয়' শব্দের অর্থ নিয়মবিধি বা নীতি শৃঙ্খলা। সংঘের সামগ্রিক জীবনযাপন ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ গুলিই বিনয় পিটকে রক্ষিত আছে। বিনয় পিটকের তিনবিভাগে মোট পাঁচটি গ্রন্থ আছে, যথা— সুত্তবিভঙ্গ : (১) মহাবিভঙ্গ বা ভিক্খু বিভঙ্গ (২) ভিক্খুনী বিভঙ্গ, খন্ধকঃ (৩) মহাবগ্গ (৪) চুল্লবগ্গ এবং (৫) পরিবার বা পরিবার পাঠ।

বিনয় পিটকের দ্বিতীয় বিভাগ 'খন্ধক' শব্দের অর্থ অধ্যায়। খন্ধকের দুটি অংশ মহাবগ্গ ও চুল্লবগ্গে সংঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, সংঘের কার্যাবলী, ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ, বর্ষাবাস, রোগ-প্রতিষেধক ভৈষজ্যের ব্যবহার, সংঘভেদ, বিবিধ অপরাধের জন্য শাস্তিবিধান সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও নিয়মের প্রবর্তন ইত্যাদি এই দুই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালীন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান এই গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। খন্ধককে সুত্তবিভঙ্গের পরিপূরক বলে মনে করা যায়।

মহাবগ্গ বুদ্ধের জীবনী ও সংঘের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের এক অমূল্য গ্রন্থ। এতে দশটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদ আছে এবং পরিচ্ছেদগুলির আকার বড় হওয়ার কারণে গ্রন্থটির নামকরণ মহাবগ্গ হয়েছে। বোধিপ্রাপ্তির পর সারনাথে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' বা প্রথম ধর্মদেশনার সময় থেকে ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের বিবরণ আমরা পাই। তাছাড়া সংঘে প্রবেশের নিয়ম, উপোসথ, বর্ষাবাস, বর্ষাবাসের শেষদিনে প্রবারণ পালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী, পাতিমোকখ আবৃত্তি, বিবাদ-শান্তির আইন কানুন, খাদ্য, বস্ত্র, যান, বাসস্থান প্রভৃতির বিধি, কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলী, উপাসিকা বিশাখার বুদ্ধ প্রদত্ত আটটি বর লাভ, বিবিধ সংঘকর্ম ও শাস্তিবিধানের যৌক্তিকতা এবং দশম ও শেষ অধ্যায়ে দীর্ঘায়ুকুমারের কাহিনী বর্ণিত আছে।

খন্ধকের দ্বিতীয় অংশ 'চুল্লবগ্গ' বারোটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। 'চুল্ল' শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র'। মহাবগ্গের তুলনায় পরিচ্ছেদগুলি ছোট হওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ এই নামকরণ। বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কিত কয়েকটি নীতিমূলক কাহিনী, সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাস, ভিক্ষু ভিক্ষুনীদের আচরণ বিধি ও প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম চুল্লবগ্গে সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভিক্ষুনী সংঘের প্রতিষ্ঠার বিবরণ আমরা এখানে পাই। রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি ও বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতির বিবরণও শেষ দুই পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। বহু পণ্ডিতের মতানুসারে সংগীতিগুলির কাহিনী পরবর্তীকালের সংযোজন।

শুভ্রা বড়ুয়া

খন্ধবত্ত জাতক (২০৩ নং)

শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কাহিনী বলেছিলেন। অগ্নিশালার দ্বারে কাঠ চেরাইয়ের সময় সর্প-দংশনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রাণবিয়োগের কথা বিহারস্থ সকলে জেনে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। অনন্তর শাস্তা সেইস্থানে উপস্থিত হয়ে এই বৃত্তান্ত জেনে বললেন "দেখ, এই ভিক্ষু যদি সর্পকুলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করত, তাহলে তাকে কখনই দংশন করত না। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেনি, তখনও তাপসেরা সর্পরাজকুলের প্রতি মৈত্রী দেখিয়ে সর্পভয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। তারপর তিনি অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গানদীর তীরে আশ্রম নির্মাণ করে অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। এই সময় গঙ্গাতীরে নানাজাতীয় সাপ ছিল। তারা ঋষিদের তপস্যার ব্যাঘাত ঘটাত এবং অনেককে দংশনে নিহত করত। ঋষিরা শেষে বোধিসত্ত্বকে এই ব্যাপারে জানালেন। বোধিসত্ত্ব তাঁদের বললেন "তোমরা যদি বিরূপাক্ষ, এলাপত্র, শৈব্যাপুত্র এবং কৃষ্ণ গৌতমক — এই চার নাগরাজকুলে মৈত্রী প্রদর্শন কর, তাহলে এই প্রাণীরা কখনও তোমাদের দংশন করবেনা, তোমাদের অন্য কোনও অনিষ্ট করবেনা।"

কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, তখন বুদ্ধ শিষ্যরা ছিলেন সেইসব ঋষি এবং তিনি ছিলেন তাঁদের শাস্তা।

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-II ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ২য় খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খরস্সর জাতক (খরস্বর জাতক) — ৭৯ নং

শাস্তা জেতবনে কোন এক অমাত্যকে উদ্দেশ্য করে এই কাহিনী বলেছিলেন। কোশলরাজের এই অমাত্য রাজকর সংগ্রহান্তে দস্যুদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে একদিন তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বনে প্রবেশ করবেন, দস্যুরা সেই সুযোগে গ্রাম লুণ্ঠন করবে এবং লুণ্ঠনলব্ধ ধনের অর্ধেক সেই অমাত্যকে দেবে। অনন্তর একদিন সকালে গ্রামটি যখন এই কৌশলে অরক্ষিত অবস্থায় রইল, তখন দস্যুরা এসে গ্রামবাসীদের সর্বস্ব আত্মসাৎ করে চলে গেল। কিন্তু অচিরে অমাত্যের এই দুষ্কার্যের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন রাজা তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে অন্য আর এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করলেন।

একদিন রাজা জেতবনে গিয়ে শাস্তার কাছে অমাত্যের এই কুকীর্তির কথা জানালেন। তা শুনে বুদ্ধ বললেন, "মহারাজ, এই ব্যক্তি পূর্বজন্মেও এইরূপ প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছিল।" অতঃপর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত তাঁর একঅমাত্যকে কোন প্রত্যন্ত গ্রামের দায়িত্বে নিযুক্ত করে পাঠালেন। পূর্বোক্ত ঘটনার মতই এই ব্যক্তিও সেখানে গিয়ে অবিকল সেইরূপই করেছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বাণিজ্যের কারণে প্রত্যন্ত গ্রামগুলি ভ্রমণ করছিলেন এবং ঘটনাক্রমে সেইদিন সেই গ্রামেই অবস্থান করছিলেন। যখন গ্রামাধ্যক্ষ সন্ধ্যাবেলা বহু লোকজন সঙ্গে নিয়ে ভেরী বাজাতে বাজাতে গ্রামে ফিরে আসছিল, তখন তিনি বলেছিলেন "এই দুষ্ট অধ্যক্ষ দস্যুদের সঙ্গে মিলে গ্রাম লুঠ করিয়েছে; এখন দস্যুরা পালিয়ে গিয়ে বনে প্রবেশ করছে দেখে ভেরী বাজাতে বাজাতে ফিরে আসছে — যেন কি ঘটেছে তার বিন্দুবিসর্গ ও জানেনা।" অচিরে তার কুকীর্তি রাষ্ট্র হল এবং রাজা তার দোষানুরূপ দণ্ডবিধান করলেন। কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, 'তখন এই গ্রামাধ্যক্ষ ছিল সেই গ্রামাধ্যক্ষ এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।'

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খরপুত্ত জাতক (খরপুত্র জাতক) — ৩৮৬ নং

এক ভিক্ষু তাঁর গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়েছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে বলেছিলেন, "দেখ ভিক্ষু, তোমার এই স্ত্রী অনর্থকারিকা, পূর্বেও

তুমি এর জন্য আগুনে পুড়ে মরতে যাচ্ছিলে, কেবল পণ্ডিতদের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হয়েছিল।" এই বলে শাস্তা সেই অতীত কাহিনী আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে রাজা সেনক-এর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শক্র ছিলেন। গ্রাম্য বালকেরা একদিন এক নাগরাজকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে বোধিসত্ত্ব তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এর ফলে নাগরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সে রাজাকে বহু ধনরত্ন দিল এবং একটি নাগকন্যাকে রাজার রক্ষণার্থে নিযুক্ত করে রাজাকে একটি মন্ত্র দিয়ে বলল, "যখন এই কন্যাকে দেখতে পাবেন না, তখন এই মন্ত্র আবৃত্তি করবেন।"

সেনক একদিন ঐ নাগকন্যার সঙ্গে উদ্যানে গেলে সেখানে নাগকন্যা অন্য একটি নাগকে দেখে মানুষের দেহ ত্যাগ করে তার সঙ্গে কুক্রিয়ায় রত হল। রাজা নাগকন্যাকে দেখতে না পেয়ে সেই মন্ত্রের প্রয়োগ করে তাকে কুক্রিয়ায় রত দেখতে পেলেন এবং নাগকন্যাকে খুব প্রহার করলেন। সে এতে ক্রুদ্ধ হয়ে নাগভবনে ফিরে গেল এবং নাগরাজকে গিয়ে বলল রাজা তাকে খুব প্রহার করেছে। নাগরাজ প্রকৃত ঘটনা জানত না, তাই চারজন নাগবালককে রাজা সেনক-কে মেরে ফেলার জন্য পাঠালো। নাগবালকেরা যখন রাজার ঘরে প্রবেশ করল সেই সময় রাজা রাণীকে নাগকন্যার বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিলেন। নাগবালকেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে নাগরাজকে এসে প্রকৃত ঘটনা বলল। শোনামাত্র নাগরাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং এমন একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিল যার প্রভাবে রাজা সমস্ত প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারত। নাগরাজ আরও বলল, রাজা যদি এই মন্ত্র অন্য কাউকে শেখান তাহলে তৎক্ষণাৎ আগুনে পুড়ে রাজার মৃত্যু হবে। রাণী এই রহস্য জেনে ফেলল এবং মন্ত্র শেখালে রাজার মৃত্যু হবে জেনেও মন্ত্র শেখাবার জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। স্ত্রৈণতা বশতঃ রাজা রাজি হলেন এবং রাণীকে মন্ত্র শিখিয়ে নিজে পুড়ে মরার জন্য রথে করে উদ্যানের দিকে চললেন। দেবরাজ শক্র তখন রাজার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁর স্ত্রী সুজাকে ছাগী করে নিজে ছাগের রূপ ধারণ করে রাজরথের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে কেবল রাজরথের সৈন্ধব ঘোড়া এবং রাজা নিজে দেখতে পেলেন, অন্য কেউ দেখতে পেলনা। তিনি এমনভাবে দেখা দিলেন যেন ছাগীর সঙ্গে মৈথুন ধর্মে রত হয়েছেন। রথবাহী সৈন্ধব ঘোড়া ঐ দৃশ্য দেখে তাকে মূর্খ ও নির্লজ্জ বলে গাল দিল। তখন ছাগরূপী শক্র ঘোড়াকে বললেন, তুমিও মূর্খ, কিন্তু তুমি যে রথ টানছ তার আরোহী রাজা সেনক তোমার থেকেও বেশী মূর্খ। রাজা উভয় প্রাণীরই কথা বুঝতে পারলেন এবং নিজে রথ থেকে নেমে রাণীসহ রথ ফেরত পাঠালেন। তারপর শক্রকে রাণীর কাছে কৃত অঙ্গীকার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। শক্র তাঁকে উপায় শিখিয়ে দিলেন এবং শক্রর উপদেশানুসারে রাজা রাণীকে গিয়ে বললেন যে রাণী যদি মন্ত্র গ্রহণ করতে চায় তাহলে মন্ত্র গ্রহণের উপচার হিসাবে রাণীর পিঠে একশবার আঘাত করা হবে, কিন্তু রাণী কোনরকম আওয়াজ করতে পারবেনা। রাণী মন্ত্র পাবার লোভে তাতেই রাজি হল। দুই তিনবার আঘাত সহ্য করার পর রাণী চীৎকার করে বললেন তাঁর আর মন্ত্রের

প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাজা ছাড়লেন না, 'তুমি আমাকে মেরে মন্ত্র নিতে চেয়েছিলে' বলে রাণীর পিঠ নিশ্চর্ম করে দিলেন। রাণীর সাধ্য রইল না যে মন্ত্রের কথা আর মুখে আনেন।

কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিলেন সেই রাজা, এঁর পত্নী ছিল সেই রাণী, সারিপুত্র ছিলেন সেই অশ্ব এবং আমি ছিলাম শক্র।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-III ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ৩য় খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খরাদিয় জাতক (খরাদিয়া জাতক) — ১৫ নং

শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ভিক্ষু সম্বন্ধে এই কথা বলেছিলেন। সেই ভিক্ষু অত্যন্ত অবাধ্য ছিলেন; তিনি কোনরূপ উপদেশ শুনতেন না। শাস্তা তাকে বললেন, "তুমি পূর্বজন্মেও বড় অবাধ্য ছিলে এবং পণ্ডিতদের উপদেশ না শুনে বন্দী হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব মৃগজন্ম গ্রহণ করে মৃগদের অধিপতি হয়ে বনে বনে বিচরণ করতেন। একদিন তাঁর ভগিনী নিজের পুত্রকে বোধিসত্ত্বের কাছে নিয়ে এলো মৃগমায়া (মৃগেরা যে কৌশলের দ্বারা ব্যাধ প্রভৃতি শক্র থেকে আত্মরক্ষা করে) শিক্ষার জন্য। বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়কে বললেন, "বৎস, তুমি অমুক অমুক সময়ে আমার কাছে আসবে, আমি তোমাকে মৃগমায়া শেখাবো।" কিন্তু সে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হত না; সে একদিন নয়, দুদিন নয়, সাতদিন পর্যন্ত বোধিসত্ত্বের কাছে গেল না; কাজেই সে কিছুই শিখতে পারল না। সুতরাং একদিন চরতে গিয়ে সে ফাঁদে আটকে পড়ল এবং শিকারীরা তাকে মেরে ফেলল। কাহিনী শেষ করে বুদ্ধ বললেন, "তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল মৃগশাবক; উৎপলবর্ণা ছিলেন খরাদিয়া (সেই মৃগশাবকের মা) এবং আমি ছিলাম মৃগদের অধিপতি।"

[দ্রষ্টব্য : V. Fausboll, Jataka with Commentary, Vol-I ; ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম খণ্ড]

শুভ্রা বড়ুয়া

খলাতিয় পেতবত্থু —

এটি একটি বারবণিতার কাহিনী। সে সুন্দর চুলের অধিকারিণী ছিল, কিন্তু কোন এক শক্রর চক্রান্তে সে তার চুল হারায়। একসময় সে কয়েকজন ঘুমন্ত ব্যক্তির বস্ত্র চুরি করেছিল এবং অন্য একসময় সে একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দান করেছিল। পরে একটি সামুদ্রিক বিমানে সুন্দর চুলযুক্ত বিবস্ত্র প্রেতরূপে তার জন্ম হয়। সুবর্ণভূমিতে যাত্রার পথে কয়েকজন বণিক তার কাহিনী শুনে তার হয়ে তাদেরই দলের একজন সৎ ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করার ফলে সেই প্রেত তৎক্ষণাৎ বস্ত্র লাভ করল। পরে সেই বণিকেরা তার নামে বুদ্ধকে ভিক্ষান্ন দান করল এবং এর ফলে সেই প্রেত তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল।

[দ্রষ্টব্য : পেতবত্থু (পি. টি. এস.), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০; পেতবত্থু অট্‌ঠকথা, পৃঃ ৪৬; G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol-I P. 715]

শুভ্রা বড়ুয়া

খলুপচ্ছাভত্তিকংগ (খলুপশ্চাদ্ভক্তিকাঙ্গ)

১৩টি ধুতাঙ্গ (বা ধূতাঙ্গ) - এর মধ্যে এটি সপ্তম। ধুতাঙ্গের অর্থ পবিত্রতার উপায়। তৃষ্ণা বা আসক্তি ও লোভ ধুনবার বা বিধ্বংস করবার উপায়। ভগবান বুদ্ধ কৃচ্ছ্র সাধনের পক্ষপাতী না হলেও যে সমস্ত ভিক্ষুর চিত্ত কৃচ্ছ্র সাধনায় আকৃষ্ট হত তিনি তাঁদের জন্য ১৩ প্রকার কঠোর সাধনার বিধান দিয়েছিলেন।

খলুপচ্ছাভত্তিক অর্থ 'পরে ভোজন গ্রহণ না করার বিধান।' একবার ভোজন শেষ করে পুনরায় ভোজন গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা। নিমন্ত্রিত হয়ে পশ্চাৎলব্ধভক্ত পশ্চাৎভক্ত। খলু প্রতিষেধনার্থে নিপাত। ন পশ্চাৎভক্তিক খলু পশ্চাৎভক্তিক। এটির অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে খলু এক শকুনিকের নাম যে মুখে ফল গ্রহণ করে তা পড়ে গেলে অন্য ফল খায় না। এই ভিক্ষুও সেইরূপ, তাই খলু-পশ্চাৎভক্তিক। তার অঙ্গ খলুপশ্চাদ্ভক্তিকাঙ্গ(Eastern Monachism by R. Spence Hardy)। বিশুদ্ধি মার্গের 'ধুতাঙ্গ নির্দেশ' পরিচ্ছেদে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

[দ্রষ্টব্য : Childers' Pali Dictionary, P. 310]

শুভ্রা বড়ুয়া

খানু কোণ্ডঞ্ঞ —

ইনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি ভগবান বুদ্ধের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে জঙ্গলে গিয়ে ধ্যান সাধনা করে অল্পদিনেই অর্হত্ব লাভ করেন। অর্হত্বপ্রাপ্তির পর ভগবানের দর্শনার্থে জেতবনের দিকে যাবার পথে ক্লান্ত হয়ে একটি পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করার সময় তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। রাত্রে একদল চোর কোন গ্রামে চুরি করে গাঠরী বেঁধে সমস্ত মালপত্র নিয়ে ঐ পথে যাবার সময় ঐ স্থবিরকে গাছের গুঁড়ি ভেবে স্থবিরের উপর সমস্ত মালপত্র চাপিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। সকাল হলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে স্থবিরের কাছে ক্ষমা চাইল এবং স্থবিরের ধর্মোপদেশ শুনে তারা তাঁর কাছে প্রব্রজিত হল। এই ঘটনার ফলে স্থবির কোণ্ডঞ্ঞ 'খানু (গুঁড়ি) কোণ্ডঞ্ঞ' নামে অভিহিত হলেন। খানু কোণ্ডঞ্ঞ স্থবির তাদেরকে নিয়ে ভগবানের কাছে এলে ভগবান নবাগত ভিক্ষুদের সমস্ত কথা শুনে বললেন "হে ভিক্ষুগণ, প্রজ্ঞাহীন ও একাগ্রতা রহিত হয়ে একশ বছর জীবিত থাকা অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান এবং ধ্যানীর একদিন জীবিত থাকাও শ্রেয়।

[দ্রষ্টব্য : ধম্মপদ, শ্লোক নং ১১১; ধম্মপদট্‌ঠকথা (পি. টি. এস.) ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৪; Dictionary of Pali Proper Names, Vol-I, P. 716]

শুভ্রা বড়ুয়া

খানুমত

মগধের একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। মগধের রাজা বিম্বিসার পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে এই গ্রামটি দান করেছিলেন। এখানকার মনোরম অম্বলট্ঠিক উদ্যানে বুদ্ধ কূটদন্ত সূত্র দেশনা করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য : দীঘনিকায়, ১ম, ১২৭; Dictionary of Pali Proper Names. Vol-I, P. 716]

শুভ্রা বড়ুয়া

খিতক থেক (ক্ষিতক স্থবির)[১] —

খিতক নামধারী এই ব্যক্তি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বুদ্ধের অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের অন্যতম মহামৌদ্গল্যায়ন স্থবিরের ঋদ্ধি প্রভাব সম্বন্ধে শুনে তিনিও ঋদ্ধিশালী হবার সংকল্প করে সংঘে প্রবেশ করলেন এবং পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের ফলে ষড়ভিজ্ঞা (অভিজ্ঞা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পালিতে অলৌকিক জ্ঞান অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে- 'অভিজ্ঞা' দ্রষ্টব্য) সহ অর্হত্ব লাভ করলেন।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় তিনি যক্ষসেনাপতিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্মে তিনি বুদ্ধের দর্শন লাভ করে তাঁকে বন্দনা করেন এবং বুদ্ধ তাঁকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। আশি কল্প পূর্বে তিনি সুমঙ্গল নামক রাজা হয়েছিলেন। অপদানে উল্লিখিত সুপারিচরিয় এবং খিতক স্থবিরকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়।

[দ্রষ্টব্য : থেরগাথা, গাথা নং ১০৪; থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২০৯; অপদান, ১ম, ১৮১; Dictionary of Pali Proper Names. Vol-I, P. 717]

শুভ্রা বড়ুয়া

খিতক থের [২]

কোশল রাজ্যের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ লাভের পর সংঘে প্রবেশ করেছিলেন। অর্হত্বলাভ করার পর তিনি অরণ্যবাসী ভিক্ষুদের সঙ্গে অরণ্যে বাস করতেন।

পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় তিনি বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেইসময়ে উদ্যান রক্ষকরূপে কাজ করে জীবনযাপন করতেন। একদিন ভগবানকে আকাশপথে যেতে দেখে একটি নারকেল দান দিতে ইচ্ছা করলেন, ভগবান তাঁর প্রতি সদয় হয়ে আকাশ থেকে ঐ দান গ্রহণ করেন।

খিতকস্থবির এবং অপদানে উল্লিখিত নাড়িকের দায়ক স্থবিরকে অভিন্ন মনে করা হয়। তাঁর অপদান গাথাগুলি কুণ্ডল নামধারী স্থবিরের গাথাতেও পাওয়া যায় (থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম, ৭২)

[দ্রষ্টব্য : থেরগাথা, গাথা নং ১৯১-২; থেরগাথা অট্ঠকথা ৩১৫; অপদান, ২য়, ৪৪৭; Dictionary of Pali Proper Names. Vol-I, P. 717]

শুভ্রা বড়ুয়া

(১) খুজ্জসোভিত থের

ইনি একজন অর্হৎ। ইনি পাটলিপুত্র নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি সামান্য কুব্জ ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'কুব্জশোভিত' বলা হয়েছে। প্রতিভার ব্যাপ্তি, বোধ ও বোধির অনুপম ঐশ্চর্যে তিনি সকলের বন্দনীয় হয়েছিলেন। খুজ্জসোভিত ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর আনন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরু আনন্দের তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয় শিষ্য। সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতির প্রারম্ভে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সঙ্গীতি স্থানে আনন্দকে আনয়নের জন্য। কারণ আনন্দকে বাদ দিয়ে সঙ্গীতির কাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা করে তিনি আনন্দকে সংবাদ প্রেরণ করেন এবং আকাশ পথে আনন্দের অর্হত্ব প্রাপ্তি এবং আনন্দের আগমন সংবাদ গুহাদ্বারবাসী দেবতাকে প্রদান করেন। এই দেবতা মারের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অতীতে পদুমুত্তর বুদ্ধকে বৃহৎ ভিক্ষু সংঘসহ পথ চলতে দেখে খুজ্জসোভিত দশটি স্তবকে রচিত বন্দনা গীতি গান করেন। (অপদান, ২য়, পৃঃ ৪১০ থেকে) সম্ভবতঃ অপদানের 'সয়ংপটিভানিয়' এবং খুজ্জসোভিত একই ব্যক্তিত্ব।

[দ্রষ্টব্য : থেরগাথা, PTS, ২৩৬-৬ থেরগাথা, অট্ঠকথা ১-৩৫০ পৃঃ]

আশা দাশ

(২) খুজ্জসোভিত থের

ইনি একজন প্রাচীন পন্থী ভিক্ষু। তিনি বৈশালীতে দশটি অসংযত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রাচীন পন্থী ও বৈশালী ভিক্ষুদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহাবংশ মতে তিনি আনন্দের শিষ্য। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত খুজ্জসোভিত এবং বর্তমান খুজ্জসোভিত এক ও অভিন্ন। বর্তমান খুজ্জসোভিতও একজন অর্হৎ। তিনি বিরোধী মতাবলম্বীদের পক্ষাবলম্বন করেন নি। অবশ্য দুই খুজ্জসোভিতের এই অভিন্নত্ব শত বৎসরের ব্যবধানে স্বীকৃতি যোগ্য নয়।

[দ্রষ্টব্য : বিনয়, ২য়, পৃঃ ৩০৫; দীপবংস, ৪র্থ]

আশা দাশ

খুজ্জুত্তরা

ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতমা মহিষী শ্যামাবতীর দাসী খুজ্জুত্তরা ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ উপাসিকা। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং তাঁকে বহুশ্রুতা উপাসিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠারূপে নির্দেশ করেন। ইতিপূর্বে তিনি শ্রেষ্ঠী ঘোষিতের গৃহে এক ধাত্রিকন্যা ছিলেন। রাণী শ্যামাবতী তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট রাজবরাদ্দ আটটি মুদ্রা দিয়ে প্রত্যহ খুজ্জুত্তরাকে পুষ্প ক্রয়ের জন্যে প্রেরণ করতেন। খুজ্জুত্তরা চারটি মুদ্রা দিয়ে ফুল এনে অবশিষ্ট চারটি নিজের কাছে রেখে দিতেন। একদিন বুদ্ধ সেই মালীর কাছে এলেন এবং খুজ্জুত্তরাও ফুল নিতে সুমনের কাছে এসে ভগবানের প্রদত্ত ধর্মোপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হলেন। সুমনের কাছ থেকে সেদিন খুজ্জুত্তরা সব মুদ্রা দিয়ে পুষ্প নিয়ে এলেন। রাণী যখন জানতে চাইলেন যে এত ফুল খুজ্জুত্তরা কি করে পেলেন খুজ্জুত্তরা সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। এমন কি নিজের কুকীর্তিও গোপন করলেন

না। রাণী শ্যামাবতী সেদিন থেকে খুজ্জুত্তরাকে পূর্ণ সম্মান দিতে থাকলেন। সুগন্ধি মাখিয়ে তাঁকে স্নান করিয়ে তাঁর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনলেন। খুজ্জুত্তরাকে রাণী মায়ের ন্যায় সম্মান করতেন। খুজ্জুত্তরা প্রতিদিন বুদ্ধের কাছে গিয়ে ধর্মশ্রবণ করতেন এবং ফিরে এসে রাণী ও তাঁর পাঁচশ সহচরীকে সেই ধর্মকথা শোনাতেন। খুজ্জুত্তরার শিক্ষায় তাঁরা প্রত্যেকেই স্রোতাপন্ন হলেন। শ্যামাবতী একদিন বুদ্ধ দর্শনের অভিলাষ ব্যক্ত করলে খুজ্জুত্তরা পরামর্শ দিলেন প্রাসাদ প্রাকারে ছিদ্র করে বুদ্ধ যখন এই পথে যাবেন তাঁকে দর্শন করতে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শ্যামাবতী ও তাঁর পাঁচশ সহচরীর মৃত্যু হলে খুজ্জুত্তরা ধর্মকার্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। কথিত আছে খুজ্জুত্তরা সেই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন কারণ তিনি পূর্বজন্মে রাণী বা তাঁর সহচারীদের এধরণের পাপকর্মে সহায়তা করেন নি। অগ্নিকাণ্ডের সময় তিনি প্রাসাদে ছিলেনই না উপরন্তু ঘটনাস্থল থেকে দশযোজন দূরে ছিলেন।

অতীতে খুজ্জুত্তরা বারাণসীরাজের সেবিকা ছিলেন এবং একদিন কিঞ্চিৎ কুব্জ এক প্রত্যেক বুদ্ধকে (পালি — পচ্চেকবুদ্ধ) দেখে তাঁকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে নিজের ঘাড়ে কম্বল চাপিয়ে প্রত্যেক বুদ্ধের ভঙ্গীর অনুকরণ করেন। এই দুষ্কৃতির ফলে পরবর্তী কালে নিজে কুব্জ হয়ে জন্মালেন এবং খুজ্জুত্তরা (বা কুব্জ-উত্তরা) রূপে অভিহিত হলেন। অপর এক সময়ে আটজন প্রত্যেক বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র উষ্ণ পায়সান্ন পূর্ণ হওয়ায়, তাঁরা সেগুলি নিয়ে বার বার হাত পরিবর্তন করছিলেন দেখে খুজ্জুত্তরা তাঁদের আটটি গজদন্ত নির্মিত পেটিকা দান করেন। কথিত আছে এই অষ্টপেটিকা 'নন্দমূলোপাব্ভারে' রক্ষিত। এই পুণ্যকর্মের ফলে খুজ্জুত্তরা ইহজন্মে (গৌতম বুদ্ধের সময়) প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন এবং ত্রিপিটক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হন।

কাশ্যপ বুদ্ধের সময় খুজ্জুত্তরা এক কোষাধ্যক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই ভিক্ষুণী খুজ্জুত্তরার কাছে এলে কোন দাসী নিকটে উপস্থিত না থাকায় খুজ্জুত্তরা স্বীয় সাজসজ্জার জন্যে তাঁকে দিয়েই সব কাজ করিয়ে নিতে থাকেন। এই অপরাধে তিনি দাসীরূপে জন্ম লাভ করেন।

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় উপাসিকাদের মধ্যে বহুশ্রুতারূপে শ্রেষ্ঠ এক উপাসিকাকে বুদ্ধ যখন অভিহিত করছিলেন তখন সেই রমণীকে দেখে খুজ্জুত্তরারও অনুরূপ বাসনা জাগে। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি সেই স্থান অর্জন করেছিলেন। অর্থকথায় খুজ্জুত্তরাকে 'কামভোগিনীয়' নারীদের অন্যতম বলে অনেক সময় উল্লেখ করা হয়েছে। গৃহী হয়েও খুজ্জুত্তরা পটিসম্ভিদা অর্জন করেন। কিন্তু এই পটিসম্ভিদা সেখিয় (শৈক্ষ) পটিসম্ভিদারূপে বিবেচ্য। 'উরগ জাতক' ও 'ভিসজাতকে' তাঁকে ধাত্রীকন্যা (Slave-girl) এবং 'চুল্লসুত সোমজাতকে' সেবিকা বা দাসীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্যে খুজ্জুত্তরা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারতেন। কথিত আছে ইতিবুত্তকের আলোচ্য বিষয়বস্তুই খুজ্জুত্তরা বুদ্ধদেবের কাছ থেকে শিক্ষা করেন এবং শ্যামাবতী ও তাঁর পাঁচশ সহচরীকে উপদেশ দেন।

[দ্রষ্টব্য :

1) Manorathapuraṇi— Vol-I, Page, 226f, 232f, 237f, S.H.B. ed M. Walleser, P.T.S., 1973

2) Aṅguttaranikāya, Vol-I, Page, 26f, 88f, ed. by R. Morris and E. Hardy, P.T.S., 1961

3) Saṃyuttanikāya, Vol-II, Page, 236f, P.T.S., ed. by, L. Fee and Mrs. Rhys Davids, London, 1884-1904

4) Dhammapada Aṭṭhakathā, Vol-I, Page, 208ff, 226f, Vol-III, 910, ed. by. H.C. Norman, P.T.S. 1912-1914

5) Itivuttaka Aṭṭhakathā, Page, 23f, 32f, P.T.S

6) Paṭisambhidāmagga Commentary, Page, 498f, S.H.B.

7) Jātaka, ed. by. Fousboll, Vol-III 168f, Vol-IV, Tr-by. E.B. Cowel. 314f. V-192f, 312f. P.T.S.

8) Udāna Aṭṭhakathā, Page 384, P.T.S.

9) Dictionary of Pali Proper Names ed. by G.P. Malalasekera 2 Vols, London, 1960]

ঐশ্বর্য্য বিশ্বাস

খুদ্দক নিকায়

খুদ্দক নিকায় সুত্তপিটকের শেষ ও পঞ্চম ভাগ। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ ১৫টি গ্রন্থের সমষ্টি। এই নিকায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ গদ্যে রচিত। পদ্যে রচিত গ্রন্থগুলি পালি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থ সমূহের অধিকাংশ প্রাচীন। কিছু কিছু গ্রন্থ পরবর্তীকালের রচনা বলে অনুমান করা হয়। ১৫টি গ্রন্থ হল :—

খুদ্দকপাঠ
ধম্মপদ
উদান
ইতিবুত্তক
সুত্তনিপাত
বিমানবত্থু
পেতবত্থু
থেরগাথা
থেরীগাথা
জাতক
নিদ্দেস (মহা, চুল)
পটিসম্ভিদা মগ্গ
অপদান
বুদ্ধবংস
চরিয়া পিটক

কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির মতে সমগ্র বিনয়পিটক, অভিধর্ম পিটক এবং ভগবান বুদ্ধের দেশনা যা চারি নিকায়ের অন্তর্গত হয়নি তৎসমুদয় খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত। দীঘ ভাণকগণ খুদ্দকপাঠ, চরিয়া পিটক এবং অপদান গ্রন্থকে বিশুদ্ধতা দিতে বা মূল গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি দিতে রাজী হননি। এঁরা অন্য গ্রন্থগুলিকে অভিধম্ম পিটকের অন্তর্গত করেছেন। মজ্ঝিম ভাণকগণ খুদ্দক পাঠের প্রাচীনত্ব অস্বীকার করেছেন। অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে এঁরা সুত্ত পিটকের তালিকাভুক্ত করেছেন। ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহ্য পরবর্তীকালে রচিত আরো চারটি গ্রন্থ যথা — মিলিন্দপঞ্হো, সুত্তসংগহ, পেটকোপদেস, এবং নেত্তিপ্পকরণকে খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত করেছে। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলি বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই নিকায়ের ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, থেরগাথা, থেরীগাথা, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক — গ্রন্থগুলি গাথায় রচিত। ছন্দবৈচিত্র্যও খুবই উল্লেখযোগ্য ও উন্নতমানের। জাতক ও অন্যান্য গ্রন্থগুলি গদ্য ও গাথার সংমিশ্রণে রচিত।

সমন্তপাসাদিকা, ১ম, পৃঃ ১৮, ২৭
দীঘ অট্ঠকথা, ১ম, পৃঃ ১৭, ২৫
Bode, Pali Licarature of Burma.
B. C. Law, History of Pali Literature
ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য

আশা দাশ

খুদ্দক পাঠ

খুদ্দক পাঠ সাধারণত খুদ্দক নিকায়ের ১৫টি গ্রন্থের প্রথম গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। দীঘভাণক এবং মজ্ঝিমভাণকগণ এই গ্রন্থকে ত্রিপিটকের অন্তর্গত করেননি। বলা হয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হতে ইহা সঙ্কলন করা হয়েছে। সম্ভবতঃ গ্রন্থটি সিংহলে রচিত এবং শ্রমণ ও নব প্রব্রজিতদের শিক্ষার জন্য এই আবৃত্তিযোগ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য এই যে, গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্গতরূপে প্রথম উল্লিখিত হয়েছে অট্ঠকথায়। মিলিন্দপঞ্হো গ্রন্থেও খুদ্দকপাঠের উল্লেখ নেই। খুদ্দকপাঠের সঙ্কলন পঞ্চনিকায়-এর অন্যান্য গ্রন্থসমূহের পরে হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। খুদ্দকপাঠ গ্রন্থে নয়টি বিভাগ বা অংশ আছে। যথা —

সরণত্তয়
দসসিক্খাপদ
দ্বাত্তিংসাকারো
কুমারপঞ্হ এবং আরো পাঁচটি সুত্ত, যথা —

১) মঙ্গল সুত্ত
২) রতন সুত্ত
৩) তিরকুড্ডসুত্ত
৪) নিধিকণ্ড সুত্ত
৫) মেত্তসুত্ত

এই পাঁচটি সুত্ত শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ভারতে বিপদ ও অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'পারিত্রাণ সূত্র' রূপে পাঠ করা হয়। বিবাহ, গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ এবং অন্নপ্রাশনেও বৌদ্ধরা এইগুলি আবৃত্তি করেন।

এই সমস্তগুলিই ত্রিপিটকের অন্তর্গত।

খুদ্দক পাঠ গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন বুদ্ধ ঘোষ। টীকা গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম ৪টি পাঠ থেকেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'খুদ্দক পাঠ'। কারণ এগুলি পরবর্তী সুত্ত সমূহ অপেক্ষা আকারে ছোট।

খুদ্দক পাঠ, পি. টি. এস.

খুদ্দক পাঠ অট্ঠকথা, পৃঃ ৩

গন্ধবংস, পৃঃ ৫৯, ৬৮

B. C. Law, History of Pali Literature Vol-I,

ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য

আশা দাশ

খুরপ্প জাতক

জাতক সংখ্যা ২৬৫। খুরপ্প (সং ক্ষুরপ্র) হল একপ্রকার তীর বা ফলক যেটি অশ্বখুরাকৃতি।

একবার শাস্তা যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন তখন একজন নিরুৎসাহী ভিক্ষুকে উৎসাহ দেবার জন্য আখ্যানটি বিবৃত করেন।

শাস্তা বোধিসত্ত্ব জন্মে একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বনরক্ষক কুলে জন্মগ্রহণ করে পরে পাঁচশত বনরক্ষকের নেতা হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব বনসমীপস্থ এক গ্রামে বাস করে বেতন নিয়ে পথিকদের বনপার করিয়ে দেবার কাজ করতেন। একসময়ে বারাণসীবাসী একজন বণিকপুত্রের পাঁচশত শকটসহ বনপার করবার সময়ে পাঁচশত দস্যু তাদের আক্রমণ করে। এতে অন্যান্য বনরক্ষকরা পালিয়ে গেলেও বোধিসত্ত্বরূপী বনরক্ষক কিন্তু সেই পাঁচশতজন দস্যুর সঙ্গে একাই লড়াই করে দস্যুদিগকে বন থেকে তাড়িয়ে দেন। এতে বণিকপুত্র হতচকিত হয়ে বোধিসত্ত্বের ভয় না পাবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে তিনি মানসিকভাবে এতই শক্তিশালী ও নির্ভীক ছিলেন যে দস্যুগণ ভয়েই পালিয়ে যায়। উপরন্তু যখনই তিনি বণিকপুত্রের কাছ থেকে বেতন নিয়েছেন তখনই তিনি সানন্দেই সেটি গ্রহণ করে জীবন উৎসর্গ করবার মনস্থ করেছিলেন এবং আনন্দিত মনেই তিনি তা করেছেন।

পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্বরূপী সাহসী বনরক্ষকই হল ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং।

দ্রষ্টব্য ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ বিরচিত 'জাতক', ২য় খণ্ড মললসেকের বিরচিত ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭২৩।

মণিকুন্তলা হালদার দে

খেমক থের (ক্ষেমক স্থবির)

সংযুক্ত নিকায়ে বর্ণিত একজন অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত স্থবির। একসময়ে খেমক যখন কোশাম্বীর নিকটবর্তী বদরিকারাম উদ্যানে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন ঘোষিতারামে বসবাসকারী দাসক নামে একজন ভিক্ষু খেমকের অসুস্থতার খবর নিতে তাঁর কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন যে তিনি শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন কিনা। দাসক ফিরে এসে জানান যে খেমক থের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছেন না। তখন দাসককে খেমকের কাছে পাঠান হয় যে পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আছে কিনা জানতে। কিন্তু দাসক থের পূর্ণবার জানান যে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। এতে খেমক থের অর্হত্ত্ব লাভ করেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান যে তিনি অর্হৎ নন। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি না বললে 'আত্মা' সম্পর্কে খেমককে প্রশ্ন করা হয়। এরপর খেমক স্বয়ং ঘোষিতারামে ঋদ্ধিবলে চলে আসেন এবং উত্তরে বর্ণনা করেন যে আর্যগণ কিভাবে পাঁচটি নিম্নস্তরের বন্ধন ছিন্ন করেছেন ও 'আমিত্ব' সংজ্ঞা বর্জন করেছেন। এরপর খেমক ও তাঁর ষাট হাজার অনুচর অর্হত্ত্বলাভ করেন।

[দ্রষ্টব্য : সংযুক্ত নিকায়, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১২৬ ইত্যাদি।]

সারত্থপ্পকাসিনীতে (সংযুক্ত অট্ঠকথা) বলা আছে যে খেমক অত্যন্ত উচ্চমার্গে বিচরণ করতেন ও তিনি শিক্ষাদানও করেছিলেন। অট্ঠকথা থেকে আরও জানা যায় যে ঘোষিতারামের ভিক্ষুগণ ইচ্ছে করেই খেমকের কাছে যাননি কারণ তাঁর কুটির অত্যন্ত ছোট ছিল।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭২৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

খেমা (ক্ষেমা) থেরী

ভগবান বুদ্ধের নারী শিষ্যাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। ইনি মদ্দ (মদ্র) দেশের সাগল নগরে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে খেমা নামে পরিচিত হন। ইনি মগধরাজ বিম্বিসারের প্রধাণা মহিষী ছিলেন। থেরীগাথা থেকে জানা যায় যে ইনি গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্বাপূর্ব বুদ্ধগণ যথা — পদুমুত্তর বুদ্ধ, বিপসিস বুদ্ধ, ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন ও কস্যপ বুদ্ধের সময়কালে বৌদ্ধসংঘের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রকার কুশলকর্ম ও দানধ্যান করেছিলেন। পূর্বে খেমা স্বর্ণবর্ণা ও অতীব সুন্দরী ছিলেন বলে তাঁর মনে অহঙ্কার জন্মেছিল। গৌতমবুদ্ধ যখন মগধের বেলুবনে অবস্থান করছিলেন তখন খেমা বুদ্ধ দর্শনে প্রথমে যাননি। পরে যখন খেমা বুদ্ধের কাছে যান তখন বুদ্ধ সৌন্দর্য গর্বিতা খেমার মনভাব বুঝতে পেরে নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক স্বর্গের অপ্সরার সৃষ্টি করেন যিনি বুদ্ধকে তালবৃন্তের দ্বারা ব্যজন করতে থাকেন। এই ঘটনায় খেমার মনে খেদ জন্মায় যে স্বর্গের দেবীর ন্যায় সৌন্দর্যশালিনী নারীগণ কর্তৃক বুদ্ধ পরিবেষ্ঠিত, তার তুলনায় এদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি হীন অভিমান করেছেন। এরপর বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিবলে সেই অপ্সরাগণ যৌবন থেকে মধ্যবয়েস ও মধ্যবয়েস থেকে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে দন্তহীন, পক্ককেশ ও লোলচর্ম হয়ে শেষে তালবৃন্ত হাতে নিয়েই ভূমিতে পতিত হয়। এদের পরিণতি দেখে খেমা পূর্বজন্মের

কুশল ফলহেতু বুদ্ধের মনভাব অনুধাবন করে বুঝতে পারেন যে খেমারও বয়স কালে একই দশা ঘটবে। এরপর বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে অর্হত্ত্বলাভ করেন। থেরীগাথায় (ষষ্ঠ ৫২নং) উল্লেখ আছে যে তিনি বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুগণ কর্তৃক অর্ন্তদৃষ্টিতে সর্বপ্রধানা রূপে স্বীকৃত হন।

[দ্রষ্টব্য ঃ অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম, ২৫; দীপবংসে ১৮ অধ্যায়, ৯; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭২৭]

মণিকুন্তলা হালদার দে

খোমদুসস

শাক্যদের একটি জনপদ। পণ্ডিত মললসেকেরর মতে হয়তো এটি এক ব্রাহ্মণের নামে তৈরী হয়েছে। এস্থানের ব্রাহ্মণ গৃহপতিদের কাছে গিয়ে বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করেছিলেন। কথিত আছে এখানকার ব্রাহ্মণরা বুদ্ধের প্রথমে বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন পরে বুদ্ধ এদের জয় করে নেন। (সংযুক্ত নিকায়, ১ম, ১৮৪)। এস্থানে সৌখিন বস্ত্র (খোমদুসস) পাওয়া যেত বলে জায়গাটি নামকরণ হয় খোমদুসস।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩০]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গগ্গ জাতক (গর্গ জাতক)

জাতক নং ১৫৫। জাতকটি হাঁচিসম্পর্কীয়। একবার বুদ্ধ জেতবনের রাজাকারাম উদ্যানে ধর্মালাপ করার সময় হাঁচি দিলে অন্যান্য ভিক্ষুরা 'জীবতু ভন্তে ভগবা জীবতু সুগতো' বলে কোলাহল করে উঠলে ধর্মকথায় বাধা পরে। তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদের বলেন যে সংস্কার অনুযায়ী 'জীব' বললেই যে আয়ুবৃদ্ধি হবে আর জীব না বললেই যে আয়ুঃক্ষয় হবে এটা ঠিক নয়। এটি বললে বিনয়জনিত পাপ হয়। তখন সাধারণ লোকেরা ভিক্ষুরা হাঁচলেই 'জীবথ ভন্তে' বললে ভিক্ষুরা কোন উত্তর দিত না। উত্তর না পেয়ে লোকেরা ভিক্ষুদের নিন্দে করতে শুরু করলো। একথা জানতে পেরে বুদ্ধ ভিক্ষুদের বললেন যে গৃহীরা মঙ্গলকামী। তাইজন্য ভিক্ষুরা যেন গৃহীদের হাঁচির উত্তরে 'চিরংজীব' বলেন। তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন যে হাঁচির উত্তরে 'জীব' বললে প্রত্যুত্তরে 'চিরজীবী হও' বলে প্রত্যাশীর্বাদ করার প্রথা কখন প্রবর্তিত হয়েছে। বুদ্ধ তখন অতি প্রাচীনকাল থেকেই এটি চলছে বলে এপ্রসঙ্গে অতীতের কথা আরম্ভ করেন। হাঁচি সম্পর্কীয় ঘটনাটি বিনয় পিটকেও দেখা যায় (২য় খন্ড, ১৪০)।

পূর্বে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধ বোধিসত্ত্বরূপে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গর্গ (গগ্গ)। বালকরূপী বোধিসত্ত্ব ও তার পিতা একবার জিনিষপত্র ফেরি করতে করতে বারানসীতে উপস্থিত হলেন। ভোজন করতে পারলেও তাঁরা কিন্তু সেখানে রাত্রিবাসের জায়গা পেলেন না। তখন রাজ্যের লোকেরা জানালো যে নগরের বাইরে থাকার মত একটা ঘর ফাঁকা আছে কিন্তু তাতে এক যক্ষ বাস করে। বালকটি পিতাকে আশ্বস্ত করে বললেন যে যক্ষকে তিনি দমন করবেন

ভয়ের কিছু নেই। অতঃপর তারা সেই গৃহে উপস্থিত হলেন। সেই যক্ষ বারো বছর স্থবিরের সেবা করে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে কেউ হাঁচলে প্রত্যুত্তরে 'জীব' না বললে এবং প্রত্যুত্তর না দিলে তাকে তিনি ভক্ষণ করবেন। উত্তর দিলে আর ভক্ষণ করতে পারবেন না। তখন যক্ষ বোধিসত্ত্বের পিতা গর্গকে হাঁচাবার জন্য অন্তরালে থেকে চারিদিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ ছড়িয়ে দিলে কণাগুলো নাসিকায় প্রবেশ করামাত্র গর্গ হাঁচলেন। বোধিসত্ত্ব কিন্তু তাতে 'জীব' বলে উত্তর দিলেন না। তারপর বোধিসত্ত্বের মনে যক্ষের কথা আসা মাত্র তিনি কাব্য করে 'জীব' বললে যক্ষ বোধিসত্ত্বকে খেতে পারলেন না। বোধিসত্ত্বের পিতা তারপর যক্ষকে আসতে দেখে তিনিও কাব্য করে বোধিসত্ত্বকে 'জীব' বলে প্রত্যাশীর্বাদ করলেন। এতে বোধিসত্ত্বের বৃদ্ধ পিতাকেও যক্ষ খেতে পারলেন না। তখন ব্রাহ্মণ বালকবেশী বোধিসত্ত্ব যক্ষকে বললেন যে পূর্বজন্মের পাপাচারবশতঃ তিনি নিষ্ঠুর ও পরবিহিংসক হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই জন্মেও প্রাণীহত্যাজনিত পাপ করলে তিনি উদ্ধার পাবেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণ বালক নরকের ভয় দেখিয়ে যক্ষকে দমন করে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলস্বরূপ যক্ষ বালকবেশী বোধিসত্ত্বের উপদেশের গুণে তাঁর আজ্ঞাবাহক হয়ে গেলেন। এই কথা রাজার কানে প্রবেশ করলে রাজা বোধিসত্ত্বকে সেনাপতির পদে এবং যক্ষকে সেনাপতির কথা শুনে চলবার উপদেশ দিয়ে শুল্কগ্রাহকের পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বোধিসত্ত্বের বৃদ্ধ পিতা গর্গকেও রাজা সম্মানিত করেছিলেন।

সেই রাজা হলেন আনন্দ, কাশ্যপ হলেন বোধিসত্ত্বের পিতা এবং বুদ্ধ নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ বালক।

[দ্রষ্টব্য : ঈশান চন্দ্র ঘোষের 'জাতক', ২য় খণ্ড পৃঃ ১০; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩১]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গগ্গরা

চম্পার একটি অতি মনোরম পদ্ম সরোবর। জলাশয়টির নামকরণ করা হয় দেশের রাণী গগ্গরার নামানুসারে। বুদ্ধ যখন ঐখানে বসবাস করছিলেন তখন চম্পকবন নামে একটি স্থান ছিল। এর কাছাকাছি তীর্থিকদের একটি বিহার ছিল বলে জানা যায়। (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম, ১৮৯) ভিক্ষুদের কাছে ধ্যান করবার স্থান হিসেবে জায়গাটি নির্জনতার জন্য প্রিয় ছিল। ভগবান বুদ্ধ এই সরোবরের তীরে বহুবার এসে বসবাস করেছিলেন। একবার এস্থানে পেয্য (পেস্‌স) ও কন্দরক বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, বুদ্ধ এদের কাছে কন্দরক সুত্ত (মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৯) বর্ণনা করেন। তাছাড়াও বাহুন (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম, পৃঃ ১৫১) বজ্জিয়মাহিত (ঐ পৃঃ ১৮৯) ও কস্‌সপগোত্ত (বিনয়, ১ম পৃঃ ৩১২) এস্থানে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করেন। পুনরায় সারিপুত্র চম্পানগরীর বহু বসবাসকারী ব্যক্তিদের নিয়ে বুদ্ধের কাছে যান ও বুদ্ধের কাছে ভিক্ষান্ন দান করার কি ফল লাভ করা যায় তা জানতে চান। (অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, পৃঃ ৫৯) তাছাড়া এখানে সারিপুত্র ভিক্ষুদের সম্মেলনে দশুত্তর সুত্ত (দীঘনিকায়, ৩য়, ২৭২ ইত্যাদি) বর্ণনা করেন। এটিও জানা যায় যে বুদ্ধ এখানে 'করণ্ডব সুত্ত' উপদেশ করেন। কথিত আছে এটি সঙ্ঘের দুঃশীল সভ্যদের উদ্দেশ্যে যারা সমগ্র বৌদ্ধসংঘকে

ভাঙনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশনা করেন। এখানে বিখ্যাত 'সোণদন্ড সুত্ত'ও দেশনা করা হয়। (দীঘ, ১ম, ১১১) এস্থানেই বংগীশ স্থবির একটি গীতের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রশংসা করেন। (থেরগাথা ৫ম, গাথা নং ১২৫২; সংযুক্ত নিকায়, ১ম, ১৯৫)।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭৩১-৩২]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গঙ্গমাল জাতক

(জাতক নং ৪২১) জাকতটি বুদ্ধ স্বয়ং স্থানীয় উপাসকউপাসিকাকে উপোসথ (উপবাসের দিন) দিবস পালন করার জন্য বিবৃত করেছেন। একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে সুচিপরিবাসে জনমজুরি খাটতেন। সেখানে একদিন সমস্ত জনমজুর ও বাড়ীর লোকেরা উপোসথ দিন পালন করার জন্য উপবাস করলে বোধিসত্ত্ব কাজকর্ম সেরে বেলা কাটিয়ে বিকালে বাড়ী ফিরে উপোসথ দিনের কথা জানতে পারেন। তখনই তিনি উপবাস শুরু করেন ও কয়েকদিন উপবাসের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর বোধিসত্ত্ব বারাণসীর রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ জন্মে তাঁর নাম হয় উদয়। ইতিমধ্যে উদয় অর্দ্ধমাষ নামে এক মহান্ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। পরে তিনি অর্দ্ধমাষকে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক দান করেন। অর্দ্ধমাষ কিন্তু কিছুদিন পরেই সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। রাজা উদয়রূপী বোধিসত্ত্ব তা জানতে পেরে অর্দ্ধমাষের পূর্ব জন্ম বিবৃত করেন। কিন্তু কেহই উদয়ের বর্ণিত গাথাগুলির অর্থ বুঝতে সক্ষম হন না।

অন্যদিকে গঙ্গমাল নামে এক ক্ষৌরকার রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হলে রাজা উদয় বরদান করতে চাইলে গঙ্গমাল উদয়ের গাথার অর্থ জানতে চান। এরপর রাজা উপোসথ দিন পালন করার বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। এতে গঙ্গমাল গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কথিত আছে গঙ্গমাল ধ্যানমার্গের উচ্চতর স্থানে গমন করে পচ্চেকবুদ্ধত্ব (প্রত্যেকবুদ্ধত্ব) লাভ করেন। এরপর গঙ্গমাল রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সম্বোধনপূর্বক উপদেশনা করেন। তাতে রাণী গঙ্গমালের ওপর কুপিত হন। রাজা কিন্তু গঙ্গমালকে ক্ষমা করে দেন। এরপর গঙ্গমাল গন্ধমাদন পর্বতে বসবাসের জন্য চলে যান।

তৃষ্ণার শান্তি পাওয়া একজন সাধারণ মানুষের কথা প্রসঙ্গে গঙ্গমালের আখ্যানটি এখানে বলা হয়েছে।

[দষ্টব্য ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষের জাতক, ৩য়, ৪৪৪ ইত্যাদি; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩৩]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গঙ্গা

একটি নদীবিশেষ, বর্তমান নামও গঙ্গানদী। জম্বুদ্বীপের (ভারতবর্ষের) পাঁচটি মহানদীর মধ্যে এটি অন্যতম। অন্যান্য চারটি নদী হল যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহানদী।

(বিনয়, ২য়, ২৩৭; সংযুত্ত, ২য়, ১৩৫; অঙ্গুত্তর, ৪র্থ, ১০১ ইত্যাদি)। গঙ্গানদীর উৎপত্তি সম্পর্কে অর্থকথাগুলিতে বিস্তৃত বিবরণ আছে। (সুত্তনিপাত অট্‌ঠকথা, ২য়, ৪৩৮ ইত্যাদি; অঙ্গুত্তর অট্‌ঠকথা, ২য়, ৭৬১)। গঙ্গানদীর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি অনোতত্ত হ্রদ থেকে একবার আবট্টগঙ্গা, একবার কণ্‌হ গঙ্গা, একবার আকাশ গঙ্গা (আকাশ পথে এটি ৬০ যোজন ধরে বিস্তৃত হয়ে তিয়গ্গল পুষ্করিনীতে পতিত হয়েছে), একবার বহলগঙ্গা, তারপর উম্মগ্গ গঙ্গা নামে পুনরায় বিঞ্ঝানামে এক পর্বতকে বেষ্ঠন করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে।

গঙ্গানদীর তীরে তীরে বহু প্রাচীন শহর গড়ে উঠেছে যেমন — বারাণসী, চম্পা, অযোধ্যা, কিম্বিলা, উক্কাবেলা, প্রয়াগ, পাটলিপুত্র, সংকসস ইত্যাদি। সেইযুগে সর্বাপেক্ষা দরকারী কাজ কর্ম হত এই নদীকে ঘিরেই যেমন, রাজগৃহ থেকে বৈশালী পর্যন্ত বাণিজ্য করার পথ ছিল এই গঙ্গানদী ধরেই। নদীটির উত্তরদিকে অঙ্গরাজ্যের অংগুত্তরাপ নামে সীমা ছিল। নদীটি সবশুদ্ধ পাঁচশত যোজন ধরে বিস্তৃত ছিল। (সংযুত্ত অট্‌ঠকথা, ২য়, ১১৯)।

পালি সাহিত্যে গঙ্গানদীর বারংবার উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গানদীর মাটি, জল অত্যন্ত পবিত্র বলে ধরা হত। গঙ্গানদী পশ্চিম দিক থেকে বাহিত হয়ে পূর্বদিকে (পাচীন নিন্না, সংযুত্ত ৪র্থ, ১৯১) সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। বর্ষার সময় ছাড়া অন্যসময়ে পারাপারও করা যেত লতাপাতার সেতু তৈরী করে (সুত্তনিপাত অট্‌ঠকথা ১, ১৮)। জাতকে বলা আছে বহু সাপ ও টিয়াপাখী এই নদীর ধারে ধারে বিচরণ করতো (জাতক, ২য়, ১৪৫; ৩য় ৪৯১)। মুনিঋষিদেরও আবাসস্থল ছিল গঙ্গার তীরে। (জাতক, ৩য়, ৪৭৬; ৫ম, ১৯১ ইত্যাদি)। উৎসবের দিনে বহু প্রাচীনকাল থেকেই পুণ্যার্থীরা গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ হতেন। রাজরাজারাও গঙ্গাস্নান করতো। (ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ৩য়, ১৯৯; জাতক, ১ম, ২৯৫; মজ্ঝিম নিকায় অট্‌ঠকথা, ২য়, ৬০৪ ইত্যাদি)। গঙ্গাযমুনার মিলনক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র বলে ধরা হত। (জাতক, ৬ষ্ঠ, ৪১২, ৪১৫)। জাতকে বলা আছে যে গঙ্গানদীর 'মিগসম্মতা' নামে একটি শাখা হিমবন্ত থেকে উৎপত্তি হয়েছে। (জাতক, ৬ষ্ঠ, ৭২)। বুদ্ধ যখন রাজগৃহ থেকে বৈশালী যান তখন পাটলিপুত্রের একটি তীর্থস্থান রাস্তায় পার হতে হতো। এটির নাম ছিল গৌতমতীর্থ (বিনয়, ১, ২৩০) এবং বুদ্ধদেব যখন বৈশালী থেকে রাজগৃহে যাচ্ছিলেন তখন একটি উৎসব হয়েছিল, উৎসবটির নাম ছিল গঙ্গারোহণ। সেখানে দেবতা ও নাগগণেরা সম্মিলিত হয়েছিল বুদ্ধকে অভিনন্দন জানাতে। ধম্মপদ অট্‌ঠকথানুসারে (৩য়, ৪৪৪) তুষিত স্বর্গ থেকে বুদ্ধের মর্ত্তে আগমনকালে যেভাবে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই গঙ্গারোহণ উৎসবে বুদ্ধকে তা জানানো হয়েছিল। জানা যায় যে সেই সময় 'এরক' নামে একজন নাগ গঙ্গায় বাস করতেন।

গঙ্গার জল কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, শ্রীলংকাতেও পবিত্র বলে ধরা হয়। (মহাবংস, ১১ অধ্যায়, ৩০; মহাবংসে টীকা ৩০৫)। গঙ্গার ওপরদিকের নাম ছিল উর্দ্ধগঙ্গা বা উপরিগঙ্গা (জাতক ২য়, ২৮৩; ৪র্থ ৪২৭) এবং নিম্নের নাম হল অধোগঙ্গা (জাতক ২য়, ২৮৩, ৩২; ৫ম, ৩)।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৩৪]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গঙ্গাতীরিয় থের

ইনি একজন অর্হৎ। প্রথম জীবনে তিনি শ্রাবস্তীর 'দত্ত' নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তিনি যখন আবিষ্কার করেন যে তিনি নিজের মাতা এবং ভগিনীর সঙ্গে অনাচারে লিপ্ত হয়েছেন তখন তিনি তাদের সংসর্গ ত্যাগ করে ধ্যান ধারণা শুরু করেন এবং গঙ্গার তীরে এক বনের মধ্যে পাতার কুটীর বানিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। গৃহত্যাগের প্রথম বছর তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন, দ্বিতীয় বছর তিনি একবারমাত্র একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেন। স্ত্রীলোকটি তার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দুধ ঢেলে ছড়াচ্ছিলেন তিনি বোবা কিনা বোঝার জন্য। তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে বারণ করেন তার দুধ দিতে। তৃতীয় বছরে তিনি অর্হত্ত্বপদ লাভ করেন। থেরগাথা থেকে জানা যায় যে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে তিনি গৃহস্থ ছিলেন এবং ভিক্ষুদের পানীয় দান করতেন। (থেরগাথা ৫ম, ১২৭-২৮; থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম, ২৪৮ ইত্যাদি)।

কথিত আছে গঙ্গাতীরিয় যখন মাতৃজঠরে তখন তাঁর মাতা গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। রাজগৃহের এক বিশ্রামাগারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরিয়ের মাতা যখন স্নান করতে গিয়েছিলেন তখন যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রধান মাতাকে অপহরণ করে পরে এক ডাকাতের সর্দার গঙ্গাতীরিয়ের মাতাকে পুনরায় অপহরণ করে নিয়ে বিবাহ করেন এবং তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদা ঝগড়াবিবাদের সময় তাঁর স্বামী বিছানা থেকে কন্যাকে ফেলে দেন তাতে কন্যাটির মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এরপর গঙ্গাতীরিয়ের মাতা রাজগৃহে পালিয়ে যান এবং গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে গঙ্গাতীরিয়ের সহচরী হন যদিও গঙ্গাতীরিয় মাতা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এর কিছুদিন পরে গঙ্গাতীরিয় ডাকাতের কন্যাকে বিবাহ করেন। একদিন স্ত্রীর মাথায় গভীর ক্ষত দেখতে পেয়ে তিনি সমস্ত বিষয় অবগত হন। অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে মাতা ও ভগিনী উভয়েই গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়ে যান ও গঙ্গাতীরিয়ও গৃহত্যাগ করে ভিক্ষুব্রত ধারণ করেন। (থেরীগাথা অট্ঠকথা, ১৯৫ ইত্যাদি)।

অপদানের উদকদাবকর বর্ণনার সঙ্গে উপরোক্ত গাথাগলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। (অপদান, ২য়, ৪৩৭)।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৩৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গংগেয্য জাতক

(জাতক নং ২০৫) এটি একটি মৎস্যের গল্প। দুটি মৎস্য, একটি গঙ্গার ও একটি যমুনার একবার গঙ্গাযমুনার মিলনস্থলে ঝগড়াবিবাদ শুরু করে কে বেশি সুন্দর সেই নিয়ে। তখন তারা এক কচ্ছপের কাছে যায় যেটি বলে যে মৎস্য দুটির সৌন্দর্যের থেকে তার সৌন্দর্য অনেক বেশি।

দুটি ভিক্ষুর মধ্যে ঝগড়াবিবাদের সূত্রপাত হলে বুদ্ধ উপরোক্ত আখ্যানটি বিবৃত করেন। একজন পৌঢ় ভিক্ষু মধ্যস্থতা করতে গেলে একই উত্তর দিয়েছিলেন কচ্ছপটির মত।

[দ্রষ্টব্য : জাতক, ২য়, ১৫১ ইত্যাদি; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৩৮]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গজকুম্ভ জাতক

জাতক নং ৩৪৫। বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজের অমাত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাজা তখন অত্যন্ত আলস্যপ্রিয় ছিলেন বলে বোধিসত্ত্ব একটি কচ্ছপ নিয়ে এসেছিলেন রাজাকে কচ্ছপের গতি দেখিয়ে শিক্ষা দেবার জন্য যে আলস্য কিভাবে দুর্দশা ডেকে আনে।

আখ্যানটি একজন ভিক্ষুকে বর্ণনা করা হয় যিনি নিজের কর্তব্যে গতিহীন ছিলেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ জাতক, ৩য় খন্ড, ১৩৯ ইত্যাদি; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩৮]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গজবাহু

অন্য নাম গজভুজ। শ্রীলংকার রাজা ছিলেন। (খৃষ্টীয় ১১৩৭-১১৫৩ অব্দ)। ইনি দ্বিতীয় বিক্রমবাহুর পুত্র। (চুলবংস, ৬০,৮০)। ডিম্বুলাগল শিলালিপিতে বলা আছে তাঁর মাতার নাম ছিল সুন্দরী। ১ম বিজয়বাহু ছিলেন গজবাহুর পিতামহ ও কলিঙ্গ বংশীয়। যুবরাজ ১ম পরাক্রমবাহুর সঙ্গে গজবাহুর প্রথমে সুসম্পর্ক ছিল। পরাক্রমবাহুর ভগিনী ভদ্রাবতীর সঙ্গে গজবাহুর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু পরে গজবাহুর সঙ্গে পরাক্রমবাহুর সম্পর্ক ছেদ হয়, যদিও জীবনের শেষ পর্যায়ে আবার পরাক্রমবাহুর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে। পরাক্রমবাহু একবার গজবাহুর জীবন রক্ষা করেছিলেন কিন্তু গজবাহু অন্যের প্ররোচনায় পুলত্থিপুর নামে রাজধানী পরিত্যাগ করে যুদ্ধে মেতে ওঠেন যদিও পরে পরাক্রমবাহু গজবাহুকে পুলত্থিপুরে রাজত্ব করতে দেন।

কথিত আছে গজবাহু জীবনের শেষ পর্বে গঙ্গাতড়াক নামে একস্থানে শান্তিতে জীবন কাটান। এদিকে যেহেতু গজবাহুর কোন সন্তানাদি ছিল না তিনি নিজের সব সম্পত্তি পরাক্রমবাহুকে দান করেন। মন্ডলগিরিবিহারে এক পাথরের ওপর তাঁর দানধ্যানের কথা খোদাই করা রয়েছে। কোট্‌ঠসার নামক স্থানে তার দাহকার্য সম্পন্ন হয়। (চুলবংস, ৬৩, ৬৬-৬৭, ৭০-৭১ অধ্যায়)।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩৯]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণক মোগ্গল্লান

ইনি একজন শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ শাস্তা। একবার পুব্বারাম বিহারে বুদ্ধকে দর্শন করতে গেলে বুদ্ধ এনাকে গণক মোগ্গল্লান সুত্ত দেশনা করেন। এরপরে মোগ্গল্লান বুদ্ধের অনুগামী হন। কথিত আছে ইনি অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাইজন্য তাঁর নাম হয় গণক। (মজ্ঝিম নিকায়, ৩য়, ১ ইত্যাদি)।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৩৯]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণক-মোগ্গল্লান সুত্ত

মজ্ঝিম নিকায়ের ১০৭ নম্বর সুত্ত। সুত্তটি গণক মোগ্গল্লানের কাছে দেশনা করা হয়েছিল। মোগ্গল্লান সুত্তটি সম্পর্কে মন্তব্যে করেছেন যে এটি একপ্রকার উচ্চমার্গের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ধীরে ধীরে যেটি উন্নততর হয়েছে। (অনুপুব্ব সিক্‌খা অনুপুব্ব কিরিয়া)। বুদ্ধ কি যথার্থই ইহা শিক্ষা দিয়েছিলেন? তার উত্তরে বুদ্ধ বলেন যে বুদ্ধের সমস্ত শিষ্য কিন্তু নির্বাণলাভ করতে পারেননি কারণ তিনি নির্বাণলাভের কেবলমাত্র রাস্তা দেখিয়েছেন। নির্বাণলাভ শিষ্যদের অনুশীলনের মাধ্যমেই করতে হবে।

[দ্রষ্টব্য : মজ্ঝিম, ৩য়, ১ ইত্যাদি; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৩৯]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণপতি

ইনি হিন্দুদেবতা গণেশ। শিব ও পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি গণের অধিপতি। অপর নাম গজানন।

[দ্রষ্টব্য : শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বাংলা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ, ১ম ভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণ্ডতিন্দু জাতক

জাতক নং ৫২০। কাপিল্য নামক স্থানের রাজা পাঞ্চাল একজন অতি নির্দয় রাজা ছিলেন। প্রজাগণ পাঞ্চালের অমাত্যদের থেকেও অত্যাচারিত হতেন। সেই সময় বোধিসত্ত্ব গণ্ডতিন্দু নামে একপ্রকার গাছের দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রজাদের অত্যাচারের কথা শুনে যোগবলে রাজার শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে রাজাকে নির্দয় অত্যাচার বন্ধ করতে বলেন। রাজা তাঁর অমাত্যকে নিয়ে এরপর পরিভ্রমণে বেড়িয়ে দেখেন যে সমস্ত দেশবাসী এমনকি মহিলা ও জীবজন্তরাও রাজার নামে দুর্ভাষণ করছে। তখন রাজা রাজধানীতে প্রত্যার্পণ করে কুশলকর্মের অনুশীলন করতে শুরু করেন। (জাতক, ৫ম, ৯৮ ইত্যাদি)

রাজোবাদ জাতকে এটির মুখবন্ধ রয়েছে।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪১]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণ্ডব্যূহ

মহাযানের নয়টি বৈপুল্য সূত্রের মধ্যে একটি। সূত্রগুলি বা ধর্মগ্রন্থগুলি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এগুলি নেপালেই অধিক সমাদৃত হয়। গ্রন্থটি চীনা ত্রিপিটকের তালিকাতে পাওয়া যায় না কিন্তু চীন জাপানে বহুল প্রচলিত 'অবতংসক সূত্র' যেটি গণ্ডব্যূহ সূত্র বলে ধরা হয় সেটি চীনদেশে হুয়া-য়েন ও জাপানে কে-গন নামে পরিচিত। (ইলিয়ট, হিন্দুজিম এ্যান্ড্ বুদ্ধিজিম্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৪; উইনটারনিৎস, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান

লিটারেচার ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫; রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নেপালিস্ বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার পৃঃ ৯০ ইত্যাদি) দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ব্যাখ্যার সাদৃশ্য খুব বেশি নেই কিন্তু জাপানের পণ্ডিত তাকাকুসু দুটি গ্রন্থ একই বলেছেন। (ইলিয়ট, ঐ পৃঃ ৫৫, টীকা নং ১) পণ্ডিত ওয়াতনবে এটি সমর্থন করেছেন। (জারনাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৭ পৃঃ ৬৬৩) ইলিয়ট সাহেব বলেছেন যে সম্ভবতঃ বিশাল অবতংসক গ্রন্থের এটি একটি অংশবিশেষ। (হিন্দুজিম এ্যান্ড বুদ্ধিজিম্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৫) সিলভেন লেভির মতে অবতংসক সূত্রের এটি শেষ অধ্যায়। (জারনাল এশিয়াটিক, ১৯২৩ পৃঃ ৬)

গণ্ডব্যূহ গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু হল যুবক সুধন বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর পরামর্শে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন যাতে তিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। সুধন বহুস্থানে ভ্রমণ করে বহুজনের কাছ থেকে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা, বণিক, রাজা, ক্রীতদাস, বালক, নিশিদেবতা, শাদক্যমুনির মাতা ও পত্নীর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। পরিশেষে তিনি মঞ্জুশ্রীর অনুগ্রহে বোধিসত্ত্ব সমন্তভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করে যথার্থ প্রজ্ঞালাভ করেছিলেন। গ্রন্থটিতে শূন্যতাবাদ, ধর্মকায়, বুদ্ধের অসাধারণত্ব এবং বোধিসত্ত্বগণের ও পৃথিবীর সর্বজনের মুক্তির প্রচেষ্টার কথা বলা আছে।

এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে চতুর্থ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বহুবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয় এবং তিব্বতী ভাষায় নবম শতাব্দীতে এটি অনুবাদ করা হয়। গ্রন্থটির ভাষা হল সংস্কৃত ঘেষা প্রাকৃত।

[দ্রষ্টব্য ঃ উইন্টারনিৎস, 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫-৩২৭]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গণ্ডীস্তোত্রগাথা

সংস্কৃত অলংকারবহুল কাব্য গ্রন্থগুলির রচয়িতা অশ্বঘোষ (২য় শতাব্দী) এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। জার্মান পণ্ডিত A. Von Staël-Holstein চীনা অনুবাদ থেকে এটি মূল সংস্কৃতে নতুন করে তৈরী করেন। রূপগত ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে এটি একটি অনন্যসুন্দর কাব্য। (Bibliotheca Buddhica XV, St. Petersburg, ১৯১৩ তুলনীয় ঃ এফ, ডবল্যু থমাস, জারনাল অফ দি রয়্যাল এশিয়াটির সোসাইটি, ১৯১৪, পৃঃ ৭৫২ ইত্যাদি)।

[দ্রষ্টব্য ঃ উইন্টারনিৎস, হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৬৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধকুটি

সাধারণভাবে সুগন্ধিযুক্ত কামরা। যে কোন কামরা বুদ্ধ যা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতেন তাকেই গন্ধকুটি বলা হত। শ্রেষ্ঠীপুত্র অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধের বসবাসের জন্য যে ঘরটি তৈরী করে দিয়েছিলেন তাকেই গন্ধকুটি বলা হত।

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধব্ব

(সং গন্ধর্ব) একজন স্বর্গীয় সঙ্গীতজ্ঞ, অর্ধ-দেবতা যারা চাতুর্মহারাজিকদেবস্থানের বাসিন্দা। দেবতাগণের মধ্যে চাতুর্মহারাজিক দেবতা সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের দেবতা বলে পরিগণিত হয়। (দীঘ, ২য়, ২১২) অন্যান্য ঐ স্থানের বাসিন্দাদের মধ্যে নাগ ও অসুরগণও রয়েছেন। (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ, ২০০, ২০৪, ২০৭) দীঘনিকায় (২য়, ২১২, ২৭১) অনুযায়ী যারা নিম্নস্তরের শীলপালন করেন তারাই ফলস্বরূপ এই দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। কোন ভিক্ষু যদি এই যেনিতে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে সেটি খুব ভাল জন্ম বলে গণ্য করা হত না। (দীঘ, ঐ) কয়েকজন বিখ্যাত গন্ধর্ব হলেন পঞ্চশীখ, সুরিয়বচ্চ এবং তার পিতা তিম্বরু। (ঐ ২৬৪) এনারা দেবরাজ সক্কের মনোরঞ্জন করতেন অপ্সরাদের সহচর হয়ে। তাদের রাজা হলেন ধৃতরাষ্ট্র যিনি পূর্বদিকের অধিপতি। অন্যান্য গন্ধর্বরা হলেন পনাদ, ওপমঞ্ঞ, সক্কের রথের সারথি মাতলী, চিত্তসেন, নল ও জনেসভ। অঙ্গুত্তর নিকায়ে (২য়, ৩৯) গন্ধর্বদের বিহঙ্গমা বলে অভিহিত করা হয়েছে, এরা শূন্যমার্গে যাতায়াত করতেন বলে। দীঘনিকায়ের আটানাটিয় সুত্তে (৩য়, ২০৩-২০৪) গন্ধর্বদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এনারা ভিক্ষুভিক্ষুণীদের নির্জনাবাসে ধ্যান করার সময় বাধা প্রদান করতেন। বুদ্ধ বলেছেন যে যারা গন্ধর্ব হতে ইচ্ছা করেন তারাই গন্ধবকায়িকদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। (সংযুক্ত, ৩য়, ২৫০) গন্ধর্বদের সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে এনারা সুগন্ধি বৃক্ষে, সুগন্ধি পুষ্পে বসবাস করেন। (ঐ) কখনও কখনও এনাদের সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এনারা গর্ভদানের সঙ্গে যুক্ত। (মজ্ঝিম, ১ম, ১৫৭, ২৬৫ ইত্যাদি) এক্ষেত্রে বলা যায় যে 'গন্ধর্ব' শব্দটির অর্থ যথাযথ হয়নি।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৪৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধমাদন

এটি একটি পর্বতমালা, ভারতবর্ষের উত্তরদিকে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের এক অন্যতম শৃঙ্গ। (চাইল্ডারস্, এ ডিক্সনারী অফ পালি ল্যাঙ্গুয়েজেস পৃঃ ১৫৫)। অন্যান্যগুলি হল চুল্লকাল, মহাকাল, নাগপলিবেঠন, চন্দগব্ভ, সুবন্নপসস্য ও হিমবা। বিখ্যাত অনোতত্ত হ্রদকে ঘিরে যে পাঁচটি পর্বত আছে এটি তাদের মধ্যে একটি। এটির ওপরে একটি সমতল স্থান আছে, সেটি সবুজবর্ণময় (মুগ্গবন্ন) এবং বহুপ্রকার বনজ ঔষুধিগাছগাছড়াযুক্ত। দূর থেকে চন্দ্রের আলোকে জায়গাটি দেখলে মনে হতো 'আগুনের আঁচে ঝক্‌ঝকে'। এখানের 'নন্দমূলক' নামে একটু নিচুস্থানে তিনটি গুহা আছে যথা — সুবন্ন, মণি ও রজতগুহা যেস্থানে পচ্চেকবুদ্ধ (প্রত্যেক বুদ্ধ) গণ বাস করতেন। মণিগুহার প্রবেশদ্বারে বিশালাকার মঞ্জুসক নামে একটি গাছ আছে। কথিত আছে, গাছের ফুলগুলি প্রত্যেকবুদ্ধের আগমনে ফুটে ওঠতো। গাছটি ঘিরে রয়েছে সব্বরতনমাল। ঐস্থানে প্রত্যেকবুদ্ধেদের জন্য বসার আসন থাকে। যখনই কোন নতুন প্রত্যেকবুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে তখনই সর্বদিকের প্রত্যেকবুদ্ধরা এখানে একত্রিত হন

নতুন প্রত্যেকবুদ্ধকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এবং তারা তখন সবাই একত্র সমাধিস্থ হন। জাতক (৪র্থ, ১৬) ও ধম্মপদ অট্ঠকথায় (৩য়, ৩৬৮; ৪র্থ ১২১) বলা আছে যে গন্ধমাদন পর্বতের প্রত্যেক বুদ্ধগণ সাতদিন টানা সমাধিস্থ থাকেন এবং পরিশেষে কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন যাতে সেই ব্যক্তি পুণ্য অর্জন করতে পারেন। প্রত্যেক বুদ্ধগণ ছাড়াও গন্ধমাদন পর্বতে নারদ (জাতক ৪র্থ, ৩৯৩), নলিনিকা (জাতক ৫ম ১৮৬), বহুসোদরী (জাতক ৬ষ্ঠ, ৮৩) বসবাস করতেন এবং দেবতাদের রাজা নাগদত্ত (থেরীগাথা অট্ঠকথা, ১, ১৩৮), (বসসন্তর এবং তাঁর পরিবারবর্গ রাজত্ব ত্যাগের পর গন্ধমাদন পর্বতে বাস করতেন। (জাতক, ৬ষ্ঠ, ৫২৮ ইত্যাদি)। এই পর্বতের ঢালে কিন্নর ও নাগগণও বসবাস করতো। অঙ্গুত্তর অট্ঠকথা অনুযায়ী (১ম, ১৩৯) খদিরবনিয় রেবত থের একবার এই স্থান পরিদর্শন করেন।

এই পর্বতেই মহাপদুমসহ পাঁচশত প্রত্যেকবুদ্ধের মৃত্যু ঘটে। (থেরগাথা অট্ঠকথা, ২য়, ১৪১)

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪৭]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধবংস

অর্থাৎ 'গ্রন্থের ইতিহাস'। এটির পরিশিষ্ট থেকে জানা যায় যে এটি অরণ্যবাসী নন্দপঞ্ঞ নামে একজন ভিক্ষুর রচনা। এটি গদ্যাকারে রচিত। প্রোফেসার মিনায়েফ যিনি এটি সম্পাদনা করেছিলেন (দ্রঃ জারনাল অফ দি পালি টেক্স সোসাইটি, ১৮৮৬ পৃঃ ৫৫-৮০) তিনি বলেছেন যে এটি, শ্রীলংকা ও মায়ানমার ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি গ্রন্থগুলির রচয়িতা ও সময় কাল সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য দিয়েছে। 'পিঠকথমেন' নামে একটি মায়ানমারের গ্রন্থ অনুযায়ী এটি সতেরোশো শতাব্দীর রচনা এবং গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে যে চুল্লগন্ধবংস অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের ইতিহাস। সম্ভবতঃ বর্তমানে যে গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি একটি বড় গ্রন্থের সংক্ষিপ্তাকার। (ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ পৃঃ ৭৪৮) উইন্টারনিৎস সাহেব বলেছেন যে গন্ধবংসের পাঁচটি অধ্যায়ে তিনপিটক ও নয় অঙ্গের তালিকা রয়েছে। ত্রিপিটক রচনার পরবর্তীকালের পালি গ্রন্থাকারদের নাম, জন্মক্ষেত্র, গ্রন্থগুলি রচনার কারণ ও কিভাবে রচনা করলেন তার বর্ণনা আছে। (হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার পৃঃ ২১৯) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে গ্রন্থটিতে শুধু বইগুলি উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু কোনরকম ব্যাখ্যা নেই এবং সেই কারণে অনেক বিষয় দুর্বোধ্য হয়ে গেছে বিশেষতঃ মায়ানমারের বৌদ্ধশাসনের ইতিহাস সম্পর্কে। (এ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দি থেরবাদ বুদ্ধিজিম ইন বার্মা পৃঃ ৯১-২)

[দ্রষ্টব্য : বি, সি, লাহার হিস্ট্রি অফ পালি লিটারেচার, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৮৯; মেবেল বোড বিরচিত 'পালি লিটারেচার ইন বার্মা পৃঃ ১০ সূচনা; ডঃ কে, এল হাজরার 'পালি ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড লিটারেচার ২য় খণ্ড পৃঃ ৬৭৩-৭৭০]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধার

ষোড়শ মহাজনপদের একটি। এটির রাজধানী ছিল তক্খসিলা (তক্ষশিলা)। বুদ্ধের সময়কালে এখানকার রাজা ছিলেন পুক্কসাতি। মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে পুক্কসাতির সুসম্পর্ক ছিল। কথিত আছে, এই রাজ্যে অন্যান্য দেশের বণিক ও পরিদর্শকগণের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল রাজার খরচেই। বুদ্ধের পরিভ্রমণের সময় বিম্বিসার পুক্কসাতিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন। পুক্কসাতিও রাজত্ব ত্যাগ করে বুদ্ধের অনুচর হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোকের (অসোক) সময়ে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির শেষে সংগীতির সভাপতি মোগ্গলিপুত্ত তিস্সস গন্ধার রাজ্যে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

বুদ্ধঘোষ বলেছেন পুক্কসাতির রাজ্যের আয়তন ছিল এক হাজার যোজন এবং তক্ষশীলা থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব ছিল একশত বিরানব্বই যোজন। গান্ধারকে পচ্চন্তিম-জনপদ বলা হত এবং একটা রাস্তা ছিল তক্ষশীলা থেকে শ্রাবস্তী পর্যন্ত।

অশোকের সময়ে যখন ধর্মপ্রচারক গান্ধাররাজ্যে গিয়েছিলেন তখন নাগরাজ অরবালের অত্যাচারে রাজ্য জর্জরিত ছিল। ধর্মপ্রচারক মজ্ঝন্তিক সেস্থানে গিয়ে ধর্মদেশনার দ্বারা নাগরাজকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। নাগরাজের সঙ্গে যক্ষ পণ্ডক এবং তার স্ত্রী ও অন্যান্য অনুচররা বুদ্ধের শরণ নেন। মজ্ঝন্তিক 'অসীবিসুপম সুত্ত' দেশনা করেন এবং আরও এক সহস্রজন সংঘে প্রবেশ করেন।

গান্ধাররাজ্য সব সময়ে কাশ্মীরের সঙ্গে একত্রে উল্লিখিত হত। বর্তমানে পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি এই রাজ্যের অন্তর্গত।

অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে রাজ্যটি অশোকের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল এবং তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। পুক্কসাতি ছাড়াও নগ্নজি ও গন্ধারের রাজা ছিলেন বলে জানা যায় যিনি বৈদেহরাজ নিমির সমসমায়িক ছিলেন। (জাতক, ৩য়, ৩৭৭; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম, ৩৪, শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮ম, ১১৪, ১০)।

ঐতিহ্যানুযায়ী গন্ধাররাজ্যেই বুদ্ধের একটি চোখ ও দাঁত সংরক্ষণ করা হয়। (দীঘ নিকায়, ২য়, ১৬৭)

[দ্রষ্টব্য ঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৯৩; ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪৭]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধার জাতক

জাতক নং ৪০৬। একবার বোধিসত্ত্ব গন্ধার রাজ্যের রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদেহরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যদিও কখনও তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। একদিন গন্ধাররাজের চন্দ্রগ্রহণ দেখে বৈরাগ্য জন্মায় ও তিনি রাজ্য ত্যাগ করে হিমবন্তপ্রদেশে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এদিকে গন্ধাররাজের রাজ্যত্যাগের কথা শুনে বিদেহরাজও রাজত্ব ত্যাগ করে হিমবন্তে গমন করেন ও পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে কোন পরিচয় দান করেন না। কিন্তু অপর একটি চন্দ্রগ্রহণ

ঘটলে উভয়েই পরিচিত হন। এরপর তারা দুজনে মিলে ভিক্ষার্থে বের হলে বিদেহের সন্ন্যাসী প্রচুর পরিমানে লবণ পেলে তা ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখেন। গন্ধারের সন্ন্যাসী এতে অসন্তুষ্ট হলে বিদেহের সন্ন্যাসী তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বিদেহের সন্ন্যাসী ছিলেন আনন্দ। আখ্যানটি বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের কাছে বিবৃত করেছিলেন যখন তিনি ভিক্ষুদের সাতদিনের বেশি ঔষুধাদি জমাতে বারণ করেছিলেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ পৃঃ ৭৫০; ঈশাণচন্দ্র ঘোষের জাতক, ৩য়, ৩৬৩ ইত্যাদি; সূচনাটি বিনয়পিটকে (১ম, ২০৬) ও মজ্ঝিমনিকায় অট্ঠকথাতে (১ম, ৫৩৪ ইত্যাদি) দেওয়া আছে।]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গন্ধহস্তি

গন্ধযুক্ত যে হস্তি। এদের মদ গন্ধ গজও বলা হয়।

[দ্রষ্টব্য ঃ বাংলা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ পৃঃ ৬৫৩]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গয়াকস্সপ

তিনজন জটিল কসসপ ভ্রাতাদের মধ্যে একজন। ইনি অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গেই সংসার ত্যাগ করেন। তারা সবাই গয়াসীসতে বসবাস করতেন (গয়াসীসে পব্বজিতো তি গয়াকস্সপো নাম জাতো)। যখন উরুবেলকস্সপ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন তখন গয়াকস্সপ তাঁর অনুচরবর্গসহ বৌদ্ধসংঘে যোগদান করেন এবং কথিত আছে যে আদিত্তপরিয়ায় সুত্তের উপদেশনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলেই অর্হত্বপদ লাভ করেন। (বিনয়, ১ম, ৩৩ ইত্যাদি; মনোরথপুরণী-অঙ্গুত্তর অট্ঠকথা, ১ম, ১৬৫) গয়াকস্সপ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গয়াযাগু উৎসবে তিনি দিনে তিনবার করে স্নান করতেন যাতে তাঁর সকাল পাপ ধুয়ে মুছে যায়। (থেরগাথা অট্ঠকথা, ৫ম খন্ড, ৩৪৫ ইত্যাদি)।

ঐতিহ্যানুসারে তিনি সিখীবুদ্ধের সময়ে একজন গৃহপতি হয়ে জন্মেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। অপদান সাহিত্যের কোলাদায়ক থেরকেই গয়াকস্স্যপ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। (অপদান, ২য়, ৩৭৯, ৪৮৩) অপদান অনুসারে ইনি বুদ্ধকে বনের মধ্যে দেখতে পেয়ে একটি 'কোলাফল' দান করেন। (থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম, ৪১৭ ইত্যাদি)

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্, ২য় খন্ড পৃঃ ৭৫৩; ডঃ নলিনাক্ষ দত্তের 'আরলি মনাসিটিক্ বুদ্ধিজিম্' পৃঃ ১০০]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গয়াসীস

গয়ার নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়। এইস্থানে বুদ্ধ জটিল ভ্রাতাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। বুদ্ধ এখানে উরুবেলা থেকে এসে 'আদিত্তপরিয়ায় সুত্ত' উপদেশ করেন। (বিনয়, ১৪, ৩৪ ইত্যাদি; সংযুক্ত, ৪র্থ, ১৯ ইত্যাদি; জাতক, ১ম, ৮২; অঙ্গুত্তর

অট্‌ঠকথা, ১ম, ৫৭; পেতবত্থ অট্‌ঠকথা পৃঃ ২১; উদান, ১ম, ৯; ধম্মপদ অট্‌ঠকথা, ১ম, ৭২) এস্থানেই বুদ্ধের আত্মীয় দেবদত্ত বুদ্ধের পাঁচশত শিষ্যদের জনমত বুঝিয়ে সংঘ থেকে বার করে নিয়ে আসেন অন্যদিকে বুদ্ধের প্রধান প্রধান শিষ্যরা তাদের ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন এস্থানেই। কথিত আছে, দেবদত্তের জন্য মগধরাজ বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু একটি বিশেষ বিহার তৈরী করে দিয়েছিলেন এস্থানেই।

সংযুক্ত অট্‌ঠকথাতে (৩য়, ৪) ও উদান অট্‌ঠকথাতে (পৃঃ ৭৪) বলা আছে যে পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছিল 'গয়াসীস' কারণ পাহাড়টি গয়ার একমাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল এবং পাহাড়ের মাথায় একটি সমতল পাথর ছিল যেটি দেখতে ছিল একটি হাতির মাথার ন্যায় (গজসীস-সদিস-পিট্‌ঠিপাসানো)। পাহাড়ের ওপর একহাজার ভিক্ষুর বসবাসের জায়গা ছিল। এটির এখনকার নাম হল ব্রহ্মযোনি। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলা আছে যে তিনি জটিল ভ্রাতাদের তিনটি স্তূপ সেখানে দেখেছিলেন। (কানিংহাম সাহেবের 'এ্যানশিয়েন্ট জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া পৃঃ ৫২৪ ইত্যাদি)।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৫৩]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গরহিত জাতক (গর্হিত জাতক)

জাতক সংখ্যা ২১৯। একবার বোধিসত্ত্ব এক কপিরূপে হিমালয় পর্বতে জন্মগ্রহণ করেন। একজন বনবাসী একবার কপিটিকে ধরে বেঁধে ফেলেন এবং সেটি রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে রাজাকে দান করেন। অতঃপর রাজার সঙ্গে কপিটির সখ্যতা জন্মায় এবং কপিও মানুষের আচার আচরণ সম্পর্কে অবহিত হন। পরে রাজা কপিটিকে মুক্ত করে দিলে কপিটি তার অনুচরদের কাছে ফিরে যান। তখন অন্যান্য অনুচরেরা কপিকে মানুষদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কপি মানুষজাতির লোভ, লালসা, প্রতিটি বাড়ীতে দুজন করে প্রভু থাকার কথা বর্ণনা করেন এবং নারীদের দেহ রূপের কথাও বলেন। এতে অন্যান্য কপিরা অস্বস্তিকে ঐ স্থান ছেড়ে চলে যায় এবং মানুষের সমাজে কখনও না আসার অঙ্গীকার করে। এরপর থেকে ঐ জায়গার নাম হয় 'গরহিত-পিট্‌ঠিপাসাণ'।

একজন অসন্তুষ্ট ভিক্ষুকে উপরোক্ত জাতকের গল্পটি বলা হয়েছিল।

[দ্রষ্টব্য : ঈশান চন্দ্র ঘোষের জাতক ২য় খন্ড পৃঃ ১১৬, ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৫৪]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গরুককম্ম

পাতিমোক্‌খ সুত্ত অনুযায়ী অর্থ হল 'গুরুতর কর্ম' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সঠিক কাজকর্ম। (জে, মিনায়েফ সম্পাদিত 'পাতিমোক্‌খ সুত্ত', সেন্ট পিটারস্‌বার্গ, ১৮৬৯) 'লঘুক' শব্দের বিপরীত হল 'গরুক' শব্দ। বিসুদ্ধিমগ্গে (পৃঃ ৬০১) উক্ত আছে যে চারপ্রকারের কর্মের মধ্যে একটি হল 'গরুককম্ম'।

[দ্রষ্টব্য : রীডস্ ডেভিজস্ এর পালি ইংলিস্ ডিক্সনারী পৃঃ ২৪৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গবম্‌পতি থের

ইনি একজন অর্হৎ। প্রথম জীবনে ইনি বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ছিলেন। তিনি বুদ্ধ শিষ্য যসের চারি উপাসক অনুচরদের মধ্যে একজন। যশ(যস) সংসার ত্যাগ করার পর ইনিই যশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অর্হৎপদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে গবম্‌পতি সাকেত নগরীর অঞ্জনবনে বসবাস করতেন। একদিন বুদ্ধ স্বয়ং অঞ্জনবনে সশিষ্য পরিভ্রমণে যান তখন কিছু ভিক্ষু সরভূনদীর তীরে শয়ন করেছিলেন। এরপর রাত্রিবেলায় নদীটির জল বাড়ে এবং ভিক্ষুদের ভাসিয়ে দেবার উপক্রম হয়। তখন বুদ্ধ গবম্‌পতি থেরকে জল আটকাতে পাঠান, থের নিজস্ব ঋদ্ধিশক্তির দ্বারা সেই কাজ করেন। বর্ণিত আছে যে নদীর জল পর্বতাকারে উঠে আটকে থাকে। (ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্‌ পৃঃ ৭৫৬)

ইনি শিখীবুদ্ধের সময়কালে এক শিকারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি শিখীবুদ্ধকে ফুল দান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কোণাগমন বুদ্ধের স্তূপের ওপরে ছত্র ও বারান্দা তৈরী করিয়ে দেন। কস্‌সপ বুদ্ধের সময়কালে তিনি একজন ধনী গৃহস্থ হয়ে জন্মেছিলেন। একদিন তিনি একজন অর্হৎকে রোদের মধ্যে বসে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে দেখে একটি ছায়ার ব্যবস্থা করেন ও এর সামনে একটি শিরীষ গাছ রোপন করেন। ফলস্বরূপ তিনি চাতুম্মহারাজিক দেবস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর প্রাসাদের নাম হয় সেরিসসক্‌। (বিমানবত্থুতে বর্ণিত সেরিস্‌সক স্বর্গের উৎপত্তির এটিই হল ইতিহাস (বিমানবত্থু অট্‌কথা পৃঃ ৩৩১ তুলনীয় ঃ বিনয়, ১ম, ১৮; থেরগাথা ৫ম, ৩৮; এখানে উল্লেখ্য যে দীঘনিকায় অট্‌ঠকথা (৩য়, ৮১৪)র বিবরণে একটু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়)।

গবম্‌পতি মধু বাসেট্‌ঠর পুত্র মহানাগের শিক্ষক ছিলেন। (থেরগাথা অট্‌ঠকথা, ১ম, ৪৪৩) তিব্বতী দুল্বতে (দ্রঃ রকহিলের 'লাইফ অফ বুদ্ধ' পৃঃ ১৪৯ ইত্যাদি) বলা আছে যে মহাকস্‌সপের প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে থের গবম্‌পতি আহুত হন কিন্তু তিনি অচিরেই দেহরক্ষা করেন বলে সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। পরিবর্তে তিনি তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও চিবর সংঘকে উপহারস্বরূপ দান করেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্‌ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৫৬-৫৭]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গহট্‌ঠশীল

সং 'গৃহস্থশীল' অর্থাৎ একজন উপাসকের পালনীয় আচার আচরণ। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে একজন গৃহস্থ উপাসক হতে পারেন। (যো কোচি সরণগত গহট্‌ঠো তি উপাসকো)। গৃহস্থ বা উপাসককে পাঁচটি শীল পালন করতে হয় যেমন — প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা, চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকা, অকুশল কর্ম থেকে, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকা ও নেশার বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। এটিও আশা করা যায় যে একজন উপাসকের জীবনযাত্রাও কুশল হবে, তিনি কোনরূপ নিম্নস্তরের বা অসৎ জীবনযাপন করবেন না।

[দ্রষ্টব্য ঃ সি, এস, উপাসকের 'ডিক্সনারী অফ আরলি বুদ্ধিষ্ট মোনাস্টিক টারমস্‌ পৃঃ ৫০; বিনয়পিটক, ১ম, পৃঃ ৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গহপতি জাতক

জাতক সংখ্যা ১৯৯। পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে এক গৃহপতিকুলে জন্মগ্রহণ করে যথোপযুক্ত সময়ে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পত্নী ছিলেন দুঃশীলা, তাঁর গ্রামপ্রধানের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। ইতিমধ্যে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গ্রামপ্রধান তাদের ভোজনদি দিয়ে সাহায্য করেন এবং গৃহপতি দুমাসপরে ধান দিয়ে ঋণ শোধ করবেন বলেন। বোধিসত্ত্ব অবৈধ সম্পর্কের আভাস পেয়ে একদিন দুপুরবেলা বাড়ী থেকে বেড়িয়েই একটুবাদে বাড়ীতে ফিরে আসেন। স্বামীকে বাড়ীতে ফিরে আসতে দেখেই দুঃশীলা রমণী বলতে থাকেন যে গ্রামপ্রধান ধান ফেরৎ নেবার জন্য এসেছেন। এতে গৃহস্থ কিন্তু বুঝতে পারেন যে সবটাই সাজানো ব্যাপার কারণ গ্রামপ্রধান জানেন যে বাড়ীর গোলাতে বিন্দুমাত্র ধান নেই অথচ পনেরো দিন পরেই তা চাইবার জন্য আসতে পারেন না। তখন গৃহস্থরূপী বোধিসত্ত্ব উভয়কেই সমুচিত দণ্ড দেন। (জাতক, ২য়, ১৩৪)

উপরোক্ত আখ্যানটি বুদ্ধ এক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে বলেছিলেন যে কিভাবে দুঃশীলা রমণীরা স্বামীকে প্রতারণা করে। বর্ণনাটি শুনে সেই স্ত্রী বিষয়ে উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৫৮; ঈশান চন্দ্র ঘোষের জাতক, ২য়, পৃঃ ৮৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গহ্বরতিরিয় থের

পূর্বের নাম অগ্নিদত্ত, শ্রাবস্তীর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভিক্ষু যমকপাটি- হারিয়দের দেখে সংঘে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি গহ্বরতিরিয় নামক একস্থানে বসবাস করে ধ্যানসহযোগে অর্হত্ত্বপদ লাভ করেন। এরপর তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরে এলে আত্মীয়স্বজনরা এনার সম্মানার্থে উৎসবের আয়োজন করে এবং থেরকে শ্রাবস্তীতেই বসবাস করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আবার অরণ্যে ফিরে যান।

কথিত আছে তিনি শিখীবুদ্ধের জন্মকালে একজন শিকারী ছিলেন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ করার সময় তাঁর গলার স্বর শুনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন। (থেরগাথা নং ৩১, থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম, ৯১ ইত্যাদি)

ইনিই সম্ভবতঃ অপদানে বর্ণিত 'ঘোসসঞ্ঞক' (২য়, ৪৫১)। যদিও একই গাথাগুলি ধম্মিক থের সম্পর্কেও প্রযোজিত। (থেরগাথা অট্ঠকথা, ১ম, ৩৯৮)

[দ্রষ্টব্য : ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪৬]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গামণীচণ্ড জাতক

জাতক নং ২৫৭ (ঈশান ঘোষের জাতক, ২য়, ২৯৭-৩১০)। বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ জনসন্ধের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল আদাসমুখ। আদাসমুখ কেবলমাত্র সাতবছর বয়সে রাজা হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং

সফলভাবে রাজকার্যও চালান। জনসন্ধের গামণীচণ্ড নামে এক বৃদ্ধ পরিচারক ছিল। বোধিসত্ত্ব রাজা হওয়ার সময় থেকে গামণীচণ্ড অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ গামণীচণ্ড সম্পর্কে কিছুলোক রাজার কাছে অভিযোগ জানায়। রাজার কাছে লোকেরা অভিযোগ জানালে প্রাচীন লোকেরা জানান যে গামণীচণ্ড রাজার বাবার পরিচায়ক ছিলেন। এরপর রাজারূপী বোধিসত্ত্ব গামণীচণ্ডকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝতে পারেন যে গামণীচণ্ড নির্দোষ। তখন তিনি এমন রাজাদেশ দেন যে রাজার আদেশ গামণীচণ্ডের সপক্ষেই যায়। এরপর রাজা গামণী যে গ্রামে বাস করতেন সেই গ্রামটিই গামণীচণ্ডকে দান করেন উপরন্তু গ্রামটি করশূন্য করে দেন।

বুদ্ধ তাঁর প্রজা সম্পর্কে আলোচনা করবার কালে উপরোক্ত জাতকটি কিছু ভিক্ষুর কাছে বিবৃত করেন। জাতকটিতে বলা আছে যে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ ছিলেন গামণীচণ্ড। ঐস্থানে গামণীচণ্ডকে কখনও কখনও শুধু গামণী, চণ্ড ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্সনারী অফ পালি প্রপার নেমস্ ২য় খন্ড পৃঃ ৭৬০]

মণিকুন্তলা হালদার দে

গিজ্ঝকূট পর্ব্বত

রাজগৃহের চারিদিকে পরিবেষ্ঠিত পাঁচটি পাহাড়ের অন্যতম পাহাড় হল গিজ্ঝকূট। সুদূর অতীত থেকেই গিজ্ঝকূট পর্ব্বত বহু সাধকদের পরম প্রিয় স্থান। বহু মানুষ তাদের ধর্মীয় সাধনার বহু সময় এই পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন। পালি সাহিত্যে দেখা যায় গৌতমবুদ্ধ বহু সূত্রের দেশনা করেছেন এই গিজ্ঝকূট পাহাড় থেকে। উদাহরণ স্বরূপ — মাঘ সুত্ত, ধম্মিক সুত্ত, অপরিজানিয় সুত্ত, (A. III. 330), ষড়ভিজাতিয় সুত্ত, ম্যাসারোপম সুত্ত এবং দীঘনিকায়ের অন্তর্গত আটানটীয় সুত্ত (D. III 1947) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ধম্মমহাদত্থকথায় বর্ণিত আছে যে বুদ্ধের সময়ে সেখানে একটি বিহার নির্মিত হয়। সেখানে বুদ্ধ এবং তাঁদের অনুগামীদের বাস করার জন্য পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা ছিল, সেই বিহারের বসবাসকারীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিসেবার জন্য ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং দব্বমল্লপুত্তকে দায়িত্ব দেন। এ ছাড়াও ঐ বিহারে বহুদূর থেকে আসা ভিক্ষুদের রাত্রিবাসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। দব্বমল্লপুত্তের উপর তাঁদেরও দেখা শোনার ভার অর্পিত ছিল। তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে যত্নের সঙ্গে তাদের লক্ষ্য রাখতেন এবং আহারেরও ব্যবস্থা করতেন।

ভগবান বুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য যে সকল বুদ্ধানুগামী বৌদ্ধ ভিক্ষু এই গিজ্ঝকূট পর্ব্বতের বিহারে বাস করেছেন তাঁদের মধ্যে আনন্দ, (A. III. 383) মহাকস্সপ, অনুরুদ্ধ, পুন্নমন্তানিপুত্ত, উপালি, দেবদত্ত , সারিপুত্ত (M. III. 263; A. III. 300; S. II. 156) এবং ছন্ন ও চুন্দ উল্লেখযোগ্য।

বিনয় পিটকে বর্ণিত আছে যে ছন্ন একবার গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণাহেতু সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন (Vin. III. 82) অনুরূপ ভাবে বক্কলিত্ত গিজ্ঝকূট পর্ব্বত থেকে আত্মহত্যা করেন (অঙ্গুত্তর অত্থকথা Vol-I 140).

মোগ্গল্লান এবং লক্ষণ ভিক্ষু বহুবার গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে অবস্থান করেন এবং অবলোকন করেন যে রাজগৃহের বহু অধিবাসী গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে প্রেত হিসাবে থাকেন। এতে মনে হয় গিজ্ঝকূটের শোভা এবং পরিবেশ তাঁদের কাছে এত প্রিয় ছিল যে মৃত্যুর পরও তাঁরা এর টান থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এমনকি মেত্তিয়ভুম্মজক (Vin. III. 167) এবং ছ-বর্গীয় ভিক্ষুগণও (ibid 82) প্রায়ঃশই গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে থাকতেন।

বুদ্ধের জীবনী থেকে জানা যায় গিজ্ঝকূট পর্ব্বত তাঁর জীবনের বহু ঘটনার সাক্ষী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — একবার ভগবান বুদ্ধ গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে অবস্থান কালে পরিভ্রমণ করছিলেন সেই সময়ে মার বুদ্ধকে জীবন নাশের ভয় দেখিয়ে ছিলেন। অনুরূপ ভাবে দেবদত্ত এই রকমই পরিভ্রমণ কালে বুদ্ধকে হত্যার উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ প্রস্তর খন্ড নিক্ষেপ করেন। যদিও এতে বুদ্ধের কোন ক্ষতি হয়নি। কেবল তাঁর পায়ের আঙ্গুল অল্প ক্ষত হয়ে ছিল। (বি. পি. III 193) অঙ্গুত্তরনিকায়ে বর্ণিত আছে জীবক কৌমারভৃত্য এই গিজ্ঝকূট পর্ব্বতেই বুদ্ধের চিকিৎসার সুযোগ পান (Vol. I. 216) পালি সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে বহু দেবতা, রাজা এবং মানুষ গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাত করেন যেমন সহম্পতি ব্রহ্মা (S. I.153) যুবক মঘ (Sn P. 86) যক্ষ ইন্দ (স. I-206) শক্ক (সু. নি. I-233) পঞ্চসিক কস্‌সপগোত্ত ভিক্ষু, স-পারিষদ চতুমহারাজিক রাজাগণ, অভয়রাজকুমার (S. V. 126) ও আরো অনেকে।

ভগবান বুদ্ধের গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে যাবার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে দীঘনিকায়ে। সেই যাতায়াতের বিস্তৃত বর্ণনা থেকে মনে হয় এই স্থানগুলি তৎকালীন যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। উদাহরণ স্বরূপ পটিভানকূট (S. V. 448) , সীতবন যেখানে বুদ্ধ সোনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, সপ্পিনী নদীর তীরে বুদ্ধ সাক্ষাত করেন 'সবাভ' সমেত বহু পরিব্রাজকের সঙ্গে ইত্যাদি। রাজগৃহের গিজ্ঝকূটের নিকটেই ছিলো জীবকের অম্ববণ যেখানে বুদ্ধ প্রায়শঃই কাটাতেন।

পরিশেষে, 'গিজ্ঝকূট' নামকরণ দেখে মনে হয় পাহাড়টির গঠন শকুনের ঠোঁটের মতন বলেই বোধকারি এমন নাম হয়েছে। কিংবা পালি সাহিত্যে গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে বহু শকুনের বাস ছিল বলে উল্লেখ আছে — তাই বোধ হয় এরূপ নামকরণ হয়েছে।

ক্যানিংহাম চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন চাং এর বিবরণ অনুযায়ী গিজ্ঝকূট কে বর্তমান শৈলগিরি বলে মনে করেছেন।

References :

Malalasekera, G.P. Eneyclopaedia of Buddhism Vol- I

ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক

বন্দনা মুখার্জী

গিজ্ঝ জাতক (৩৯৯)

আচর্য্য বুদ্ধ ঘোষ বিরচিত জাতকট্ঠকথার ৩৯৯ নং জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে জনৈক মাতৃপোষক ভিক্ষুক সম্পর্কে বলার সময় উপরোক্ত জাতকটি বর্ণনা করেছিলেন। এই জাতকটি বারাণসীর শ্মশানবাসী জনৈক মাতৃভক্ত গৃধ্র পক্ষী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

একবার বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি চিরকালই খুব কর্তব্যপরায়ন এবং পিতৃ-মাতৃভক্ত ছিলেন। পরিণতঃ বয়সে তিনি নিজের বৃদ্ধ মাতা পিতাকে গৃধ্রগুহায় রেখে নিজে গো-মাংসাদি আহরণ করে তাদের পোষন করতেন। সেই সময়ে বারাণসীর এক শ্মশানে নিলীক নামে এক ব্যাধ গৃধ্র ধরবার জন্য প্রায়ই ফাঁদ পাততা। একদিন বোধিসত্ত্ব গোমাংসে আনুসন্ধান করতে করতে ঐ শ্মশানে প্রবেশ করে অসাবধানতা বশতঃ ফাঁদে পা রাখেন।

কিন্তু মাতৃ-পিতৃ ভক্ত বোধিসত্ত্ব নিজের জন্য চিন্তা না করে তিনি বন্দী হলে বা প্রাণ ত্যাগ করলে তাঁর নিজের মাতা পিতা কেমন করে জীবনধারণ করবেন এই চিন্তায় বিহ্বল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।

তাঁহার এই বিলাপ শুনে নিষাদ পুত্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "পক্ষী হয়ে মানুষের মত এরূপ ব্যবহার এবং কথা তো কখনও আগে শুনি নাই। এ কি ব্যপার?" তারপর গৃধ্ররূপী বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সব বর্ণনা করিলে তিনি নিষাদ পুত্র গৃধ্রকে পাশমুক্ত করিলেন। বোধিসত্ত্ব এইভাবে মরণভয় হতে বিমুক্ত হয়ে সানন্দে ব্যধকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন নিষাদ পুত্রও তাঁর জ্ঞাতি বন্ধুগণ সহ সুখে থাকতে পারেন এই বলে মুখ ভরে মাংস নিলেন এবং গুহায় গিয়ে মাতা পিতাকে তাহা খেতে দিলেন।

এইরূপ কথার শেষে শাস্তা সকল সত্য ব্যাখ্যা করলেন। তাহা শ্রবণ করে, সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধানে বলা হয় তখন ছন্দক (যিনি পরবর্তী কালে রাজা শুদ্ধোধনের সারথি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন) ছিল সেই নিষাদ পুত্র মহারাজবংশীয়েরা ছিলেন সেই পিতামাতা এবং বোধিসত্ত্ব নিজে ছিলেন গৃধ্ররাজ।

References :

1. Fausboll. ed, Jataka (PTS) Vol- III P-330

২. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, (কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী) ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮৯-১৯০

বন্দনা মুখার্জী

গিজ্ঝ জাতক — জাতক সংখ্যা ৪২৭

শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে কোন এক অবাধ্য ভিক্ষুকে লক্ষ করে এই জাতক বর্ণনা করেন।

এই ভিক্ষু প্রব্রজ্যা গ্রহণের আগে এক কুলপুত্র ছিলেন। এবং নির্বান প্রদশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার আচার্য্য উপাধ্যায়গণ এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সতীর্থগণ একজন প্রকৃত ভিক্ষুর কি কর্তব্য এবং কি-ই বা অকর্তব্য, সংঘে অবস্থান কালে কোনও ভিক্ষুর কি প্রকার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন, কি আচরণ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে নানান সময়ে তাঁহাকে অবহিত করতেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত উপদেশ পাইয়াও তিনি বড় অবাধ্য ও অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি কদাপি বিনিতভাবে উপদেশ গ্রহণ করিতেন না উপরন্তু পুত্যুত্তরে বলিতেন "আমি ত তোমাদের কোন

দোষ ধরিতে যাই না; তোমরা কেন আমায় বল? আমার কিসে ভাল কিসে মন্দ হইবে তাহা আমি বুঝিয়া লইব।" এইরূপ মানসিকতার সঙ্গে সে কাহারও কোনও উপদেশ গ্রহণ করত না।

এই ভিক্ষুর অবাধ্যতার কথা একদিন অন্য ভিক্ষুরা ধর্মসভায় আলোচনা ক'রে তাঁর নিন্দা করছিলেন। সেই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জানতে পেরে সেই ভিক্ষুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সত্যই সে এরূপ অবাধ্য আচরণ করে কি না। ভিক্ষু অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করলে শাস্তা বললেন — "এরূপ নির্বানপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেও তুমি কেন হিতবাক্য শুনছে না?" পূর্বেও যে সেই ভিক্ষু এরূপ আচরণ করে বৈরম্ভবাতঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল সেই ঘটনা স্মরণ করালেন। এই কথা বলে তিনি অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত জাতক বর্ণনা করলেন —

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা গৃধ্রকূট পর্ব্বতেই বাস করতেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সুপুত্ত। মহাবল সুপুত্ত পরিণতঃ বয়সে গৃধ্রদের রাজা হয়ে বহু সহস্র গৃধ্রসহ বিচরণ করত। সে মাতাপিতার প্রতি অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ ছিল। তাই সে বৃদ্ধবয়সে তাহাদের জন্য খাদ্য আহরণে তাহাদের পোষণ করিত। এইরূপ খাদ্য আহরণের জন্য উড়তে উড়তে মাঝে মধ্যে বহু উঁচু দিয়াও উড়ে যেতো। এটা জেনে তার পিতা (বোধিসত্ত্ব) তাকে একদিন ডেকে উপদেশ দিলেন — "বৎস, ইহার বেশী উর্দ্ধে উড়িও না। সে যথারীতি 'যে আজ্ঞা' বলে উপদেশ গ্রহণ করল। তথাপি যখন একদিন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল এমন অবস্থায় উড়তে উড়তে নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে আরও উপরে গেল এবং সহসা বৈরম্ভবাতভিমুখে পড়ে তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হল।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে চুতুদ্বার জাতকেও এই অবাধ্য ভিক্ষুর কথা আলোচিত হয়েছে এবং সমবধানে বলা হয়েছে — তখন এই অবাধ্য ভিক্ষু ছিল গৃধ্র এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন তাঁর পিতা।

এই জাতকের বেশ কিছু গাথা এবং গল্পের কিছু অংশ মৃগলোপ জাতক (৩৮১), দূব্বচ জাতক এবং ইন্দসমানগোত্র জাতকের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক।

References :

১. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, (কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী) ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪

২. Malalasekera – Encyclopaedia of Buddhism.

বন্দনা মুখার্জী

গিজ্ঝ জাতক (নং ১৬৪)

কোনও এক সময় বোধিসত্ত্ব শকুন যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে বাস করতেন। একবার এক প্রচন্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঝড়বৃষ্টির দাপটে সকল শকুনকেই বাধ্য হয়ে গিজ্ঝকূট পর্বত পরিত্যাগ করে বারাণসীর এক গুহায় আশ্রয় নিতে হয়।

একজন বণিক শকুন (গৃধ্র) দের এরূপ অবস্থা দেখে তাদের সেবার নিমিত্ত অগ্নি ও খাদ্য দিলেন। এইভাবে এরপর থেকে তিনি তাদের নিয়মিত সেবা করতেন। প্রাকৃতির বিপর্যয় প্রশমিত হবার পর যখন শকুনের দল নিজেদের পুরাতন বাসায় ফিরে গেলো তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে — সেই বণিককে কিছু প্রত্যুপকার করবে এবং তাঁকে তাঁর সাহায্যের বিনিময়ে কিছু উপহার দেবে। সেজন্য উদ্দেশ্যে তারা তাদের ভ্রমণকালে যেখানে কোনও মূল্যবান গহনা বা মনি-মাণিক্য পেত সেগুলি সংগ্রহ করে রাখত। একদিন তারা সেগুলি বণিকের বাসার বাগানে উপহারস্বরূপ ফেলে দিল। এই সংবাদ পেয়ে তৎকালীন রাজা এক বিশাল ফাঁদ পাতলেন, এবং তাতে এক শকুন ধরা পড়ল। ফাঁদে ধরা পড়ে জীবন ফিরে পাবার আশায় শকুনটি রাজার কাছে সব স্বীকার করল। রাজা শকুনটিকে ছেড়ে দিলেন এবং সকল সম্পদ সেই মালিকটিকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। সেই সময় রাজা ছিলেন আনন্দ এবং সারিপুত্র ছিলো সেই বণিক।

এই গল্পের অবতারণা হয়েছিল একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উদ্দেশে যিনি তাঁর গরীব পিতামাতার অন্নের ভার গ্রহণ করেছিলেন। ভগবানবুদ্ধ সেই ভিক্ষুর দান, দয়া এবং কর্তব্যের বিশেষ প্রশংসা করেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, (কলিকাতা)]

বন্দনা মুখার্জী

গিঞ্জকাবসথ

পালি ভাষায় 'গিঞ্জকা' শব্দের অর্থ হলো ইঁট। সুতরাং ইঁটের নির্মিত অবাসকেই বলা হয় গিঞ্জকাবাস'। ভগবান বুদ্ধ যখন বজ্জীতে যাবার সময় নাদিকায় যান তখন অম্বপালি তাঁহার উদ্যানটি বুদ্ধ এবং তাহার অনুগামী ভিক্ষুসংঘের জন্য দান করেছিলেন। সেইখানে একটি ইঁট দিয়ে হলঘর তৈরী করা হয়, তারই নাম ছিল 'গিঞ্জকাবসথ' বা ইষ্টক নির্মিত প্রাসাদ। বুদ্ধদেব প্রায়শই এই গিঞ্জকাবসথে বাস করতেন। এখানে তিনি বহু সুত্তের দেশনা করেছেন। যেমন — চুলগো-সিঙ্গ সুত্ত, জনবসভ সুত্ত ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে কচ্চায়ন থের, কচ্চানগোত্রস্থুত থের সন্ধ ইত্যাদি বহু ভিক্ষুকেই বুদ্ধ গিঞ্জকাবসথে দেশনা করেছেন। জনবসভ সুত্ত এবং গিঞ্জকাবসথ সুত্ত উভয় সুত্তেই দেখা যায় নাদিকাবাসীদের পর্নজন্ম এবং ভাগ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধ গিঞ্জকাবসথে অবস্থান কালেই দিয়েছেন। এই সকল আলোচনা থেকে মনে হয় নাদিকাবাসীরা তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিল। মহাপরিনির্বান সুত্তে উল্লিখিত আছে যে এই সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে নাদিকার গিঞ্জকাবসথে 'ধম্মাদাস' (প্রকৃত সত্যের) বিশ্লেষন করেন।

মজ্ঝিমনিকায় অট্টকথায় উল্লিখিত আছে যে পরবর্তী কালে গিঞ্জকাবসথ আরামে ভিক্ষুদের সুন্দর ভাবে বসবাসের জন্য সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছিলো। (Majjhima Nikāya Aṭṭhakathā Vol. I - 424) গিঞ্জকাবসথের জন্য ব্যবহৃত ইঁটগুলি বিশেষভাবে তৈরী ছিলো এবং মনে হয় কাঠের ব্যবহার ও তাতে প্রচুর ছিলো।

নাদিকার ইঁট (গিঞ্জক) দিয়ে তৈরী বড় বড় অট্টালিকা প্রমান দেয় তৎকালীন যুগের উন্নতমানের স্থাপত্য শিল্পের নির্দশন। সংযুক্তনিকায়ে উল্লিখিত আছে যে এই আরামগৃহ যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্যই কেবল নির্মিত হয়েছিলো তা নয় অন্যান্য ভিক্ষুরাও এতে বাস করত। যেমন — উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শোভিয় কচ্চায়ন পরিব্রাজক এখানে ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি পান্থশালা ছিল।

References :

Malalasekera Dictionary of Pali Proper Names Vol- I P. 764-65

গিরগ্গসমজ্জা

'গিরগ্গসমজ্জা' শব্দের বিশ্লেষণ করলে হয় গিরি-অগ্গ-সমাজ। অর্থাৎ পাহাড়ের উপর যে সভা হয়। রিজ ডেভিড্স তার পালি-ইংরাজী অভিধানে শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন — এটি একটি উৎসবের নাম যাহা রাজগীরে পাহাড়ের উপর প্রতিবছর উদ্‌যাপিত হোতো। পালি সাহিত্যের অন্তর্গত বিনয়পিটক, ধম্মপদত্থকথা, জাতক এবং সুত্তনিপাতে আমরা এই উৎসবের কথা পাই। এই সব গ্রন্থে বলা হয় এই উৎসব সুপ্রাচীন কাল থেকে (কালানুকালম্) রাজগৃহে এই উৎসব পালন হতো। দুপুর বেলায় মুক্ত আকাশের নীচে এই উৎসবের আয়োজন হতো। অঙ্গ, মগধ ইত্যাদি স্থান থেকে বহু প্রকারের মানুষ আসতেন এই উৎসবে যোগদান করতে। বিশেষ বিশেষ পদাধিকারী এবং সম্মানীয় ব্যক্তির জন্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত আসনের ব্যবস্থা থাকত। নৃত্যই ছিল এই উৎসবের মূল অঙ্গ। এ ছাড়াও গান বাজনা ইত্যাদি নানাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই উৎসব পালন হতো। বিনয় পিটকে বলা হয়েছে শুধু যে গৃহী উপাসকেরাই উৎসবে যোগদান করতেন তাই নয় ভিক্ষুরাও বিভিন্ন সংঘ থেকে এসে অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। সত্তরসবর্গীয় এবং ছ-বর্গীয় ভিক্ষুরাও অনেকে এই উৎসবে যোগদান করতেন।

বুদ্ধঘোষকৃত জাতকট্ঠকথায় বলা হয়েছে এটি একটি বার্ষিক উৎসব যাহা সমগ্র জম্বুদ্বীপে সুদুর অতীতকাল থেকে দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ও পালন করা হতো। নৃত্যগীত বাদ্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন রকমের খাদ্যও পরিবেশন করা হতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে। বুদ্ধঘোষ 'সমন্তপাসাদিকায়' 'গিরগসমগ্গা' শব্দের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

"গিরগ্গসমজ্জো তি গিরিমিহ অগ্গসমজ্জো গিরিগ্গ বা অগ্গদেসে সমজ্জো।" এবং বলেছেন উৎসব শুরুর সাতদিন আগে উৎসবের ঘোষনা করা হতো এবং শহরের বাহিরে পাহাড়ের ছায়ার নীচে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। তাঁর মতে এটি সম্ভবতঃ বর্মাদেশের প্রাচীন অসবর্নিক গণতান্ত্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

পালি 'গিরগ্গসমজ্জা' শব্দের সংস্কৃত হলো 'গিরিবগুসমাগম'

References :

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol- I

বন্দনা মুখার্জী

গিরিদত্ত জাতক

জাতক সংখ্যা ১৮৪। শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে কোনও এক বিপক্ষসেবী ব্যক্তির সম্পর্কে এই জাতকের অবতারণা করেন। তিনি বলেন — এই ব্যক্তিটি যে কেবল এই জন্মেই এরকম বিপক্ষসেবী ছিল তাই নয় পূর্বজন্মেও সে এই রকমই ছিল। এই বলে তিনি অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে শ্যামরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর মন্ত্রীকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণতঃ বয়সে তাঁর ধর্মানুশাসকের পদে নিযুক্ত হন।

শ্যামরাজের পাণ্ডব নামে এক মঙ্গলাশ্ব ছিল। গিরিদত্ত নামে এক জন খোঁড়া ব্যক্তি তার সহিসের কাজ করত গিরিদত্ত যখন ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যেত, মঙ্গলাশ্ব ভাবত — সহিস বুঝি তাকে কিভাবে চলবে তাই শিক্ষা দিচ্ছে। এই বিশ্বাসে সে সহিসের নকল করে চলতে চলতে নিজেও খঞ্জ হয়ে গেল। এদিকে রাজার কানে এই খবর পৌঁছালে পর তিনি অশ্ববৈদ্য এনে ঘোড়াটির পরীক্ষা করালেন, কিন্তু তার কোন রোগ বা রোগের কারণ পাওয়া গেল না। তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে ডেকে বললেন — "বয়স্য আপনি গিয়ে এর খঞ্জতার কারণ নির্ণয় করে আসুন।"

বোধিসত্ত্ব গিয়ে অশ্বটিকে দেখেই বুঝলেন যে খঞ্জ সহিসের সংসর্গে এসেই অশ্বটি খঞ্জ হয়েছে। তিনি রাজাকে এই সংবাদ দিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এখন কর্তব্য কি? উত্তরে বোধিসত্ত্ব বললেন — "অবিকলাঙ্গ অশ্ব নিবন্ধক পেলে অশ্বটি পুনরায় যেরকম ছিল সে রকম হয়ে যাবে"।

অতঃপর রাজা ঐরূপ ব্যবস্থা করলেন; অশ্বও তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেল। ধর্মানুশাসকরূপী বোধিসত্ত্ব প্রাণীদেরও স্বভাব জানেন দেখে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত এবং তুষ্ট হলেন এবং বোধিসত্ত্বকে মহাসম্মান জানালেন।

গল্পটির সমবধানে বুদ্ধ বলেন তখন দেবদত্ত ছিল গিরিদত্ত, এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই মঙ্গলাশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং নিজে ছিলেন সেই পণ্ডিত অমাত্য।

এই বিপক্ষসেবী ব্যক্তির অতীতবস্তু মহিলামুখ জাতকে (২৬) বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Fausböll Jataka Vol I, II, PTS (London)

ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, ১, ২ করুণাপ্রকাশনী (কলিকাতা)

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

গিরিমানন্দ সূত্র

গিরিমানন্দ সূত্র অঙ্গুত্তর নিকায়ের সচিত্ত বর্গের অন্তর্গত একটি সূত্র। শাস্তা যখন শ্রাবস্তীর নিকটবর্তী জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে একদিন আনন্দ বুদ্ধকে সংবাদ দিলেন যে গিরিমানন্দ অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি শরীরের চর্মক্ষত রোগে ভুগছেন। শাস্তা কি দয়া করে সেখানে যাবেন গিরিমানন্দকে দর্শন দিতে?

শাস্তা তখন আনন্দকে বললেন গিরিমানন্দকে দশটি সংজ্ঞার কথা বলতে। আনন্দ গিরিমানন্দের রোগশয্যার পাশে গিয়ে নিম্নলিখিত দশটি সংজ্ঞা (পালি দশ সঞ্ঞা) বললেন এবং তার ব্যাখ্যা করলেন। এই দশ সঞ্ঞা (দশ সঞ্ঞা) হোলো :

অনিত্য সঞ্ঞা, অজ্ঞ সঞ্ঞা, অশুভ সঞ্ঞা, আদিনব সঞ্ঞা, পহান সঞ্ঞা, বিরাগ সঞ্ঞা, নিরোধ সঞ্ঞা, সব্বলোক অনভিরত সঞ্ঞা, সব্বসংখার সঞ্ঞা, অনিত্য সঞ্ঞা এবং আনাদানগতি সঞ্ঞা।

আনন্দ বুদ্ধের আদেশ অনুযায়ী দশ সঞ্ঞার ব্যাখ্যা করলেন। গিরিমানন্দ দশ সঞ্ঞার সাধনা দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই প্রসঙ্গে দীঘনিকায় (২য় খন্ড পৃঃ ৩১৭) অঙ্গুত্তর নিকায় (খন্ড ৫, ৭৪-৭৭) এবং বিসুদ্ধিময় খন্ড ৩, পৃঃ ৪৩৭ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names (London 1937) Vol- I

গিরিমানন্দ থের

গৌতমবুদ্ধের সময়ে গিরিমানন্দ রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন রাজা বিম্বিসারের প্রধান পুরোহিতের পুত্র হিসাবে। একবার রাজগৃহে বুদ্ধ পর্দাপন করলে গিরিমানন্দ সেখানে যান। সেই ভিক্ষুসংঘের সভায় ভগবান বুদ্ধের তেজদীপ্ততার পরিচয় পেয়ে তিনি বুদ্ধধর্মে অনুরক্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংঘে যোগদান করেন।

একবার তিনি বিদ্যাভ্যাসের জন্য রাজগৃহের অদূরে কোনও এক গ্রামে বাস করছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি ভগবানের আগমন সংবাদ পান এবং ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য রাজগৃহে উপস্থিত হন। বিম্বিসার তাঁকে সেখানে থাকতে পরামর্শ দেন এবং তিনি গিরিমানন্দকে দেখাশোনা করার ও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ রাজা তাঁর অঙ্গীকারের কথা একেবারে ভুলে যান। ফলে গিরিমানন্দকে মুক্ত আকাশের নীচে কিছুকাল বাস করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু তাঁর নিজ পুণ্যের ফলে বৃষ্টিদেবতা বারিবর্ষন বন্ধ করে দেন যাতে থের গিরিমানন্দ বর্ষনসিক্ত না হন।

এদিকে রাজা বিম্বিসার বর্ষার অভাবে রাজ্যে খরা এবং দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখে কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। সেই কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি নিজের স্মৃতি বিভ্রমের কথা স্মরণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ গিরিমানন্দকে একটি কুটির নির্মাণ করে দেবার জন্য আদেশ দেন। সেই কুটিরে বসে গিরিমানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন হন এবং কালক্রমে অর্হত্ব অর্জন করেন। গিরিমানন্দ নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বুদ্ধের প্রশংসা করেন :

বস্সতি দেবো যথা সংগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা এসসম্ বিহারামি বুপসন্তো, অথ চে পথয়সি পবস্স দেবো, গাথা নং ৩২৫বস্সতি দেবো যথা সংগীতং ..... এস্সম্ বিহোমি সন্তচিত্তো..... তস্সম্ বিহারামি বিতরাগো ...... বিহারামি বিতদোসো .... পবস্স দেবো (৩২৬-৩২৯)।

থেরগাথা অট্ঠকথায় বর্ণিত আছে সুমেধ বুদ্ধের সময়ে গিরিমানন্দ একজন গৃহী উপাসক ছিলেন। মহামারীতে বহু মানুষের সঙ্গে গিরিমানন্দের স্ত্রী পুত্রও মারা যান। গিরিমানন্দ ভয়ে গ্রাম ছেড়ে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভগবান তাঁর এই বিপদের সংবাদ পেয়ে সেখানে যান এবং গিরিমানন্দকে অভয় দেন। গিরিমানন্দ ফুল ইত্যাদি দিয়ে সুমেধ বুদ্ধের অর্চনা করেন।

গিরিসুত্রে বর্ণিত আছে যে যখন থের গিরিমানন্দ অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন তখন ভগবান বুদ্ধ তাঁর উদ্দেশ্যে গিরিসুত্তের (যাহা গিরিমানন্দ সুত্ত নামেও পরিচিত) দেশনা করেন এবং তিনি এই সুত্ত শ্রবণ করে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Theragāthā ed. by Mrs. Rhys Dands (London, PTS, 1980) PP-192-193.

2. Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

গুণ জাতক

গুণ জাতক আচার্য্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত জাতকট্ঠকথার ১৫৭ সংখ্যক জাতকের গল্প বা বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত। অন্যান্য জাতকের মত এই জাতকের পচ্চুপ্পন্নবত্থুর বিবরণ থেকে জানা যায় যে একবার বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ কোশলরাজ অন্তপুরাচারিনীদের কাছ থেকে ভিক্ষুদের জন্য মোট এক সহস্র বস্ত্র [মূল জাতকে শাটক আছে। শাটক শব্দের অর্থ শাড়ী, অর্থাৎ এখানে বড় কাপড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে] উপহার পেয়েছিলেন। এই উপলক্ষে শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে এই জাতকের অবতারণা করেন। নীচে অতীত বত্থু বা মূলকাহিনী বিবৃত করা হলো।

কোন এক সময় বোধিসত্ত্ব সিংহ জন্ম পরিগ্রহণ করে কোন এক পর্ব্বত গুহায় বাস করতেন। সেই পর্ব্বতপাদের নীচে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। তার তীরে কাদার মধ্যে কচি সবুজ তৃণ জন্মাত এবং মাঝে মাঝেই হরিণ, খরগোশ এবং অন্যান্য প্রাণীরা এই কচি তৃণের লোভে সেখানে যেত।

একদিন এক হরিণ সেখানে তৃণের লোভে গেছে। এমন সময় সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব হরিণ শিকারের অভিপ্রায়ে পর্ব্বতশিখর থেকে প্রচন্ড তাড়াতাড়ি জলাশয়ের ধারে ধাবিত হলেন। হরিণটা সিংহের গর্জনে মরণভয়ে আর্তনাদ করতে করতে পলায়ণ করল। কিন্তু সিংহ বেগ সংবরণ করতে না পেরে সেই জলাশয়ের পাঁকে পড়ে গেলেন। বহু চেষ্টা করেও তিনি কিছুতেই কাদার থেকে পা তুলতে পারলেন না। এই ভাবে চার-পায়ে স্তম্ভের মত সাতদিন তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কাটালেন।

অবশেষে একদিন এক শিয়াল খাবার খোঁজে সেই পথে এলে সিংহ তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু শিয়াল প্রাণভয়ে কিছুতেই সিংহকে কর্দমমুক্ত করতে চাইল না। অবশেষে সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি শিয়ালের ক্ষতি করা তো দূরে থাকুক, বরং যথেষ্ট উপকার করবেন এবং তাদের বন্ধুত্ব আজীবন

স্থায়ী থাকবে। শিয়াল তাতে রাজী হয়ে সিংহকে কর্দমমুক্ত করল এবং তাঁকে জলাশয়ের উপরে উঠে আসতে যথেষ্ঠ সাহায্য করল।

অনন্তর সিংহ উপরে উঠে এসে কিছুকাল বিশ্রাম করে দু-জনে একসঙ্গে পুনরায় শিকারে বাহির হলো। তারপর থেকে শিয়াল এবং তার স্ত্রী ও সিংহ এবং সিংহী দুজনে এক সঙ্গে বাস করতে লাগল এবং একসঙ্গে শিকারে বার হতো। তারা দু-জনে। যা শিকার করত বাড়ী এনে চারজন মিলে ভাগ করে খেত। এই ভাবেই তারা শান্তিতে ও আনন্দে বাস করছিল। কিছুকাল পরে সিংহী এবং শিয়ালী দু-জনেরই দুটি পুত্র জন্মাল। এরা সকলে এক সঙ্গে বাস করতে লাগল। হঠাৎ একদিন সিংহীর ভাবান্তর হলো, সে ভাবল সিংহ নিশ্চয় শিয়াল-শিয়ালী এবং তাদের বাচ্চা দু-টিকে বেশী ভালবাসে। অতএব শিয়াল পরিবারকে এবার তাড়ানই শ্রেয়। এই ভেবে সে সিংহ এবং শিয়ালের অনুপস্থিতে শিয়ালী এবং তার শাবকদের নানা ভাবে উৎপীড়ন করতে শুরু করল। সিংহীর এই ব্যবহার যখন সিংহের কানে পৌছাঁলো তখন সিংহ -সিংহীকে বোঝাল কেমন করে শিয়াল তাকে একদিন অনেক কষ্ট এবং বিপদ থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলো। সিংহের এই কথা শুনে সিংহী শিয়ালীর নিকট ক্ষমা চাইল এবং তারপর থেকে তারা পুনরায় সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

কথার শেষে শাস্তা চারি আর্য্য সত্য ব্যাখ্যা করলেন। তাহা শুনে কেউ প্রথম মার্গ, কেউ দ্বিতীয় মার্গ, কেউ বা তৃতীয় এবং কেউ চতুর্থ মার্গ প্রবেশ করল।

সমধানে বলা হয়েছে যে আনন্দ ছিলেন সেই শিয়াল যিনি সিংহের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন এবং বোধিসত্ত্ব নিজে ছিলেন সিংহ যিনি প্রত্যুপকায় করে ছিলেন এবং উপকারীর উপকার স্বীকার করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই জাতকের অবতারণা হয়েছিলো যাহা পূর্বেই বলা হয়েছে — আনন্দের এক সহস্র বস্ত্র উপহারের বিষয়ে।

একবার কোশলরাজের অন্তঃপুরচারীনীগন তাঁর শিক্ষা দানে খুশী হয়ে পঞ্চশত নতুন বস্ত্র, যেটা রাজা তাঁদের দিয়েছিলেন সেটা স্থবির আনন্দকে দান করেন এবং আনন্দ আবার সেটা ভিক্ষুসংঘের মধ্যে বিতরণ করেন। যাইহোক অন্ত-দুরচারিনীদের এই নতুন বস্ত্র দানে রাজা প্রথমে অত্যন্ত বিরক্ত হন। এবং বলেন একজন ভিক্ষু তিনটির বেশী বস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন না সুতরাং আনন্দ পাঁচশত বস্ত্র নিয়ে কি করবেন। এই বলে আনন্দকে ডেকে সব জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে তিনি রাজমহিষীদের দান গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু নিজে না রেখে সেগুলি সব সৎকার্যে ব্যয় করেছেন। রাজা সে কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আরও পাঁচশত বস্ত্র দান করেন। আনন্দ সেগুলি তাঁর একশ দহর ভিক্ষু, যিনি বিশেষ ভাবে আনন্দের সেবা করেন এবং উপকার করেন তাঁকে দান করলেন। সেই দহর ভিক্ষু আবার তাঁর সতীর্থদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করলেন, এবং অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন কেন আনন্দ কোন এক নির্দিষ্ট ভিক্ষুকে বেছে নিয়ে এই পাঁচশত বস্ত্র দান করলেন? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বললেন — কেবল মাত্র মুখাবলোকন করে নয় — উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্তব্য। এই বিবেচনা করেই আনন্দ তাকে বস্ত্রগুলি দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছাই তাঁকে দহর ভিক্ষুকে দানে প্রবৃত্ত করে ছিল। প্রাচীন কালে পন্ডিতরাও উপকারীর

প্রত্যুপকার করত। এই বলে শাস্তা অতীত বস্ত্র প্রসঙ্গে সিংহ ও শিয়ালের গল্প অর্থাৎ আনন্দ এবং বোধিসত্ত্বের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বা অতীতবস্ত্র বর্ণনা করলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

Fausboll Jataka Vol- II, (PTS London)

ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক, খণ্ড -২ (করুণাপ্রকাশনী কলিকাতা)

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I (London, 1937)

বন্দনা মুখার্জী

গুত্তিল জাতক

আচার্য্য বুদ্ধ ঘোষের জাতকট্ঠকথার ২৪৩ নং জাতকের কাহিনী।

ভগবান বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করিতে ছিলেন সেই সময় একবার দেবদত্ত ভিক্ষু সংঘের সামনে বললেন — তিনি নিজের চেষ্টায় পিটক ত্রয় আয়ত্ত করেছেন এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন করতে শিখেছেন। এইভাবে তিনি নিজের আচার্য্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেইসময়ে শাস্তা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের আলোচনার বিষয় জানতে পারলেন এবং বললেন — "দেবদও যে কেবল এ জন্মেই আচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান দ্বারা এবং তাঁর সঙ্গে শত্রুতার দ্বারা নিজের সর্বনাশ করেছেন তাই নয় পূর্ববতী জন্মেও তিনি এ-রকম করেছিলেন।" এই বলে তিনি সেই অতীত কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

বোধিসত্ত্ব একবার গুপ্তিল (পালি-গুত্তিল) নামে বারাণসীতে গান্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গান্ধর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে গুত্তিল গান্ধর্ব নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই সময়ে গান্ধর্ব বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ কেউ-ই জম্বুদ্বীপে ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং অন্ধ পিতামাতার সেবাশুশ্রুষা করে জীবন যাপন করতেন।

তাঁর মুসিল নামে এক ছাত্র ছিল। তিনি সুদূর উজ্জয়িনী নগর থেকে এসেছিলেন বোধিসত্ত্বের কাছে বীণা বাজানো শিখতে। গুত্তিল প্রথমে রাজী না হলেও পরে তাঁর মাতাপিতার অনুরোধে নিজে যা জানেন তার সবই মুসিলকে শিক্ষা দিলেন।

কিছুকাল পরে গুত্তিল মুসিলকে রাজদরবারে নিয়ে গেলেন রাজার সঙ্গে 'নিজের ছাত্র' পরিচয় দিয়ে পরিচয় করিয়েও দিলেন। অতি অল্পদিনে মুসিল রাজার প্রিয় পাত্রও হয়ে গেলেন। তিনি রাজ পরিবারে গান্ধর্ব হিসাবে গুত্তিলের সমকক্ষ হয়ে রাজার সেবা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আচার্য্য গুত্তিলের সঙ্গে মুসিলের প্রতিযোগিতার একটা ব্যবস্থা হলো। গুত্তিল বৃদ্ধ বয়সে ছাত্রের সঙ্গে পরীক্ষায় বসতে হবে এবং যদি পরাজিত হন তো তাঁর মানসম্মান বজায় থাকবে না এই ভয়ে এক বনে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন।

শত্রু গুত্তিলের এই রকম মনোকষ্ট দেখে অত্যন্ত দয়া পরবশঃ হয়ে তাঁকে রক্ষা করার জন্য উদগ্রীর হয়ে এগিয়ে এলেন। প্রতিযোগীতা শুরু হলো। গুত্তিল শক্রের নির্দেশ মেনে বীণা বাজাতে শুরু করলেন তাঁর বীণার আওয়াজে সারা বারাণসী নগরী মুগ্ধ হয়ে গেল, স্বর্গ থেকে অপ্সরা কিন্নারীরাও তাঁর বীণার সুরে মুগ্ধ হয়ে মর্তেও

চলে এলেন এবং নীচে এসে নৃত্য শুরু করলেন। মুসিল পরাজিত হলেন এবং রাজা মুসিলকে ভৎর্সনা করে বললেন — নিজের ওজন না বুঝে আচার্য্যের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে যাওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত ভুল হয়েছে। অনন্তর জনতা ইট্‌ পাথর ইত্যাদি যে যাহা পেল তাই দিয়ে মুসিলকে আঘাত করে তাঁকে মেরে ফেলল। পরে শক্র তাঁর সারথি মাতলিকে প্রেরণ করলেন গুত্তিলকে আনবার জন্য। গুত্তিল তাবতিংস স্বর্গে এসে দেবতাদের এবং দেবকন্যাদের মুগ্ধ করলেন তাঁর বীণার স্বরে। পারিশ্রমিক হিসাবে তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানলেন কোন পুন্যবলে তাঁরা তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তাহ কাল অতীত হলে দেবরাজ সারথি মাতলিকে আদেশ করলেন গুত্তিলকে রথারূঢ় করে বারানসীতে পাঠাতে। গুত্তিল বারাণসীতে ফিরে এই সাতদিনে দেবলোকে যা দেখেছেন স্বচক্ষে — তাই মনুষ্য লোকে প্রচার করলেন। তারপর থেকে মর্তের উৎসাহের সঙ্গে পুন্য অনুষ্ঠানে কৃত সংকল্প হয়ে পুন্য কর্ম করতে লাগল।

সমবধানে বলা হয়েছে সেই সময়ে দেবদত্ত ছিলো মুসিল অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন গুত্তিল গর্দ্ধব।

এইপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে গুত্তিল ছিলেন সেই চারজন মানুষের একজন যারা মানব শরীরে তাবতিংস স্বর্গে গিয়েছিলেন। বাকী তিনজন হলেন সাধীনা, নিমি এবং মান্ধাতা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Fausboll Jataka (PTS London)

২. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক (কলিকাতা)

৩. Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

৪. মিলিন্দ প্রশ্ন ১১৫, ২১৯

বন্দনা মুখার্জী

গুহ্যসমাজতন্ত্র / শ্রী গুহ্যসমাজ মহাগুহ্যতন্ত্ররাজ

প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রগুলিকে মহাযান সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা খুব কঠিন। কারণ এমন অনেক সূত্র আছে যেগুলির মধ্যে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি এমনভাবে বর্ণিত আছে যে মনে হয় পরবর্তী কালে মহাযান সূত্রগুলিই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎস। গুহসমাজতন্ত্র বা শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্ররাজ তন্ত্রশাস্ত্রের একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

গুহ্যসমাজতন্ত্রের সঠিক রচনা কাল নিয়ে নানান মতবিরোধ আছে। তবে অন্যান্য মহাযান এবং তান্ত্রিক পুঁথির মত গুহ্যসমাজতন্ত্রও আদি বুদ্ধ সম্পর্কে প্রশ্নের এবং রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন। শ্রদ্ধেয় বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে গুহ্যসমাজতন্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক[১] এবং তাঁর মত সমর্থন করেছেন বহু পন্ডিত।[২] বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য বহু পন্ডিতের মতে গুহ্যসমাজতন্ত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে অসঙ্গে সময়ে। তাঁদের মতে তার আগে পর্যন্ত তন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরায় মাধ্যমে গোপনভাবে প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ বজ্রাচার্য্য বা সিদ্ধগনই হলেন প্রথম যাঁরা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের মধ্যভাগে চর্য্যাগানে এবং শিক্ষার মাধ্যমে তন্ত্রের জনপ্রিয়তা আনেন। যাই হোক যদিও খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক গুহ্যসমাজতন্ত্রের রচনা কাল হয়। (যদিও অনেকে আবার এইমত সমর্থন করেন না) তথাপি একথা সত্য যে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে প্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সময় থেকেই 'গুহ্যসমাজতন্ত্র'কে তন্ত্রের একটি প্রামান্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। প্রশ্ন হতে পারে — কেন 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক এবং ৭ম শতকের আগে বা মধ্যবর্তী সময়ে স্বীকৃত হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অনুমান করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তারানাথের মতে — প্রায়তিনশত বৎসর পর্যন্ত তন্ত্রের চিন্তাধারা ভারতীয় সমাজে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক ধ্যান ধারণা এবং আচার আচরণ ইত্যাদি প্রথমদিকে অত্যন্ত গোপনভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধ এবং বজ্রাচার্য্য গণই প্রথম দোঁহা গান এবং শিক্ষার মাধ্যমে তন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলেন — যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারানাথের মতে তান্ত্রিক সূত্র আচার অনুষ্ঠান এবং শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি গোপন ভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলত কারণ এখানে এমন অনেক আচার অনুশীলন করতে হতো যেটা কিনা যিনি এ জ্ঞান অর্জন করেন নি এমন মানুষের কাছে অন্যায় পাপ কার্য্য মনে হতে পারে। কেবল মাত্র তান্ত্রিক মন্ত্রশিষ্যরাই এর গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে তন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করতে তান্ত্রিক সাহিত্য এবং মন্ত্রগুলি 'সন্ধ্যা ভাষায়' রচিত হয়েছে। গুহ্যসমাজতন্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়।

ইন্দ্রভূতি তাঁর রচনায় তথাগতগুহ্যক বা গুহ্যসমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন। এমনকি শিক্ষাসমুচ্চয়েও বেশ কয়েকবার তথাগত গুহ্যকের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মহাযান সূত্রের বইতে শীলের শিক্ষা প্রসঙ্গে এই পুস্তকের উল্লেখ হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে অসঙ্গ 'গুহ্যসমাজের' উল্লেখ করেছেন।

এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা পদ্য ও গদ্যের মিশ্রিত একটি শাস্ত্র। গুহ্যসমাজতন্ত্রের দু-টি ভাগ পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্দ্ধ। প্রথমভাগ পূর্বার্ধ ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং পণ্ডিতগণ মনে করেন ইহাই মূল অংশ। তাঁহাদের মতে পূববর্তী লেখকরা তাঁহাদের রচনায় গুহ্যসমাজতন্ত্রকে অষ্টাদশ পটলে (18th Chapter) বিভক্ত করেছেন। দ্বিতীয় খন্ডের একটি বিশেষ অংশ হলো 'প্রজ্ঞপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি' যাহা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের রচনা।

গুহ্যসমাজতন্ত্র বাস্তবিকভাবে তান্ত্রিক মন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এখানে উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও মন্ত্র, যন্ত্র, নানাধিক মুদ্রা, মন্ডল, তান্ত্রিক, যোগসাধনের বিভিন্ন উপায়, জীবন ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে যার থেকে একজন শিক্ষানবীশ যথাযথ ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মাননীয় বিনয় তোষ ভট্টাচার্য্যের মতে গুহ্যসমাজতন্ত্রের রচনার মূল উদ্দেশ্য হলো এই পথে মোক্ষ (enligrhtenment) মুক্তির সহজ সরল এবং সঠিক উপায় সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান।

অনেক নতুন তত্ত্ব এবং ধারণার এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে গুহ্যসমাজতন্ত্রে। ধ্যানী বুদ্ধ এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক দেব-দেবী এবং শক্তিমূর্তির বর্ণনা প্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্রেই

পাওয়া যায়, এবং বলা হয় গুহ্যসমাজতন্ত্রই বৌদ্ধদের বিভিন্ন দেব-দেবী ইত্যাদি প্রসঙ্গে ধ্যান-ধারণার প্রদর্শক।

গুহ্যমসাজন্তের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত সমাজে নানান মতভেদ আছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে যেহেতু শিক্ষাসমুচ্চয়ে (পৃঃ ১২৬, ১৫৮, ২৭৪, ৩১৮, ৩৫৭) 'তথাগতগুহ্যক' গ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে অনেকে মনে করেন গুহ্যসমাজতন্ত্র তথাগুহ্যকেরই পরবর্তী সংসরণ। আবার দু-টি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে শিক্ষাসমুচ্চয়ে উল্লিখিত অংশগুলি সম্ভবতঃ গুহ্যসমাজের প্রথম ভাগ এবং বৈপুল্য সূত্রের অন্তর্গত এবং বৈপুল্য সূত্রই হলো মূলতঃ তথাগতগুহ্যকের অন্তর্গত। বিষয়গত এই সাদৃশ্যের জন্যই গুহ্যসমাজকে তথাগতগুহ্যকের অন্তর্গত বলা হয়েছে। গুহ্যসমাজতন্ত্র নেপালী বৌদ্ধদের মতে নব-ধর্মপর্য্যায়ের অন্তর্গত।

গুহ্যসমাজের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায় এর বিভিন্ন টীকা, টীপ্পনী থেকে। সবথেকে প্রাচীন টীকারকারদের মধ্যে নাগার্জুন, কৃষ্ণাচার্য্য, লীলাবজ্র, শান্তিদেব এবং রত্নাকরশান্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তীব্বতে গুহ্যসমাজতন্ত্র বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তীবতী কাঞ্জুর সংগ্রহের মধ্যে গুহ্যসমাজতন্ত্র এবং উহার টীকা উভয়ই সমানভাবে স্থান লাভ করে মর্য্যাদা পেয়েছে। চীনা ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়েছে। নাঞ্জিও (Nanjio No) 1027 উল্লেখ করে গুহ্যসমাজতন্ত্রের। এইগুলি ছাড়াও Nanjio 23 (3) এবং 1043 ও গুহ্যসমাজতন্ত্র শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

1. Indian Buddhist Iconography (Introduction, xxix)

2. Anāgārika Govinda. Fomdation of Tibetan mysticism (P-94)

গ্রন্থপঞ্জী

1. Malalasekera, Encyclopaedia of Buddhism, Vol-V PP. 389-391

বন্দনা মুখার্জী

গূথপাণ জাতক

জাতক সংখ্যা — ২২৭। 'গূথপাণ' শব্দের অর্থ হলো — গোবুরে পোকা অর্থাৎ বিষ্ঠাভোজী এক কীট বিশেষ।

শাস্তা জেতবনে অবস্থান করবার সময়ে কোন একদুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন ভিক্ষুকের প্রসঙ্গে এই জাতক কাহিনীর অবতারণা করেন।

অতীত বথু

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের সময়ে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীরা এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাবার জন্য দুই দেশের সীমান্তবর্তী কোনও এক জায়গার বিশ্রামশালায় থেকে সেখানে মদ্যপান এবং মৎস্য মাংস ইত্যাদি আহার করে পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে তারা নিজ নিজ কাজে চলে যেতেন।

এইরকম একদিন কিছু পথিক পান্থশালা ত্যাগ করে নিজ কাজে রওনা হলে একটি গুহ্যপান মলগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে এলো। পূর্বের রাত্রির অবশিষ্ট সুরা দেখে সে সেই সুরা পান করে মদোম্মত্ত হয়ে মলস্তূপের উপর বসে পড়ল। সেই সময়ে একটি হাতী সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে মলের গন্ধে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুরাসক্ত গুথপান কীট মদের নেশায় ভাবল হাতী বুঝি তার শক্তিকে ভয় পেয়ে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করছে। তাই সে হাতীর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় গেল। সে হাতীকে যুদ্ধে আহ্বান করল।

হাতী কীটের এই স্পর্দ্ধা দেখে ফিরে এসে গুথকীটের মাথায় মলত্যাগ এবং প্রসাব করে তাকে সেইখানেই মেরে ফেলল।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই গল্পটি বলা হয়েছিল কোন একজন দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন এবং স্থূলবুদ্ধি এক ভিক্ষুকের প্রসঙ্গে।

পচ্চুপ্পন্নবথু

সেই ভিক্ষু অত্যন্ত অশিষ্ট ছিল এবং নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে খুব গর্ববোধ করত। জেতবন থেকে অদূরে কোনও এক গ্রামে ভিক্ষুদের শলাকা দ্বারা তণ্ডুল বিতরণ করা হতো। এই ভিক্ষু সেই নিগমগ্রামে বাস করত। যখন কোনও দহর ভিক্ষু সেই নিগম গ্রামে শলাকাগৃহে অন্ন নেবার জন্য উপস্থিত হতো এই অশিষ্ট ব্যক্তি অকারণে তাকে প্রশ্ন বাণে জর্জরিত করে ভিক্ষান্ন নিতে দিত না। ফলে তার ভয়ে কোন ভিক্ষুই সেই গ্রামে যেতে চাইত না।

একদিন একজন শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান ভিক্ষু তাকে জব্দ করবার জন্য উপস্থিত হলেন। যথারীতি সেই অশিষ্ট ভিক্ষু সেই বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী ভিক্ষুকে প্রশ্ন করলে তিনি অশিষ্ট ভিক্ষুকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করে প্রচণ্ড প্রহারে তার হাড় পাঁজর ভেঙ্গে দিলেন এবং তার মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে সতর্ক করে দিলেন আর যেন কোন দিন সে কোনও ভিক্ষুকে বিরক্ত না করে। এই ঘটনার পর সেই অশিষ্ট ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু দেখলেই পলায়ন করত।

এই জাতকের সমবধানে বলা হয়েছে — তখন এই অশিষ্ট প্রশ্নকারক ছিল সেই গুথকীট, এর দমনকার্তা ছিলেন সেই হাতী এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন পূর্ববর্ণিত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারী বনদেবতা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক (কলিকাতা), করুনা প্রকাশনী

২. Fausböll — Jataka (PTS, London)

বন্দনা মুখার্জী

গোকুলিক

বুদ্ধের পরিনির্বানের একশত বৎসর পরেই বৌদ্ধসংঘের দু-টি বিভাজন হয়। (১) স্থবিরবাদ (২) মহাসঙ্ঘিক। তারও একশত বৎসর পর অর্থাৎ বুদ্ধের পরি-নির্বাণের দুইশত বৎসর পর মহাসঙ্ঘিকরা আবার দু-টি ভাগে বিভক্ত হয়, যেমন —

১। গোকুলিক বা কোকুলিক এবং

২। এক ব্যবহারিক।

গোকুলিকরা আবার কিছুকাল পর তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় যেমন —

১। চৈত্যক

২। বহুশ্রুতিয়

৩। প্রজ্ঞপ্তিবাদ।

গোকুলিক বাদের প্রধান বৈশিষ্ট হলো তাদের মতে সকল প্রকার সংস্কার থেকেই উৎপত্তি হয় দুঃখরূপ জ্বলন্ত অঙ্গার। এই প্রসঙ্গে মহাবর্গের আদীপ্ত পর্যায় দেশনা সূত্র উল্লেখযোগ্য। সেখানে ভগবান ভিক্ষুদের আহ্বান করে বলেছেন — সমস্তই জ্বলছে, চক্ষু জ্বলছে, রূপ জ্বলছে, চক্ষু বিজ্ঞান জ্বলছে, চক্ষু সংস্পর্শ জ্বলছে এবং সংস্পর্শ, বেদনা, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা না দুঃখ না সুখ বেদনা জ্বলছে। রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নির দ্বারা জ্বলছে। জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণ জ্বলছে। ভিক্ষুগণ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ। গোকুলিকরা তাদের সংস্কার রূপ অঙ্গারের ধারণা এই আদীপ্ত পর্যায় দেশনা (আদিত্ত পরিয়ায় সুত্ত) থেকেই করেছে।

উপরিউক্ত এই আলোচনা থেকে মনে হয় তাদের এই মতবাদ এর জন্যই মনে হয় এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের নাম কুক্কুলিক বা কুক্কুটিক হয়েছে। মনে হয় কুক্কুলিক তাদের মূল নাম পরবর্তী কালে এই শ্রেণীর ভিক্ষুদের নাম গোকুলিক হয়েছে। যদিও, পালি সাহিত্যে 'গোকুলিক' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

[দ্রষ্টব্য ঃ

১. G.P. Malalasekera - Dictionary of Pali Proper Names Vol-I P. 783

২. মহাবর্গ, প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, শ্রী অধর লাল বড়ুয়া দ্বারা প্রকাশিত, খ্রীঃ ১৯৩৭। পৃঃ ৩৬-৩৭।

৩. বৌদ্ধকোষ ২য় খণ্ড।]

বন্দনা মুখার্জী

গোঠাভয়

গোঠাভিক নিকায়ের একজন ভিক্ষু যিনি সংঘপাল পরিবেণে বাস করিতেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে তিনি রাজা দ্বিতীয় গোঠাভয়ের মামা ছিলেন এবং চেষ্টা করিতেন রাজার মন জয় করতে তিনি সংঘমিত্রর প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে 'মহাবংশে' বলা হয়েছে চোল বংশোদ্ভূত ভিক্ষু সংঘমিত্র ভূতশাস্ত্রের জ্ঞানে এবং তার অভ্যাসে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। রাজা মেঘবর্ণাভয় (যিনি গোঠাভয় নামেও পরিচিত) তিনি সংঘমিত্রকে তাঁর জ্ঞানের জন্য অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং

পৌঁছিয়েছেন যে তিনি চতুরার্য্য সত্যকে দর্শন ও উপলব্ধি করেছেন। তাঁর সকল প্রকার ভুলের এবং সন্দেহের অবসান হয়েছে এবং একমাত্র প্রকৃত গোত্রভূ-ই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দর্শন এবং উপলব্ধি সঠিক ভাবে করতে সক্ষম। তাঁর এই মানসিক পর্যায় (অনুলোম চিত্ত) বিবর্ত্তনের একটি ধাপ। এই বিবর্তনের ফলে তাঁর জাগতিক পর্য্যায় থেকে উত্তরণ হয় এবং নির্বাণ লাভ হয়।

পুগ্গল পঞ্ঞত্তিতে ও 'গোত্রভূ' বলতে এমন একজন আর্য্যকে বলা হয়েছে যিনি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রবেশের পূর্ব মুহুর্তের যে মানসিক অবস্থা তাতে পৌঁছিয়েছেন এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপলব্ধি করেছেন (পুগ্গল পঞ্ঞত্তি-১০)। ইহার অথকথায় এই ধরনের চিত্তের অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে পৃথুজ্জন এবং স্রোতাপন্নের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আর্য্যপুদ্‌গল বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Malalasekera– G.P. Encyclopaedia of Buddhism, Vol-V PP. 380-381

2. Aṅguttara Nikāya Vols. IV, V

3. Majjhima Nikāya Vol. III

4. Aṅguttara Nikāya Aṭṭhakathā Vol. IV

5. Visuddhimagga — VII. P. 672.

বন্দনা মুখার্জী

গোতম বুদ্ধ

চব্বিশজন বুদ্ধের পরবর্তী পঁচিশতম বুদ্ধ হলেন গৌতমবুদ্ধ, যিনি সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত। তিনি কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে এবং গৌতম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোধন এবং মাতার নাম মায়াদেবী (মহামায়া নামেও পরিচিতা)।

পালি এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্গ জাতক নিদান কথা, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, মহাপরিনির্বাণ সুত্ত ইত্যাদিতে গৌতমবুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এ সব গ্রন্থের কোনও কোনও অংশে ভিন্নত্ব হলেও মোটামুটি ভাবে তাঁর জন্মের পূর্ববৃত্তান্তের বিষয় সব পুস্তকেই একই রকম।

মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণের পূর্বে তিনি ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর তুষিত সর্গে বাস করে ছিলেন, অপেক্ষা করে ছিলেন পরবর্তী এবং শেষ জন্মের জন্য। অতঃপর দেবতাদিগের অনুরোধে মানবগণের পরিত্রাণ হেতু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মত জম্বুদ্বীপের অন্তগর্ত মধ্যদেশে হয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।[১] সেই সময় জম্বুদ্বীপের অন্তগর্ত মধ্যদেশে ক্ষত্রিয়েরাই প্রধান ছিল। অতএব তিনি কপিলবস্তুরাজ শাক্যবংশীয় শুদ্ধোদনের পুত্রত্ব স্বীকার করে তাঁহার মহিষী মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করেন। মহামায়ার গর্ভধারণ এবং গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময়ে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল যেমন — মহামায়া স্বপ্নদর্শন করেন " যেন এক শ্বেত হস্তী তাঁর কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করল"[২] পরদিন এই স্বপ্নের হেতু দৈবজ্ঞগণ গণনা করলেন — "মহিষী হয় রাজ চক্রবর্তী, নয় বুদ্ধ প্রসব করবেন"।

যাই হোক দশমাস পর পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মহামায়া দেবহৃদ (ব্রাহ্মপুর) নামক স্থানে তাঁর পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পথে লুম্বিণী নামক উদ্যানে প্রবেশ করে সেখানে এক শাল বৃক্ষমূলে তার এক শাখা হাতে নিয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বিনা যন্ত্রনায় পুত্র প্রসব করেন। চারজন মহাব্রাহ্মণ একটি স্বর্ণজালে পুত্রকে গ্রহণ করেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি ধারা পড়ে শিশুকে স্নান করাবার জন্য। ভূমিষ্ঠ হবার পরই শিশু সপ্তপদ উত্তরাভিমুখে ভ্রমণ করে সিংহনাদ করে — "আমি এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সেই দিনই আরও ৭ জন পৃথিবীতে জন্ম নেয়। তাঁরা হলেন — বোধিবৃক্ষ, রাহুল মাতা যশোধরা, সারথি ছন্দক, কালোদায়ী, আনন্দ, গৌতমের হস্তী এবং তাঁর ঘোড়া কন্ঠক। অতঃপর মায়াদেবী সপুত্র কপিলবস্তুতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তার সাতদিন পরই তিনি দেহত্যাগ করেন।

বোধিসত্ত্বের জন্মে দেবলোকে উল্লাস আরম্ভ হয় — তাহাঁকে দেখবার জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষি অসিত দেবল সেখানে আগমন করেন এবং শুদ্ধোধন ও তাঁর পুত্রকে দর্শন করেন। শিশু ঋষিকে দর্শন মাত্র তাঁর জটায় পর্দাপন করেন — অসিত ও শুদ্ধোদন দু-জনেই তখন শিশু পুত্রকে প্রণাম করেন। শিশুকে দেখে অসিত অঝোরে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন এত বৎসর বয়সে এই শিশু বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবে কিন্তু তখন তিনি নিজে জীবিত থাকবেন না; তাই তিনি তাঁর ভাগিনেয় নালককে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের উপদেশ দিলেন।

জন্মের পর পঞ্চম দিবসে নামকরণ উৎসবের আয়োজন করা হলো। ১০৮ জন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন প্রাসাদে। তার মধ্যে রাম, ধ্বজ, লক্ষণ, মণি, কোদঞ্ঞ ভোজ, সুযাম এবং সুদও ছিলেন লক্ষণ বিশারদ। তাদের মধ্যে কোদঞ্ঞ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন — শিশুটি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন এবং সেই দিন থেকে শিশুটি 'সিদ্ধার্থ' নামে পরিচিত হলো। আগেই বলা হয়েছে প্রসবের সপ্তম দিনে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। তার বোন মহাপ্রজাপতী গৌতমী (শুদ্ধোদনের দ্বিতীয় স্ত্রী) তাঁর লালন পালন করেন। গৌতমের শৈশবে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে হলকর্ষণোৎসব অন্যতম। এই উৎসব দেখতে গিয়ে তিনি জম্বুবৃক্ষ মূলে ধ্যান নিমজ্জিত হন — পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে হেলে গেলেও বৃক্ষের ছায়া নিশ্চল ভাবে ছায়াদান করে — এই দৃশ্যদর্শনে শুদ্ধোধন দ্বিতীয়বার তাঁকে প্রণাম করেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র নামক আচার্য্যের নিকট সিদ্ধার্থ বিদ্যালাভ করতে যান ও নানাধিক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ললিত বিস্তরে দেখা যায় যে দিন প্রথম তাঁকে হাতে খড়ি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো, কুমার ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ করে জানতে চাইলেন কোন প্রকারের লিপি তাঁকে শেখানো হবে ..... ইত্যাদি।

সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদন তাঁকে সংসারে মন দেবার জন্য নানান রকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলা হয় তাঁর তিনটি প্রাসাদ ছিলো — রম্য, সুরম্য এবং সুভ। তিনটি (শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা) ঋতুর জন্য। ষোল বৎসর বয়সে শুদ্ধোদন চর্তুদিকে দূত প্রেরণ করেন শাক্যদের মধ্যে। কিন্তু অতি অল্প বয়সের জন্য কোন শাক্যরাজাই তাঁদের কন্যা দান করতে রাজী ছিলেন না। তখন শুদ্ধোদন স্বয়ংবর সভা ডাকলেন এবং সেখানে সিদ্ধার্থের নানাবিধ শাস্ত্র এবং অস্ত্র-শাস্ত্র চালনা বিষয়কপরীক্ষা

হলো। সিদ্ধার্থের গুণের পরিচয় পেয়ে সমস্ত শাক্যরাজারা এত মুগ্ধ হলেন যে সকলেই একজন করে কন্যা দান করতে রাজী হলেন। অবশেষে সিদ্ধার্থ সুপ্পবুদ্ধের কন্যা যশোধরাকে (গোপা) তাঁর স্ত্রী রূপে গণ্য করলেন। যিনি পরবর্তীকালে রাহুলমাতা নামে পরিচিতা হন।

পুত্র রাহুলের জন্মের পর ২৯ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থ পিতার অনুমতি নিয়ে সারথি ছন্দকের সঙ্গে নগর পরিভ্রমণ করতে গেলেন। পথে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর তিনটি দৃশ্য দর্শনে তাঁর উপলব্ধি হলো মানুষের সকল সুখ মরীচিকার মতো ক্ষণস্থায়ী। জাগতিক সুখ এরকমই অনিত্য। অবশেষে তিনি একদিন দেখলেন কাষায়বস্ত্র পরিহিত পরিব্রাজক এক ভিক্ষুর শান্ত সমাহিত সৌম্যমূর্তি। সিদ্ধার্থের মনে হলো ইনি রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা সবকিছু ত্যাগ করেছেন। তাই দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি হয়ত নিত্য সুখের সন্ধান পেয়েছেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ স্থির করলেন তিনিও ঐ পরিব্রাজক ভিক্ষুর পথ অনুসরণ করবেন।

সুতরাং ২৯ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রিতে শেষ বারের মত পুত্র রাহুল এবং রাহুলমাতাকে নিঃশব্দে দর্শন করে, সারথী ছন্দককে নিয়ে তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থকের পিঠে চড়ে সমভিব্যবহারে অভিনিস্ক্রমনে বার হলেন। যাবার আগে পথে কামাদেব মার তাঁকে নানাভাবে বাধা দান করতে থাকে, বিবিধ প্রলোভন দেখায় কিন্তু সিদ্ধার্থকে নিবৃত্ত করার বৃথা চেষ্টা করে হেরে যায়। এভাবে ত্রিশ যোজন পরিভ্রমণ করার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের অভিনিস্ক্রমনের পর ছন্দক ফিরে আসেন এবং শোকাতুর কন্থক প্রাণ ত্যাগ করে।

অনোমা থেকে বোধিসত্ত্ব মল্লদেশে অনুপিয় অম্ববনে সপ্তাহকাল বাস করেন এবং সেখান থেকে পুনরায় মগধের রাজধানী রাজগৃহে আসেন সেখানে রাজা বিম্বিসার তাঁকে পুনর্বার গৃহী করবার জন্য বৃথা প্রয়াস করেন — রাজগৃহ থেকে চলে গিয়ে আড়াঢ় কালমি এবং রুদ্রক-রামপুত্র নামক দুইজন আচার্য্যের কাছে যোগভ্যাস করেন কিন্তু তাঁদের উপদেশেও তাঁর চিত্ত শান্ত হলো না। তিনি গ্রামে আসেন এবং কৌণ্ডিণ্য ইত্যাদি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগত ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কাছে কঠোর তপস্যার ফলে গৌতমের দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তিনি জীর্ণ ও শীর্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর উপলব্ধি হলো যে যেমন কঠোর পরিশ্রম এবং শারীরিক কষ্টের দ্বারা কোনও সাধনা সম্পূর্ণ হতে পারে না, তেমনি আবার আরামের মাধ্যমেও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তাই তিনি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলেন। অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান সেরে পূর্ণা নামক দাসীর হাতে সুজাতা প্রেরিত পায়স ভক্ষন করে বোধিদ্রুমমূলে আসন স্থাপন করে উপবেশন করলেন। সেখানেও মার তাঁকে বৃথা নানান ভাবে বিরক্ত করতে লাগল ও তাঁর ধ্যানসাধনায় বাধা দান করতে শুরু করল। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বেই মারের পরাজয় হলো। সিদ্ধার্থ পূর্বনিবাস জ্ঞান লাভ করলেন। তাঁর দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হলো ও তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করলেন। সেইদিন থেকে তিনি গৌতম থেকে 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তাঁর মুখ থেকে নিম্নলিখিত উদান বিনিঃসৃত হলো —

"অনেক জাতি সংসারম সন্ধ্যাবিস্‌সং অনিবিসম্‌
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনম্‌।
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতম্‌
বিসঙ্খারতং চিত্তং তন্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

১. ললিত বিস্তরে লিখিত আছে যে গৌতম তুষিত স্বর্গে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বকে তাঁর স্থানে বসিয়ে আসেন।

২. কথিত আছে মহামায়া গর্ভধারণ করেন আষাঢ় পূর্ণিমার দিন উত্তরাষাঢ় চন্দ্রে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোনও দৈহিক রূপ সম্পর্ক ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী

১. Malalasekera, G.P. Encyclopaedia of Buddhism Vol- V. PP. 364-376.

২. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক

বন্দনা মুখার্জী

গোতম থের

গোতম থের গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন এবং প্রব্রজ্যা নেন। কিন্তু যখন তাঁর বয়স ১৭ তিনি হঠাৎ কুসংঙ্গে পড়েন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ রাজগৃহের এক গণিকাকে দান করেন। এমত অবস্থায় একদিন হঠাৎ তাঁর চৈতন্য হল। তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় বুদ্ধের ধ্যানে মগ্ন হলেন। ভগবান বুদ্ধ সেই ভিক্ষুর (গোতমের) মনের অবস্থা এবং সাধনার স্তরের কথা উপলব্ধি করতে পারলেন। গৌতম পুনরায় সংঘে প্রবেশ করে ধ্যান সমাধিতে রত হলেন এবং অচিরে অরহত্ব প্রাপ্ত হন। থেরগাথায় আরও বলা হয়েছে যে যখন গোতম স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী ইত্যাদি চারটি মার্গ ও ফলের ধ্যান করছিলেন সেই সময় একজন গৃহী উপাসক তাঁকে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে জানতে চাইলেন। গোতম অকপটে তাঁর পূর্ব্বতী সংযমবিহীন অসাধু জীবনের কথা স্বীকার করেন।

থেরগাথার অর্থকথায় বলা হয়েছে বিপ্পসী বুদ্ধের সময়ে গোতমথের একজন গৃহী উপাসক ছিলেন এবং বুদ্ধকে আমোদ ফল দান করেন।

তাঁকে অপদানের আমোদফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. D. P. P. N. Vol I 786

2. Theragāthā 1378

বন্দনা মুখার্জী

গোতমথের

গোতমথের পালি সাহিত্যে 'অপর গোতম' নামেও পরিচিত। তিনি শ্রাবস্তীর উদিত্য ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। গোতম বুদ্ধের পূর্বেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সর্বপ্রকার বেদবিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং সুন্দর ভাবে বেদ এবং ধর্মের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। যখন ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে আসেন — অনাথপিণ্ডিক কর্তৃক জেতবনে দান গ্রহন করতে সেই সময় বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তিনি বুদ্ধধর্ম সম্পর্কে অনুরক্ত হন এবং বৌদ্ধধর্ম শ্রবন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা গ্রহন করে ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন হন ও অরহত্ব লাভ করেন। দীর্ঘকাল কোশলে অবস্থানের পর যখন তিনি পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করেন তাঁর পূর্ববর্তী আত্মীয় এবং পরিজনেরা এবং শ্রাবস্তীবাসী ব্রাহ্মণরা গোতমথেরকে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বচন (সুধীবাদ) এবং ব্রাহ্মণধর্মের সু-উপদেশ শোনাতে থাকেন। কিন্তু গোতমথের তাঁদের ভগবান বুদ্ধের ধর্ম এবং দর্শনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

থেরগাথা — শ্লোক সংখ্যা ৫৮৭-৯৬।

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

গোতমক চেতিয়

ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে পালি 'চেতিয়' বা সংস্কৃত চৈত্যের বা স্তুপের একটি বিশেষ স্থান আছে। বৌদ্ধসাহিত্যে চৈত্যের উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। 'চেতিয়' সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে যদি 'চৈত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখি তাহলে দেখা যাবে যে 'চেতিয়' শব্দটি 'চিতক' বা 'চিতি' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো স্তুপ বা স্তুপাকৃতি একটি স্থান যার নীচে কোন সম্মানীয় ব্যক্তির দেহভস্ম বা চিহ্ন রেখে তার উপর বেদী বা মন্দির ইত্যাদি করা হয় সেই পুজনীয় ব্যক্তিটিকে সম্মান জানাতে এবং তাঁকে স্মরণ রাখতে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'চেতিয়' বলতে কেবলমাত্র কোন স্তুপ বা বাড়ীকেই বলা হয় না চেতিয় শব্দটি কোনও বিশেষ বৃক্ষ, স্থান বা নামাঙ্কিত জায়গা বা অন্যকিছু ধর্মীয় উপদেশ লেখা শিলা ইত্যাদিকে ও বোঝায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বৃক্ষ পূজা বা চৈত্যপূজার উদাহরণ বৈদিক সাহিত্যে যেমন অথর্ব বেদেও পাওয়া যায় (Atharvaveda LXXI)

ধর্ম্মপদত্থকথায় উল্লিখিত আছে যে বুদ্ধ নিজে চৈত্যের নির্মাণ করেন তাঁর শিষ্য সন্ততি এবং পুতিগত্তিস্যের স্মরণচিহ্নের উপর সম্মান জানাতে। এখানে বুদ্ধবগ্গের অন্তর্গত "অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ বত্থু" তে বর্ণিত আছে যে — ভগবান বুদ্ধ কোন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন মানুষ তার প্রার্থিত বস্তু লাভ করবার জন্য বহু প্রকার শরণ গ্রহন করে যেমন পর্বত, বন, আরামগৃহ বৃক্ষচৈত্য ইত্যাদি। ধম্মপদত্থকথার ভাষায় ঃ

"বহুবং যে শরণং যান্তি পব্বতানি বনানি চ
আরাম রুক্খ চেত্যানি মনুস্‌সা ভয় তজ্জিয়া।"

অনুরূপ ভাবে জৈন সাহিত্য, পুরান এবং সূত্র সাহিত্যে ও চৈত্যের উল্লেখ আছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে মনে হয় চৈত্য পূজার প্রচলন বহুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল।

আলোচ্য গোতমক চেতিয় বৈশালীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি চেতিয়। বৌদ্ধসাহিত্যে যে সকল চেতিয়ের বর্ণনা আছে 'গোতমক চেতিয়' তার মধ্যে অন্যতম। গোতমক চেতিয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গৌতম বুদ্ধকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করত। তাই বোধিলাভ করবার পর প্রথম দিকে তিনি বহু সময় এই গোতমক চেতিয়ে কাটিয়েছেন। একবার বৈশালীর গোতমক চৈতিয়ে অবস্থান কালে তিনি ভিক্ষুসংঘের জন্য এক বিশেষ নিয়ম প্রবর্তন করেন। বিনয়পিটকের অন্তর্গত পাতিমোক্ষ সুত্তে এই সম্পর্কে উদ্ধৃত আছে যে একবার বৈশালীতে অবস্থান কালে বুদ্ধদেব রাত্রিতে অত্যন্ত শীতবোধ করেন এবং অতিরিক্ত বস্ত্র অবশেষে পরিধান করতে বাধ্য হন। তখন থেকে তিনি আদেশ করেন একজন ভিক্ষু একসঙ্গে তিনটি বস্ত্র ব্যবহার করতে পারেন। (বিনয়পিটক, খন্ড-১ পৃঃ ২৮৮, খন্ড-৩ পৃঃ ১৯৬)

গোতমক চেতিয়টি প্রাক্ বুদ্ধ সময়ের এবং কথিত আছে যে ইহা গোতমক নামক এক যক্ষের নামে সমর্পিত হয়েছিলো। পরবর্তী কালে এখানে একটি বিহার নির্মাণ করা হয় বুদ্ধ এবং তার শিষ্যদের জন্য। (ধম্মাপদত্থকথা — খন্ড ৩, পৃঃ ২৪৬; সুত্তনিপাত অত্থকথা — খন্ড ১ — পৃঃ ৩৪৪) এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বুদ্ধোঘোষ তার রচনায় গোতম চেতিয়কে 'রুক্খচেতিয়' বলে বর্ণনা করেছেন (.... গোতম চেতিয়া দি-নি রুক্খ চেতিয়ানি চতে তে ভয়েন তজ্জিতা) (ধম্মাপদত্থাকথা ৩য় খন্ড পৃঃ ২৪৬)

বুদ্ধদেব এখানে বহু সুত্তের দেশনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ গোতমক সুত্ত, হেমবত সুত্ত ইত্যাদি। দিব্যাবদানে (পৃঃ ২০১) বৈশালীর বিশেষ বিশেষ স্থানের তালিকা নথিভুক্ত আছে। সেখানে 'গোতম নিগ্রোধ' নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ গোতম নিগ্রোধ বলতে গোতমক চেতিয়কেই বলা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Malalasekera - Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

গোধা জাতক — (১)

জাতক সংখ্যা ৩৩৩। শাস্তা জেতবনে অবস্থান কালে জনৈক ভূস্বামীকে লক্ষ্য করে এই কথা বলে ছিলেন। এই ব্যক্তির কোন পল্লীগ্রামে কিছু পাওনা ছিল। সেটি আদায় করবার জন্য তিনি একদিন সস্ত্রীক সেখানে যান। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য আদায় করে ফিরবার পথে ব্যাধেরা তাঁকে ভোজনের জন্য একটি রান্না করা গোধা দিয়েছিল। কিন্তু সেই ভূস্বামী তাঁর স্ত্রীকে জল আনতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই সমস্ত গোধাটা খেয়ে ফেললেন, স্ত্রী ফিরে এলে তাঁকে বললেন, "ভদ্রে গোধাটা পালিয়ে গেছে"। স্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন 'বেশ করেছে। রান্না করা গোধাটা যখন পালিয়ে গেছে তখন আমরা আর কি করতে পারি।' "স্ত্রী স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরেও কিছু বললেন না।"

অতঃপর এই দম্পতি জেতবনের কাছে উপস্থিত হয়ে জল পানের উদ্দেশ্যে বিহারে প্রবেশ করলেন এবং জল পান করলেন। সেই দিন প্রত্যুষে শাস্তা তাঁদের স্রোতপত্তি ফল লাভের সময় উপস্থিত হয়েছে এটা উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি তাঁদের আগমন প্রতীক্ষায় গন্ধকুটিতে উপবেশন করছিলেন। তার দেহ থেকে ষড়্‌বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকির্ণ হচ্ছিল।

অনন্তর ঐ রমণী জলপান করে শাস্তার নিকট উপবেশন করলে শাস্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — "উপাসিকে তোমার স্বামী তোমার সম্বন্ধে হিতকাম, সস্নেহ ও উপকারক?" রমণী তার উত্তরে বললেন "তিনি তাঁর স্বামী সম্বন্ধে হিতাকাঙ্খিণী ও স্নেহপরায়না কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁর সম্বন্ধে নিঃস্নেহ।" এই শুনে শাস্তা বললেন — "তুমি কোন চিন্তা করো না। এই লোকটির স্বভাব এ রকমই। কিন্তু ইনি যখন তোমার গুণ স্মরণ করেন তখন তোমাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য দান করেন" এই বলে উক্ত দম্পতীর অনুরোধে তিনি অতীত কথা আরম্ভ করলেন —

পুরাকালে বারানসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর সর্বকৃত্যকার মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজার পুত্র উপরাজ ছিলেন। একদিন তিনি যথা নিয়মে রাজার অর্চ্চনা করতে রাজার সামনে উপস্থিত হলে রাজার হঠাৎ মনে হলো "এ — আমার অনিষ্ট সাধন করবে না কেউ বলতে পারে?" এই ভেবে তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন রাজপুত্র নগরে বাস করতে পারবে না। তাঁর জীবনান্তে তিনি রাজত্ব করবেন। রাজপুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করে বারানসী থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন এবং এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে পর্ণশালা নির্মাণ করে ফলমূল খেয়ে বাস করতে লাগলেন।

একদিন তারা বহুদূর থেকে পথক্লান্ত হয়ে ফিরছিলেন, পথে এক ব্যাধ তাঁকে রান্না করা গোধার মাংস দিয়েছিল। রাজকন্যা লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে পথ চলছিলেন, পথে রাজা জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা এক অশত্থমূলে বসলেন এবং রাজকন্যা গোধাটিকে অশত্থশাখায় ঝুলিয়ে রেখে পদ্মপত্রে জল আনতে গেলেন। রাজপুত্র এই অবসরে সমস্ত মাংস খেয়ে নিলেন এবং রাজকন্যা ফিরে এলে বল্লেন — ভদ্রে, গোধাটা শাখা থেকে নেমে এসে বল্মীক স্তূপে প্রবেশ করেছে। আমি ছুটে এসে তার লাঙ্গুলের অগ্রভাগা ধরেছিলাম। টানাটানিতে তাঁর লাঙ্গুলটা ছিঁড়ে গেছে, তাই এই অংশটুকু আমার হাতে আঁছে।

রাজকন্যা সব বুঝতে পেরেও শুধু বললেন — "রান্না করা গোধা যদি পালিয়ে যায়, যাক"। এই বলে জল পান করে তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্ত করলেন এবং বারানসী অভিমুখে রওনা হলেন।

কালক্রমে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হলে রাজকুমার বারানসীতে এসে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং উক্ত মহিষীকে "অগ্রমহিষীর" আসনে বসালেন। কিন্তু রমনীর ভাগ্যে পদলাভ ব্যতিত কিছুই লাভ হলেন। তিনি বিন্দুমাত্র বিশেষ সম্মান এবং সংবর্দ্ধনা লাভ করলেন না।

রমণীর এই অবস্থা দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন এই রমনী রাজার জন্য নিজের স

সর্বসুখ পরিত্যাগ করেছিলো কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পায় নি। সুতরাং তাঁকে মর্যাদা দেবার অভিপ্রায়ে বোধিসত্ত্ব পন্ডিতাচার্য্য রূপে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে তাঁর পূর্বের কার্য্যের কথা মনে করালেন। রাজা সভা মধ্যে রাণীর প্রতি নিজের এই দুর্ব্যবহার স্মরণ করে অত্যন্ত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হলেন। তিনি রাণীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলেন এবং সমস্ত রাজ্য তাঁকে দান করলেন এবং বোধিসত্ত্বের কাছেও ক্ষমা চেয়ে তাঁকে প্রচুর দান করলেন।

কথান্তে শাস্তা সমস্ত সত্যের ব্যাখ্যা করলেন এবং তাহা শুনে সেই দম্পতী স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হলেন।

সমবধানে বলা হয়েছে তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী। এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন সেই পন্ডিতাচার্য্য।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Jataka, ed. V. Fausboll Vol-III. (London, 1877-97)

2. G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

3. Noraman (ed) The Dhammapadaṭṭhakathā Vol-V (London PTS)

বন্দনা মুখার্জী

গোধা জাতক — (২)

জাতক সংখ্যা ৩২৫। এই জাতক শাস্তা জেতবনে জনৈক ভন্ড ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। তিনি যখন সেই ভিক্ষুর ভণ্ডামির কথা জানতে পারলেন তখন বললেন — "এই ব্যক্তি কেবল এ জন্মেই নয়, পূর্বেও সে এরূপ ভন্ড ছিল"। অতঃপর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগলেন।[১]

কোন এক সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে গোধা যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বলিষ্ঠদেহ হইয়া অরণ্যে বাস করছিলেন। ঐ অরণ্যের নিকটবর্তী স্থানে উপরিউক্ত দুঃশীল তাপসও পর্ণশালা নির্মাণ করে বাস করতেন। গোধারূপী বোধিসত্ত্ব চরতে চরতে সেখানে গিয়ে তাপসের পর্ণশালা দেখে ভাবলেন এ নিশ্চয়ই কোনও ধার্মিক তাপসের হবে। তাই তিনি ভিতরে প্রবেশ করে তাপসকে প্রণিপাত করে পর্ণশালায় ফিরে গেলেন। একদিন তপস্বীর এক শিষ্যের গৃহে তৃপ্তিকর গোধা মাংস খেয়ে তাঁর খুব লোভ হলো। তিনি স্থির করলেন আশ্রমে প্রায়শঃই যে গোধা আসে সে খুব হৃষ্ট পুষ্ট। এবার সে আসলেই তাকে মেরে যথারুচি মাংস রেঁধে খাব। এই ভেবে তিনি কাষায় বস্ত্রের ভিতর মুদ্গর রেখে বোধিসত্ত্বের অপেক্ষায় বসে রইলেন।

অতঃপর একদিন বোধিসত্ত্ব আশ্রমে ঢুকে দুষ্টেন্দ্রিয় তাপসকে দেখেই স্বীয় ক্ষমতাবলে তাপসের মনোভাব বুঝতে পেরে তাপসের সামনে না গিয়ে সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাপস তাঁর লুকানো মুদ্গর গোধারূপী বোধিসত্ত্বকে লক্ষ করে ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু তাতে বোধিসত্ত্বের শরীরে উপর না পড়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলে অল্প আঘাত লাগল। তাপস তখন আপসোস করে বলল — "যা, আমার লক্ষ্য ঠিক হয়নি বলে তুই বেঁচে গেলি"। বোধিসত্ত্ব উত্তরে বললেন — তিনি ও

তাপসের মুদ্গর থেকে রক্ষা পেলেন, কিন্তু তাপস তো চতুর্বিধ আসব থেকে অব্যাহতি পাবে না। এই বলে তিনি পলায়ন করলেন এবং সেই আশ্রমের চঙ্ক্রমনকোটিস্থ বল্মীকে প্রবেশ করলেন এবং বিবরান্তর দিয়ে মুখ বের করে তাপসের সঙ্গে আলাপচ্ছলে দু-টি গাথা বললেন। যার মর্মার্থ হল এই —

"তাপসের বাহ্যিক সাধু সদাচার দেখে মনে হতো তিনি একজন ধার্মিক, তাই বোধিসত্ত্ব প্রত্যহ তাঁকে প্রণিপাত করতে যেতেন। কিন্তু আজ, মুদ্গর প্রহারে উপলব্ধি করলেন তাপস নেহাতই ভন্ড। সুতরাং যাহাঁর অন্তরের ক্লেদ পরিমার্জিত হয় নি, তার বাহিরের পোশাকের পরিবর্তনে কি ফল হবে? তখন কূট তাপস আবার পুনরায় তাঁকে আশ্রমে আসতে অনুরোধ করলেন এবং বহু সু-স্বাদু খাদ্যের লোভ দেখালেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁকে নিম্নলিখিত গাথা শুনাইলেন —

"লবণ পিপ্পলী খাইলে তোমার
অহিত নিশ্চিত ঘটিবে আমার।
প্রবেশিব তাই বল্মীক ভিতর
পাব সেথা শত শত সহচর"

এই গাথা বলে বোধিসত্ত্ব বললেন তিনি সমস্ত গ্রামে যেখানে চরতে যাবেন, সকল গ্রামবাসীকে তাপসের এ ভন্ডামীর কথা জানিয়ে দেবেন এবং তাতে তাপসের সর্ব্বনাশ ঘটবে। বোধিসত্ত্বের এই কথা শুনে ভন্ড জটাধারী তাপস সে স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করল।

এই জাতকের সমবধানে বলা হয়েছে — তখন এই ভন্ড ভিক্ষু ছিল সেই কূট তাপস এবং ভগবান বুদ্ধ ছিলেন সেই গোধারাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ধম্মপদত্থকথার 'কুহকব্রাহ্মণ বথুতে'[২] এই গল্পের অবতারণা হয়েছে।

এই জাতকের সঙ্গে প্রথম খন্ডের বিড়াল জাতক (১২৮)। গোধা জাতক (১৩৮) এবং দ্বিতীয় খন্ডের রোমক জাতক (২৭৭) তুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. এই জাতকের বর্তমান বস্তু এবং বিড়াল জাতকের বর্ত্তমান বস্তু একই।
২. ধম্মপদত্থকথা ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৫৪

বন্দনা মুখার্জী

গোধা জাতক — (৩)

জাতক সংখ্যা ১৩৮। বোধিসত্ত্ব একবার গোধা যোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বাসস্থানের কাছাকাছি এক তাপসকে তিনি প্রতিদিন সম্মান জানাতে ও প্রণাম করতে যেতেন। ঐ তাপস ছিল ভন্ড এবং ধূর্ত। এই জাতকের বাকী অংশ পূর্ববর্তী গোধা জাতক (২) সংখ্যা ৩২৫ এর মত। তাই এখানে আর বিস্তারিত বলা হলো না।

জাতকটি একজন ভন্ড এবং ধূর্ত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল।

বন্দনা মুখার্জী

গোধা জাতক — (৪)

জাতক সংখ্যা ১৪১। বোধিসত্ত্ব একবার গোসাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি একটি গোসাপ দলের নেতা হন। তাঁর ছেলে একবার এক গিরগিটির (বহুরূপী) সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে তারা দু-জনে প্রায়ই মিলিত হতে থাকে এবং তাদের বন্ধুত্বও প্রগাঢ় হয়। বোধিসত্ত্ব ছেলের এই বন্ধুত্বের কথা জানতে পেরে উপলব্ধি করলেন যে ভবিষ্যতে তাদের এই বন্ধুত্বের জন্য সমস্ত গোসাপ এবং ছেলে নিজেও বিপদের সম্মুখীন হবে। তিনি পুত্রকে নিষেধ করলেন গিরগিটির সঙ্গে মেলা মেশা করতে। কিন্তু তাঁর ছেলে তাঁর কথা শুনল না। বোধিসত্ত্ব বাঁচার জন্য নিজের পথ ঠিক করে রাখলেন।

একদিন গিরগিটি বন্ধুত্বের মিলনে ক্লান্ত হয়ে কোন এক শিকারীকে গোসাপের বাসাটি দেখিয়ে দিল, সেই শিকারী গোসাপ শিকারের জন্য গর্তের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিল। এই ঘটনায় বহু সরীসৃপ মারা গেল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিজের পূর্বে স্থির করা পথের মধ্যদিয়ে কোনও ক্রমে পালিয়ে গেলেন। এই জাতকের এরূপ আরও বিস্তৃত বিবরণ মহিলামুখ জাতকে আছে।

জাতকটি একজন ধূর্ত ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যিনি পূর্বজন্মে এই গোসাপ ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. G.P. Malalasekera - Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

গোধাবরী

গোধাবরী বা গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহৎ নদী যাহার উৎপত্তি হয়েছে নাসিক থেকে ২০ মাইল দূরে এরম্বক গ্রামে অবস্থিত ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে যে চৈতন্য ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে একবার পদার্পন করেছিলেন। এয়ম্বক গ্রামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে যার নাম কুশাবর্ত। কথিত আছে যে ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে উত্থিত হয়ে গোদাবরী কুশাবর্তের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, এই অংশের নাম গৌতমী। প্রত্যেকবার বৎসর অন্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পুণ্যার্থী এয়ম্বক গ্রামের এই অংশে মিলিত হয়ে পুণ্যস্নান করেন এবং এয়ম্বকেশ্বরকে পূজা করেন যিনি মহাদেবের দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম এক লিঙ্গ।[১] এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে গোদাবরীর তীরে বহু তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে সুদূর অতীত থেকেই যেমন কুশাবর্ত তীর্থ, দশাশ্বমেধ তীর্থ, গোবর্ধন তীর্থ এবং সাবিত্রী তীর্থ।[২] প্রাচীন সাহিত্যে যেমন রামায়নে গোদাবরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গোদাবরীর তীরে মৃগশিশুরা অবাধে বিচরণ করছে, চক্রবাক, হাঁস, কারণ্ডরস মনের আনন্দে খেলা করছে, নদীজলে। প্রস্ফুটিত পদ্মরাশি, রয়েছে লক্ষণ পঞ্চবটীতে থাকাকালীন প্রতিদিন গোদাবরীর পুণ্য সলিলে স্নান সেরে ফুল ও ফল আনতেন ইত্যাদি। রঘুবংশেও (XIII. 33) গোদাবরীর সুন্দর বর্ণনা আছে।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের ন্যায় বৌদ্ধ সাহিত্যেও গোদাবরীর প্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। সুত্তনিপাতে (P. 190) বলা হয়েছে গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহৎ এবং দীর্ঘ নদী যাহার উৎসে হলো পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা। মন্দাকিনী বা মঞ্জিরা হলো গোদাবরীর অন্যতম শাখা নদী। জাতকে (৫২২) উল্লেখ আছে গোদাবরীর তীরে শাস্তা শরভঙ্গের সঙ্গে ইন্দ্র এবং তিনজন রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই জাতকে আরও উল্লেখিত আছে যে যোজনত্রয় বিস্তৃত কপিত্থবন গোদাবরীর তীরে অবস্থিত।

বুদ্ধের সময়ে রাজা অলক (মুলক) এবং অসস্যক (দুই জনেই অন্ধক বংশীয় ছিলেন) গোদাবরী নদীর উত্তরতীরে রাজত্ব করতেন। বাভেরি ঋষির তপোবন ছিলো তাঁদের রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সুত্তনিপাত অথকথায় আরো বলা হয়েছে বাভেরি ঋষির আশ্রমের কাছ থেকেই গোদাবরী নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে মাঝখানে এক বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এই দ্বীপেই একটি ঘন জঙ্গল আছে যার নাম হলো কপিত্থবন। এটি যোজন ত্রয় বিস্তৃত। অতীতে এখানে বহু ঋষি এবং মুনিরা বাস করতেন — যেমন শরভঙ্গ (জাতক সংখ্যা ৫২২)

জৈনসহিত্যে গোদাবরী নদীর উল্লেখ আছে, এখানে গোদাবরীকে 'গোয়াবরী' বলা হয়েছে।[৩] গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমী গোদাবরীকে গ্রীসের গোয়ারিস (বৃহৎকথা ৬, ৬২৪৪) নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতেও গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম বৃহৎনদী যার উৎস পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

Ref.

1. শিবপুরাণ pur-I Ch. 54; বরাহপুরাণ Ch-79, 80 cf De N.L Geographical Dictioanary- PP. 69-70.

2. Ramayama অরণ্য কাণ্ড, সর্গ 15 Vol 11-18, 24

3. বৃহৎ কথা 6. 6244

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঈশান চন্দ্র ঘোষ — জাতক (কলিকাতা)

২। বৃহৎকথা।

বন্দনা মুখার্জী

গোধিক থের

বর্তমান গৌতম বুদ্ধের সময়ে গোধিক থের কোনও একজন মল্লরাজের সন্তান হিসাবে পাবায় জন্মগ্রহণ করেন। মল্ল রাজকুমার গোধিকের আরও তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁরা হলেন সুবাহু, ভল্লিয় এবং উত্তিয়। এঁরাও একই সঙ্গে আরও তিনজন মল্লরাজের পুত্র ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে এই চারজন বন্ধু সিদ্ধার্থ বুদ্ধ এবং কস্সপ বুদ্ধের সময় ও পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং তখনও এঁরা অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। ৮৭ কল্প আগেও তিনি রাজা মহাসেন নাম নিয়ে ৭বার জন্ম গ্রহণ করেন। (থেরগাথা)। একবার তারা চারবন্ধু মিলে কপিলাবস্তুতে যান। সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধও বেনুবনে অবস্থান করছিলেন। তিনি কোন কারণ বশত সেখানে শাক্যরাজাদের

কাছে যমক প্রতিহারিয় (যুগল অলৌকিক কার্য) প্রদর্শন করেন। বুদ্ধের এরূপ অলৌকিক কার্য্যকলাপ এবং ক্ষমতা দেখে তাঁরা বুদ্ধ ধর্মে আস্থা স্থাপন করেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সংঘে আশ্রয় নেন। তার কিছুদিন পর গোধিক থের অরহত্ব প্রাপ্ত হন। সেখানে তাঁরা শাক্য রাজা এবং মন্ত্রিবর্গের কাছ থেকে প্রচুর সেবা সম্মান ইত্যাদি লাভ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

অতঃপর গোধিক এবং তাঁর তিন বন্ধু রাজগৃহে আসেন এবং বিম্বিসারের তত্ত্বাবিধানে বাস করতে থাকেন। সেখানে রাজা বিম্বিসার তাঁদের জন্য বিহার নির্মাণ করেন কিন্তু ভুলবশতঃ বিহারের ছাদ নির্মাণ করা হয় নি। এমত অবস্থায় গোধিক ও তাঁর সঙ্গী সাথী নিজ নিজ গৃহে ছাদহীন অবস্থায়ই থাকতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে বসবাস কালীন বর্ষাবাসের সময় আসে। কিন্তু অলৌকিক ভাবে বৃষ্টিদেবতা তাঁদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং রাজাকে তাঁর এই ভুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় গৃহনির্মাণ করেন এবং উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত এবং পুনর্নির্মিত গৃহ গোধিক এবং ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। সেই সময়ে উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে প্রবল ঝড় বইতে থাকে ও বর্ষণ আরম্ভ হয়। তখন গোধিক ঝড়ের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত গাথা বলেন :

বস্সতি দেব যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা

চিত্তং সুসমাহিতঞ্চ মহ্যাম্, অথ চে পত্থয়সি পবস্স দেবতি

গাথা নং — ৫১

ধর্মপদত্থকথা এবং সংযুক্ত নিকায়ে বর্ণিত আছে যে এক সময়ে স্থবির গোধিক ঋসিগিরি পর্বতের কালশিলায় অবস্থান করছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যানানুশীলন করে শমথ ধ্যান লাভ করলেন। কিন্তু দৈহিক অসুস্থতা জনিত দীর্ঘদিন ধ্যানচর্যায় রত থাকতে না পেরে লব্ধ ধ্যান থেকে চ্যুত হয়ে পড়লেন। পুনঃপুনঃ ধ্যান লাভী ও ধ্যানহীন হবার পর ষষ্ঠবারে ধ্যান মগ্ন অবস্থাতেই কুশলাশয় করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। তখন মার গোধিক স্থবিরের গতিপথ অন্বেষণে ব্যর্থকাম হয়ে বুদ্ধের কাছে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। মারমুখে এই বৃত্তান্ত জেনে ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে গোধিক ক্ষুরের সাহায্যে শ্বাসনালী কেটে আত্মঘাতী হয়েছেন। যাই হোক বুদ্ধ সেখানে পৌঁছে গোধিককে দেখে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করলেন এবং বললেন গোধিক ইতি মধ্যেই অহরত্ব লাভ করেছেন :

তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদ বিহারিনং

সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগ্গং ন বিন্দতি।

ধম্মপদ, গাথা ৫৭

অর্থাৎ যাহাঁরা শীলবান, অপ্রমাদবিহারী ও সম্যক জ্ঞানে বিমুক্ত মার তাঁহাদের গতিপথের সন্ধান পায় না।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Encyclopaedia of Buddhism, Vol-V p. 816

2. ধম্মপদত্থকথা খণ্ড ১ পৃঃ ৪৩১-৩৪

3. Theragatha ed by Oldenberg ৫১-৫৪

বন্দনা মুখার্জী

গোপক মোগ্গল্লান সুত্ত

গোপক মোগ্গল্লান সুত্ত মজ্ঝিমনিকায়ের ৫৮ নং সুত্ত। এই সুত্তে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ এবং গোপক মোগ্গল্লানের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন যুগের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের এক বিশেষ চিত্র ফুটে উঠেছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অল্প কিছুদিন পরেই অবন্তীরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোতের আক্রমনের ভয়ে ভীত হয়ে অজাতশত্রু রাজগৃহের চতুর্দিকে বিশেষ ভাবে দুর্গ নির্মাণ করে সুরক্ষিত করেন। গোপক হলেন রাজা অজাতশত্রুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর ব্যক্তিগত নাম এবং তিনি মোগ্গল্লান গোত্রভূক্ত। যখন রাজগৃহের সুরক্ষায় দায় তাঁহার হস্তে নিবদ্ধ এরকম এক সময়ে আনন্দ সেই স্থানে যান। আনন্দের সঙ্গে গোপক মোগ্গল্লানের সাক্ষাৎ হলে তিনি আনন্দকে প্রশ্ন করেন বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে বর্তমানে বুদ্ধের সংঘের অবস্থা কি রকম। প্রত্যুত্তরে আনন্দ বলেন বুদ্ধ না থাকলেও সংঘ এবং বুদ্ধের অনুগামী ভিক্ষুরা অ-সুরক্ষিত নয়। কারণ ধম্মই তাদের আশ্রয় এবং পাতিমোক্ষের পালনই তাদের রক্ষা কবচ ও নীতি। তাঁদের দুজনের এরূপ আলোচনাকালীনই অজাতশত্রুর প্রধানমন্ত্রী বস্যকার মগধের সেনাপতি উপনন্দের সঙ্গে তাঁদের এলাকা পরিদর্শন করতে করতে সেই মুহুর্তে সেখানে এসে পৌঁছান এবং ভগবান বুদ্ধ ও বুদ্ধ শ্রাবকদের নানান ভাবে প্রশংসা করেন। এইসব আলোচনা প্রসঙ্গে আনন্দ আরও বলেন যে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী ভিক্ষুদের মধ্যে এমন অনেক ভিক্ষু আছেন যাঁরা তাঁদের সুন্দর গুণের জন্য মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তাদের পূজনীয় হয়ে উঠেছেন; যদিও তাঁদের কেউই ভগবান বুদ্ধের সমকক্ষ হন নি। সেই সব ভিক্ষুদের গুণাগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে দশপ্রকার বিশেষ গুণ (পসাদনীয় ধম্ম) এই সুত্তে আলোচিত হয়েছে। সেগুলি হলোঃ

১। নৈতিক নীতি এবং শীল পালন

২। বিদ্যাশিক্ষা

৩। সন্তুষ্টি

৪। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান

৫। ঋদ্ধি সম্পন্ন

৬। দিব্যশোত্র

৭। পরচিত্ত পর্যায় জ্ঞান

৮। পুর্ব-নিবাস স্মৃতিজ্ঞান

৯। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন

১০। আসবক্ষয় জ্ঞান

এই সূত্রের মধ্য দিয়ে ভগবান বুদ্ধ উপদেশচ্ছলে তাঁর শিষ্যদের যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাদের আদেশ করেছেন তারা যেন তাঁর প্রদর্শিত পথের মধ্য

দিয়েই যায়। তিনি আরও বলেছেন তারা যেন গৌতম বুদ্ধ নিজে এবং তাঁর পূর্ব্ববর্তী বুদ্ধরা যেমন নিজেরা সব কিছু পরীক্ষা করে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করে জেনে নেন সেই ভাবে নিজেনিজে প্রত্যক্ষ করে তবেই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Kashyap, Bhikkhu, Majjhima Nikāya (Bihar, Pali Publication Board, 1958)

2. G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

গোসাল থের

গোসাল স্থবির পূর্বে মগধের এক ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি সোনকুটিকর্ণের সহিত বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হন। একবার তিনি হঠাৎ সংবাদ পান তাঁর বন্ধু সোনকুটি কর্ণ দেহত্যাগ করেছেন। এই দুঃসংবাদে অত্যন্ত কাতর হয়ে গোসাল গৃহত্যাগ করেন এবং বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। সংঘে প্রবেশ করে গোসাল তাঁর জন্মস্থান থেকে অনতিদূরে এক উচ্চভূমিতে নির্জনাবাস করেন এবং অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যানানুশীলন করতে থাকেন। একদিন গোসাল ভিক্ষাচরণে বাহির হয়ে পথ চলতে চলতে তাঁর মাতার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সেইদিন তাঁর মাতা অন্যান্য ভিক্ষুদের ন্যায় তাঁকেও স্বহস্তে রন্ধন করে পায়স, মধু ইত্যাদি পরিবেশন করেন। গোসাল এই সমধুর আহার্য্যে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেন এবং পরিতৃপ্ত চিত্তে অরহত্ব লাভের উদ্দেশ্যে গভীর ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন হলেন। অনতিকাল পরেই গোসাল সকলপ্রকার আসব ক্ষয় করে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করেন এবং অহরত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

গোসাল সম্পর্কে 'অপদানে' বর্ণিত আছে যে একানব্বই কল্প পূর্বে গোসাল এক প্রত্যেক বুদ্ধের ছিন্ন কার্যায় বস্ত্র বৃক্ষ থেকে ঝুলতে দেখে শ্রদ্ধায় সেই বস্ত্রকে প্রণাম করে এবং পুষ্পাঞ্জলী দেন।

সম্ভবতঃ গোসালের জীবন পংসুকুলপূজকের সঙ্গে তুলনীয়।

বন্দনা মুখার্জী

গোসিংগসালবনদায়

গোসিংগসালবনদায় বৈশালীর অনতিদূরে একটি বনাঞ্চল। যাহা ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক বহু অধ্যুষিত। এক সময়ে গোসিংগসালবনদায়ে ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে করতে গিঞ্জকাবসথ থেকে গোসিংগসালবনদায়ে এসে পৌঁছান।[১] সেই সময়ে অনুরূদ্ধ, নন্দীয় এবং কিম্বিল বৈশালী থেকে অনতিদূরে নাদিকায় গোসিংগসালবনদায়ে বাস করিতেছিলেন এবং ধ্যানে সাধনায় রত ছিলেন। যখন ভগবান সেখানে প্রথম যান বনরক্ষক কর্মী ভগবান বুদ্ধকে চিনতে না পেরে বন মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেন নি, যাহাতে থের অনুরূদ্ধ, নন্দীয় এবং কিম্বিলের ধ্যান ভঙ্গ না হয়।

এই স্থানে ভগবান বুদ্ধ চুল গোসিংগসূত্র ও মহাগোসিংগ সূত্রের অবতারণা করেন

যাহা মজ্ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত। এই সূত্রের শেষে দীর্ঘ নামক এক যক্ষের কথা আছে। তিনি বুদ্ধের সঙ্গে সেখানে দেখা হওয়াতে তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন কিভাবে এই তিন জন স্থবিরের যশ সমগ্র পৃথিবীতে এমনকি ব্রহ্মালোকে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই সূত্রে একতা এবং মৈত্রীর গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে।

বি. সি. লাহার মত গোসিংগসালবনদায় হচ্ছে গোসিংগ শালবন। এটি নাদিকার নিকটবর্তী এক বনাঞ্চল। বুদ্ধঘোষ পপঞ্চসূদনীতে (মজ্ঝিমনিকায়ের অট্ঠকথা) লিখেছেন যে এই বনের এইরূপ নামকরণ হয়েছে কারণ শালবৃক্ষের শাখাগুলি ঠিক গো-শৃঙ্গের মত বাঁকা ভাবে তার কান্ড থেকে উঠেছে। এই আকৃতির বৃক্ষের অস্তিত্বের জন্যই এই বনাঞ্চলের নাম গোশৃঙ্গ বন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. যদিও বিনয়পিটকের তথ্য অনুযায়ী (Vin-1350) এই ঘটনা পাচিনবংশদায়ে ঘটেছিল।

2. Majjhima Nikāya Vol-I, P. 205-211, 263-269.

3. G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

ঘটজাতক

এই জাতক আচার্য্য বুদ্ধঘোষের লেখা জাতকত্থকথার অন্তর্গত ৩৫৫ সংখ্যক জাতক। ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান কালে কোশলরাজের কোন এক মন্ত্রীর প্রসঙ্গে এই জাতকের অবতারণা করেন। এই ব্যক্তিটি অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন বলে রাজা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। কিন্তু একদিন রাজা কোন এক মিথ্যাবাদী-দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কথা বিশ্বাস করে তাকে কারা নিক্ষেপ করেন। মন্ত্রীবর কারাগারের মধ্যেই ধ্যান সাধনার দ্বারা স্রোতাপত্তিমার্গ ফল লাভ করেন। কারাগার থেকে বাহিরে এসে তিনি শাস্তার দর্শন লাভ করেন এবং শাস্তা তাঁকে বলেন — "উপাসক, তুমি যেরূপ ইষ্ট থেকে অনিষ্ট আহরণ করেছ সেরূপ প্রাচীন পণ্ডিতরাও অতীতে ইষ্ট থেকে অনিষ্টের আহরণ করেছেন।" এই বলে তিনি নিম্নলিখিত জাতকের বর্ণনা করলেন।

এক সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'ঘটকুমার' নাম প্রাপ্ত হন। তিনি তক্ষশীলায় গিয়ে সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে কালক্রমে সিংহাসনে বসেন এবং যথাধর্ম রাজত্ব করতেন।

একদিন এক অমাত্য বোধিসত্ত্বের অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব মন্ত্রীর এইরূপ আচরণের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। তখন শ্রাবস্তীতে বঙ্করাজ রাজত্ব করতেন। মন্ত্রীটি বঙ্করাজের কাছে গিয়ে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হলেন এবং শ্রাবস্তীরাজকে নিজের কু-পরামর্শ মত কার্য্যে প্ররোচিত করলেন। শ্রাবস্তীরাজ অমাত্যের পরামর্শ অনুযায়ী বিপুল বাহিনীসহ ঐ রাজ্যের সীমায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বারানসীর পঞ্চশত মহাযোদ্ধা ঐ বৃত্তান্ত জানতে পেরে বোধিসত্ত্বকে অনুরোধ করলেন শ্রাবস্তীরাজকে বন্দী করার জন্য। কিন্তু বোধিসত্ত্ব রাজী হলেন না।

তিনি বললেন — "হিংসার দ্বারা যে রাজ্য লাভ করতে হয় তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তোমাদের কিছুই করতে হবে না।"

অতঃএব বঙ্করাজ বহুমানুষের প্রাণসংহার করে অনায়াসে বারাণসী রাজ্য অধিকার করলেন এবং বোধিসত্ত্বকে বন্দী করে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। বোধিসত্ত্ব ধ্যানস্থ হয়ে আকাশে পর্য্যঙ্কবন্ধনে উপবিষ্ট হলেন। কারাগারে আবদ্ধ থেকেও তিনি বঙ্করাজের প্রতি করুনাপরবশ হয়ে মৈত্রী ভাবনা করতে লাগলেন, বঙ্করাজের শরীরে দারুন জ্বালা আরম্ভ হলো। তিনি তখন এর কারণ অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলেন যে তিনি একজন শীলবান রাজাকে কারাযন্ত্রনা দিচ্ছেন, তাই তিনি এত দুঃখ ভোগ করছেন। এই জেনে বঙ্করাজ কারাগারে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বের সুবর্ণমুকুরোপম, প্রফুল্ল পদ্মশ্রীযুক্ত মুখ দেখে নিম্নোক্ত গাথা বললেন—

"অপর সকলে মগ্ন শোকের সাগরে, অশ্রুধারা তাহাদের নয়নেতে ঝরে; কিন্তু তুমি যথাপূর্ব্ব প্রসন্ন বদন! বল, ঘট, শোক তব নাহি কি কারণ?" বোধিসত্ত্ব তখন তাঁকে ব্যাখ্যা করলেন কি কারণে পার্থিব শোক, দুঃখ, কষ্ট-তাপ থেকে তিনি মুক্ত, কেনই বা তিনি সদানন্দ ময়। কারণ তিনি ধ্যান বলে যা পেয়েছেন তাহা অধিকার করার ক্ষমতা কারো নেই।

এই কথা শুনে শ্রাবস্তীবাসীরা বঙ্ক বোধিসত্ত্বের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহাসত্ত্বও মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের ভার অর্পন করে হিমবন্তে চলে গেলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অপরিহীন ধ্যান বলে ব্রহ্মলোক-পরায়ন হলেন।

সমবধানে বলা হয়েছে — তখন আনন্দ ছিলেন বঙ্করাজ এবং বোধিসত্ত্ব ছিলেন ঘট রাজা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ঈশান চন্দ্র ঘোষ — (জাতক কলিকাতা, করুনা প্রকাশনী) খণ্ড ১ এবং ৩।

২. Fausböl — Jataka (PTS, London) Vol-1 & 3

বন্দনা মুখার্জী

ঘটজাতক

এই জাতকটি আচার্য্য বুদ্ধঘোষকৃত জাতকত্থকথার ৪৫৪ সংখ্যক জাতক। কোনও এক উপাসকের পুত্রবিয়োগ উপলক্ষ্য করে শাস্তা এই জাতকের অবতারণা করেন। এই উপাসক পুত্রশোকে অধীর হয়ে স্নানাহার ও কাজকর্ম সবকিছু পরিহার করে। এমনকি বুদ্ধদেবের অর্চনার জন্যও বিহারে যেত না। কেবলই বিলাপ করত। একদিন আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে শাস্তা তার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং সেই উপাসক প্রশ্ন করেন সত্যই কি সে পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হয়েছে? তখন সে ইহা স্বীকার করে। শাস্তা তাঁর উত্তর শুনে বললেন — "প্রাচীন কালেও বিজ্ঞেরা পুত্রশোকে অধীর হয়ে বেড়াইতে ছিলেন কিন্তু শেষে পণ্ডিতদের উপদেশ শুনে মৃত পুত্রের জন্য আর শোক করেন নি।"

অনন্তর উপাসকের প্রার্থনা অনুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তু মৃষ্টকুণ্ডলী জাতকে (৪৪৯) বিবৃত হয়েছে।

পুরাকালে উত্তরাপথে কংসভোগ নামক দেশে মহাকংস রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অসিতারঞ্জন। মহাকংসের দুই পুত্র ছিল— কংস এবং উপকংস ও এক কন্যা ছিল — দেবগর্ভা। দেবগর্ভা ভূমিষ্ঠ হলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন দেবগর্ভার গর্ভজাত পুত্র কংসরাজ্য ধ্বংস করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনেও মহাকংস স্নেহ বশতঃ দেবগর্ভার প্রাণনাশ করলেন না।

কালক্রমে কংস রাজা হলেন, এবং উপকংস উপরাজ হলেন। ভগিনীর প্রাণনাশ করলে তাঁরা সমাজের কাছে ঘৃন্য হয়ে যাবেন, এই ভেবে দেবগর্ভাকে অবিবাহিত রেখে কারারুদ্ধ করলেন। অন্ধকবিষ্ণু নামে এক প্রহরী কারাগারের প্রহরায় নিযুক্ত হলো। নন্দগোপা নাম্মী এক পরিচারিকা দেবগর্ভাকে দেখাশোনা করতেন। ঘটনাচক্রে মথুরারাজকুমার উপসাগরের সঙ্গে দেবগর্ভার বিবাহ হয়। কংস তখন প্রতিজ্ঞা করেন, দেবগর্ভা যদি পুত্র সন্তান প্রসব করেন তবে কংস তাকে অবশ্যই বধ করবেন। দেবগর্ভা দশটি পুত্র পর পর প্রসব করেন এবং নন্দগোপা নাম্নী তাঁর পরিচারিকা দশটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। সুতরাং দেবগর্ভা নন্দগোপার গৃহে তাঁর সন্তানদের রেখে তাদের সকলেরই জীবন রক্ষা করেন। এইসব পুত্রের একজনের নাম বাসুদেব, একজনের নাম বলদেব ও একজনের নাম ঘটপণ্ডিত। লোকে তাদের দশভাইকে অন্ধকবিষ্ণু দাসের পুত্র বলেই জানতে, তারা 'দাস দশভেয়ে' নামে পরিচিত ছিল।

বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে তারা অত্যন্ত বীর্যবান, নিষ্ঠুর এবং বলিষ্ঠ হলো ও সেই সঙ্গে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। তারা মল্লযুদ্ধেও পটু ছিল। তাদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত এবং ভীত হয়ে অন্ধকবিষ্ণু একদিন কংসরাজকে সত্য কথা ফাঁস করে দিল। কংস তখন ভয়ে তাদের হত্যা করবার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু কালে চানুর ও মুষ্টিক নামক দুই মল্লযোদ্ধা এবং কংস তাদের হাতে জীবন দান করেন।

দ্বারাবতী নাম্নী আকাশচারিনী নগরীতে বাসুদেব আধিপত্য করতে। অতঃপর তাঁর এক পুত্রের মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুশোকে বাসুদেব বিহ্বল হয়ে পড়েন। ঘটপণ্ডিত কৌশলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং শোক সন্তপ্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। ইহা ছাড়াও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষির প্রাণবধ; খদির মুষলের কথা; মুষল ভস্ম থেকে এরকতৃণের উৎপত্তি; কুমারদের আত্মকলহ এবং পরস্পরের নাশ; জরা নামক ব্যাধের শক্তির আঘাতে বাসুদেবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ইত্যাদি এই জাতকের বিষয় বস্তু।

এই প্রসঙ্গে মূল জাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে শ্রীমদ্ ভাগবতে (দ্বাদশ খণ্ড) হরিবংশ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ চরিত্র এবং যদুবংশ ধ্বংস সংক্রান্ত যে বিবরণ দেখা যায় তার সঙ্গে এই জাতকের অনেক মিল আছে। যদিও বহু পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন মহাভারতে বাসুদেব এবং বলদেব ভিন্ন ভিন্ন জননীর গর্ভজাত। বৌদ্ধজাতকে তার সহোদর। পুরানে কংস অতি দুরাচার দৈত্য ছিল বৌদ্ধজাতকে তিনি দয়াশীল বরং বাসুদেব প্রভৃতিই অত্যাচারী ও উশৃঙ্খল ইত্যাদি।

জাতকের সমবধানে বলা হয়েছে — তখন আনন্দ ছিলেন রোহিনেয়। সারিপুত্র ছিলেন বাসুদেব।

গ্রন্থপঞ্জী

জাতক - খণ্ড

Fausbol — Jataka Vol.

ঘটিকার সুত্ত

ঘটিকার সূত্র মজ্ঝিম নিকায়ের অন্তর্গত এই সূত্রে ঘটিকার নামক একজন বুদ্ধানুরাগী শিষ্যের ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার ও ভক্তির প্রসঙ্গে বুদ্ধ ও আনন্দের কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে। সূত্রটি এইরূপ ঃ

ভগবান বুদ্ধ কোশল ভ্রমণকালে এই সূত্র দেশনা করেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তিনি কোশলের প্রধান রাস্তার সামনে দাড়িয়ে স্মিত হাসি হাসলেন। তখন আনন্দ বুদ্ধকে তাঁর এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধদেব নিম্নোক্ত ঘটনা বললেন।

কস্যপ বুদ্ধের সময়ে এই ঘটিকার ছিল বেহলিঙ্গের একজন মৃৎশিল্পী। সে মাতা পিতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান এবং কর্তব্য পরায়ন ছিলো। সেই সঙ্গে কস্সপ বুদ্ধের প্রতিও ছিল তার গভীর বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় বুদ্ধি। সেই সময় বোধিসত্ত্ব ছিলেন জ্যোতিপাল নামক এক ব্রাহ্মণ পুত্র যিনি ঘটিকারের বিশেষ বন্ধু। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে ঘটিকারের যেমন বুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিলো ভগবানের সেরকম ঘটিকারের প্রতি আস্থা ছিল। তাই তিনি যখন যেমন প্রয়োজন হতো ঘটিকারের বাড়ী যেতেন এবং নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসতেন। এইরকমই একদিন বারাণসীর রাজা বুদ্ধকে বর্ষাবাসের জন্য নিমন্ত্রন করেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ ঘটিকারকে বর্ষাবাসের অঙ্গীকার করেছিলেন বলে রাজার নিমন্ত্রন প্রত্যাখ্যান করেন। এ রকমই একদিন ঘটিকারের অনুপস্থিতিতে ভগবান ঘটিকারের বাড়ীর ছাদ (মাটি ও খড় দিয়ে তৈরী) তুলে এনে রাখেন। ঘটিকার সব জানতে পেরেও মৌন থাকলেন, এবং শোনা যায় সমস্ত বর্ষা তিনি ছাদ বিহীন ঘরে থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্য বিন্দুমাত্র বর্ষাও ঘটিকারকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আকাশের নীচে বর্ষার তিন মাস কাটিয়ে দিলেন।

তাঁর বন্ধু জোতিপালের ভগবানের প্রতি তেমন আথা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মণ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ঘটিকার বহু চেষ্টা করেও তাঁকে বুদ্ধানুরাগী করতে পারেন নি। একদিন তিনি জোর করে জোতিপালকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে জোতিপাল বুদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন, প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা নিয়ে সংঘে যোগদান করেন। কিন্তু ঘটিকার অন্ধ পিতা মাতার দেখাশোনা করতে হবে বলে সংঘে যোগদান করলেন না। গৃহে থেকেই বুদ্ধের সেবা করতে লাগলেন। বারাণসীর রাজা কিকি বুদ্ধের কাছে ঘটিকার সম্বন্ধে এই রকম উচ্চ প্রসংশা শুনে ঘটিকারকে অনেক চাল ইত্যাদি পাঠালেন। কিন্তু ঘটিকার নিজের ধনেই তৃপ্ত ছিলেন বলে ধন্যবাদের সঙ্গে রাজার দান ফেরৎ পাঠালেন।

মৃত্যুর পর ঘটিকার অবিহ-ব্রহ্মালোকে মহাব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

বুদ্ধের ভিক্ষুদের ভগবান তোদেয় নামক পবিত্র স্থানে এই সূত্রের দেশনা করেন। এখানে একটি স্তুপ ছিল। এটা তৎকালীন মানুষেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করত। এই ঘটনা এখানে বিবৃত করে বুদ্ধ বললেন সেই সময়ে এই স্তুপ ছিল যেটি কস্‌সপ বুদ্ধের স্তুপ।

ঘটনার শেষে বুদ্ধ বললেন সেই সময়ে জ্যোতিপাল ছিলেন বুদ্ধ নিজে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সংযুক্ত নিকায়ের অন্তর্গত ঘটিকার সূত্রে ঘটিকার-মহাব্রহ্মার সঙ্গে জেতবনে ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাতকার এবং কথোপকথন লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতঃএব এই সূত্র দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। মজ্ঝিম নিকায় — ২য় খণ্ড।

২। ধম্মপদথকথা — ৩য় খণ্ড।

৩। সংযুক্ত নিকায় — ১ম খণ্ড।

৪। Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I

বন্দনা মুখার্জী

ঘোটমুখ সুত্ত

ঘোটমুখ সুত্ত মজ্ঝিম নিকায়ের মজ্ঝিম পঞ্ঞাসকের অন্তর্গত ৪৪ নং সুত্ত। এই সুত্তের নামকরণ হয়েছে পাটলীপুত্রবাসী কোন এক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গে। একদিন তিনি বারানসীতে আসার সময়ে পথিমধ্যে খেমিয়ম্ববণে বুদ্ধ শিষ্য ভিক্ষু উদেনের সঙ্গে ঘোটমুখের সাক্ষাত হয়। সেখানে উদেনের (সংস্কৃত-উদয়ন) কাছ থেকে বুদ্ধের ধর্মদেশনা এবং তাঁর মতামত ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন। এর পর থেকে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং পরিশেষে এই ধর্ম গ্রহণ করেন। সমস্ত আলাপ আলোচনার পর ঘোটমুখ উদেনের নিকট ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে "এখন থেকে তিনি প্রতিদিন পাঁচশত কষাপন করে ভিক্ষু পরিসেবার জন্য দান করবেন, সেটা তিনি তৎকালীন অঙ্গরাজ্যের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। তাঁর এই প্রস্তাবে উদেন সিদ্ধান্ত নেন যে-ঐ অর্থ যদি তিনি পাটলিপুত্রে একটি ভিক্ষু আরামের জন্য ব্যয় করেন তো খুব উত্তম। ঘোটমুখ এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে একটি ভিক্ষু আরাম তৈরী করেন যার নাম হয় ঘোটমুখী।

উদেনের সাথে আলোচনা কালে ঘোটমুখ প্রশ্ন করেন — কোন ভিক্ষুকে যথার্থ ধম্মিক পরিব্রাজক বলা যাবে? তার উত্তরে উদেন বলেন — চার ধরনের মানুষ আছেন — প্রথম শ্রেণীর হলেন তাঁরা যারা নিজেদের কষ্ট দেন অর্থাৎ প্রচণ্ড কৃচ্ছ সাধন করেন, দ্বিতীয় শ্রেণীরা অপরকে অত্যাচার করেন, তৃতীয় শ্রেণীরা নিজেও কষ্ট করেন এবং অপরকেও কষ্ট দেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষ হলেন তাঁরা যাঁরা নিজেরাও কৃচ্ছসাধন করেন না অপরকে ও কৃচ্ছসাধন করাতে বাধ্য করেন না। তাঁদের কোনও রকম আসক্তি নেই, সর্বাধিক আসব ক্ষয় করে তৃষ্ণামুক্ত হয়ে আগা থেকে অনাগারিক হয়েছেন। তখন ঘোটমুখ বলেন এই চতুর্থ শ্রেণীরাই যথার্থ ধম্মিক ভিক্ষু।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মজ্ঝিমনিকায়ের কন্দরক সুত্ত এবং ঘোটমুখ সুত্ত একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Kassyap, Bhikkhu, J (ed) Majjhima Nikāya Vol-II

2. Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I, P. 827

বন্দনা মুখার্জী

ঘোসিত শ্রেষ্ঠী

ঘোসিত শ্রেষ্ঠী কোসাম্বীর একজন নামকরা শ্রেষ্ঠী। তিনি কোসাম্বীর একজন গণিকার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকলীন যুগে গণিকার গৃহে কন্যা সন্তানের কদরই ছিল বেশী, পুত্র সন্তানের কোনও মূল্য ছিল না। (মনে হয় এই মূল্যবোধের পিছনে অর্থনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। কারণ গণিকার গৃহে কন্যা সন্তান তাহার মাতার অর্থ উপার্জনের উপায়কে বজায় রাখবে। তাই তারা কন্যাই কামনা করত এবং কন্যার সমাদর করত)। যাইহোক ঘোসিত, যিনি ঘোসক নামেও পরিচিত, তার জন্মের পরেই তাকে তার মাতা আর্বজনা স্তূপে ফেলে দেয়। কোন এক পথিক সেই পথ দিয়ে যাবার কালে আর্বজনার স্তূপে ফেলে দেওয়া ঐ শিশুটিকে দেখে তাকে কোলে তুলে নেন।

সেই সময়ে তৎকালীন কোসাম্বক শ্রেষ্ঠী কোনও একজন ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে জানতে পারেন একজন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান পুত্র ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তিনি ঐ পথিকের কাছ থেকে সন্তানটিকে দত্তক নিলেন এবং তাকে নিজের ছেলের মত লালন পালন করতে লাগলেন।

অল্পদিন পরেই শ্রেষ্ঠী পত্নী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। নিজের পুত্র জন্মাবার পর থেকেই শ্রেষ্ঠী পত্নী ঘোসককে হত্যা করার চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁকে তার ইচ্ছা সফল করার জন্য নানান ভাবে সাহায্যে করতে লাগলেন তাঁর পরিচারিকা কালী নাম্নী এক মহিলা।

একদিন কালী নাম্নী সেই দাসী একজন কুম্ভকারকে রাজী করাল যে যদি সে ঘোসিতকে তাঁর যন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে হত্যা করে তবে সে তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। এইরূপ ষড়যন্ত্র করে একদিন প্রভাতে ঘোসিত নিজেই একটি চিঠি মারফৎ এক সংবাদ নিয়ে ঐ কুম্ভকারের কাছে যাচ্ছিল তার পালিত মায়ের আদেশ মতো। কিন্তু পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার সৎ ভাই ঘোসিতের (যার ঐ একই নাম) সাথে।

ঘোসিত তার সৎ ভাই কে বলল যদি সে এই পত্র কুম্ভকারকে দিয়ে আসে তবে ফেরার পথে তারা দুজনে গুলি (মার্বেলের মত) খেলবে। ছোট ভাই এই কথা শুনে ছুটে সেই সংবাদ নিয়ে কুম্ভকারের কাছে গেল। কিন্তু কুম্ভকার তাকে প্রকৃত ঘোসিত মনে করে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী যন্ত্রের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে হত্যা করল।

কোসাম্বক শ্রেষ্ঠী ঐ সংবাদ পেয়ে রাগে ঘোসিতকে হত্যা করবার জন্য একটি

গোপন চিঠি দিয়ে আবার তাকে পাঠালেন তাঁরই এক তত্ত্বাবধায়ক, যিনি একশত গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাঁর কাছে। পালক পুত্রকে পাঠাবার সময়ে শ্রেষ্ঠী গোপনে তার পিঠে একটি চিঠি বেঁধে দিলেন যাতে লেখা আছে— "চিঠি পাওয়া মাত্রই যেন এই সংবাদবাহকটিকে হত্যা করা হয়।"

ঘোসক যেতে যেতে অত্যন্ত ক্ষিদের জ্বালায় দাঁড়িয়ে পরে কোন একজন বড় দেশীয় শ্রেষ্ঠীর গৃহে। সেই শ্রেষ্ঠীর এক মেয়ে ছিল। ঘোসিতকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে তাকে বিবাহ করতে আগ্রহী হলো। ইতিমধ্যে সে হঠাৎ আবিস্কার করল ঘোসিতর পিঠে বাঁধা ঐ মৃত্যুর পরোয়ানা। শ্রেষ্ঠী কন্যা শিক্ষিত ছিলো। তাই সে ঐ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে পরিবর্তে গ্রাম নিয়ন্ত্রককে লিখল — চিঠি পাওয়া মাত্র নিয়ন্ত্রক যেন ধুমধাম করে ঘোসিতের বিবাহের ব্যবস্থা করে এই কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেয় এবং তাদের বাসের জন্য একটি দোতলা বাড়ী নির্মাণ করে দেয়। এই ভাবে সে ঘোসিতকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাল। এদিকে গ্রাম নিয়ন্ত্রক এই চিঠি পেয়ে আদেশমত সবকাজ সম্পন্ন করে কোসাম্বক শ্রেষ্ঠীকে সংবাদ পাঠাল। কোসাম্বক শ্রেষ্ঠী এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পরলেন। ঘোসিত তার স্ত্রী সমেত শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার সামনে এসে দাড়াঁল। শ্রেষ্ঠী মৃত্যুমুখে পতিত হবার সময়ে তার মুখ থেকে ভুল ক্রমে সব সম্পদ ঘোসিতকে দান করার কথা বেরিয়ে পড়ল। এই ভাবে সৌভাগ্যের বলে ঘোসিত অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হলো।

ঘোসক অত্যন্ত ধার্মিক এবং সৎ ছিলেন। তিনি তার বন্ধু ভদ্দাবতীয়ের কন্যা সামাবতীকে নিজের কন্যার মত পালন করেন এবং রাজা উদয়নের সাথে বিবাহ দেন।

ঘোসক (ঘোসিত) তাঁর পূর্ব্ববর্তী জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্রতার জেরে একদিন যখন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গ্রামান্তরে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে জিনিষপত্র এবং দারিদ্রতার জ্বালা ও ক্লান্তিতে নিজের সন্তানকে বনের মধ্যে ফেলে চলে আসেন। যদিও পরবর্তী কালে তাকে পুনরায় ফিরে পান। সেই পাপের ফলেই এ জন্মে তার গণিকা মাতা তাকে জঞ্জালের স্তূপে ফেলে দেয়। কিন্তু নিজ ভাগ্যবলে সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোসাম্বীতে ঘোসকের দুজন বন্ধু ছিলো কুক্কুট এবং পাবারিয়। একটানা প্রায় কয়েক বছর তারা হিমবন্ত প্রদেশ থেকে আসা পাঁচশত সন্ন্যাসীর ভরণ পোষনের দায়িত্ব নেয় এবং তাঁদের সেবা করে। একদিন তাঁরা সংবাদ পান যে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথাপিণ্ডকের আরামে উপবেশন করছেন। তারা ঘোসককে এই সংবাদ দিলে ঘোসক তার এই দুই বন্ধুর সাথে বুদ্ধের দর্শনে গেলেন। তাঁকে বহুপ্রকার বস্তু দান করলেন এবং তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে স্রোতাপন্ন হলেন। সেখানে তাঁরা ভগবান বুদ্ধকে তাঁর ভিক্ষু সংঘের সাথে নিমন্ত্রন করলেন কোসাম্বীতে আসার জন্য। ঘোসীকের নিমন্ত্রনে বুদ্ধ কোসাম্বীতে গেলে ঘোসক বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষুদের 'ঘোসিতারাম' নামে এক 'বিহার' দান করলেন।

ঘোসিতের একটি প্রকাণ্ড রন্ধন শালা ছিল। সেই রন্ধনশালার দায়িত্বে ছিল মিত্র নামের একজন গৃহপতি। ঘোসিত প্রতিদিন সেই রন্ধনশালা বা ভোজনশালা থেকে বহু দরিদ্রকে খাদ্য বিতরণ করতেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Norman, H.C. J (ed) Dhammapada Aṭṭhakathā (PTS, London) Vol-I

2. Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I, P. 827

বন্দনা মুখার্জী

ঘোসিতারাম

কৌশাম্বী অঙ্গুত্তর নিকায়োক্ত ষোড়শ মহাজন পদের অন্যতম রাজ্য বৎসের রাজধানী। এই রাজ্যের রাজা উদয়ন বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। কৌশাম্বীর খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠী ঘোসিত ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষু সংঘের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করেন। তার নাম ঘোসিতারাম। পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবনের বহু বৎসর ঘোসিতারামে অতিবাহিত করেন এবং জনসাধারণকে অনেক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কৌশাম্বীর ঘোসিতারামে দুইজন ভিক্ষু — একজন বিনয়ধর ও একজন ধর্মকথক বাস করতেন। তাঁদের অনেক শিষ্য ছিল। একদিন সাধারণ আচার ব্যবহার সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ঘটল। এই বিবাদই সংঘ ভেদের প্রথম বীজ। যথাসময়ে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলেও উত্তেজিত অনুচরবৃন্দ বিবাদ করে দুইদলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে উপাসক সমাজও দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, বুদ্ধ স্বয়ং ঐ বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং তখন একাকী পারিলেয়্যক নামক বনে গিয়া বাস করতে থাকেন। এই রকম আরও একবার তিনি বনে নির্জনাবাস করিবার জন্য ঘোসিতা রামে সময় অতিবাহিত করেন।

আরও একবার বুদ্ধ ঘোসিতারামে বাস করবার সময়ে ছন্ন নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুকে 'উৎক্ষেপনীয় কর্ম' নামক শাস্তির বিধান দেন। বিনয়পিটকে (খণ্ড-৩, পৃঃ ১৮১) উল্লিখিত আছে যে দেবদত্ত এই ঘোসিতারামে বাস করিয়াই মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাছে রাজা অজাত শত্রুকে লাগাবেন। আরও একবার বুদ্ধ তখন ঘোসিতা রামে ছিলেন; সেই সময় দেবপুত্র কুম মহামোগ্গল্লানের সামনে আসেন এবং দেবদত্তের সংঘের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দুরভিসন্ধির কথা বলেন এবং সাবধান করেন। মোগ্গল্লান বুদ্ধকে এই সংবাদ দিলে তিনি বলেন এ সংবাদ যেন আর কেউ না মানে এবং তিনি আরও বলেন যে পৃথিবীতে পাঁচরকমের শিক্ষক আছেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে (খণ্ড-৩ পৃঃ ১২২...) এর বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বুদ্ধের মতো বুদ্ধ শিষ্য আনন্দও বহুবার ঘোসিতারামে অবস্থান করেছেন এবং তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা এই ঘোসিতারামের সঙ্গে যুক্ত আছে। যাঁরা বিভিন্ন কারণে ঘোসিতা রামে থাকাকালীন আনন্দের সঙ্গে দেখা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — ঘোসিত (সুত্তনিপাত ২৭১...), উদায়ী (সুত্তনিপাত ১৬৯...), কিছু আজিবক ভিক্ষু (অঙ্গুত্তর নিকায় খন্ড ১-২১৭...) ইত্যাদি। আনন্দ এখানে 'যুগনদ্ধসুত্রের অবতারণা করেন। (অঙ্গুত্তর নিকায় - খন্ড ২-১৫৬.....)।

ভগবান বুদ্ধ এখানে বহু সূত্রের দেশনা করেছেন যেমন — কোসাম্বীয় সুত্ত,

জালিয় সুত্ত, সন্দক সুত্ত, উপক্কিলেস সুত্ত, সেখ সুত্ত, দল্হধম্ম জাতক, কোসাম্বী জাতক এবং সুপ্পারক জাতক।

মহাবংশে (XXIX - 34) উল্লেখ আছে যে প্রায় ৩০,০০০ ভিক্ষু উক্ত ধম্মরক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ঘোসিতা রাম থেকে সিংহলের অনুরাধপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন মহাস্তূপের নির্মাণের সূচনাকালে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Geiger, (ed) Mahâvamsa (PTS, London)

2. Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper Names Vol-I P. 829-31

বন্দনা মুখার্জী